بسم الله الرحمن الرحيم

সুরা নূরের আলোকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

(A timely solution to the increasing social problems in the light of Sura Al-Nur: A pragmatic study)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

মোঃ হাবিবুল্লাহ

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং- ১২৩/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০।

রজব ১৪৪৩ হিজরি

ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ফেব্রুয়ারি ২০২২ খৃস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোঃ হাবিবুল্লাহ (রেজিঃ নং- **১২৩/২০১৬-২০১৭**) কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **সুরা নূরের আলোকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানঃ একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ (A timely solution to the increasing social problems in the light of Sura Al-Nur: A pragmatic study)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ : ১৬-০২-২০২২

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **সুরা নূরের আলোকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানঃ একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ (A timely solution to the increasing social problems in the light of Sura Al-Nur: A pragmatic study)** শিরোনামে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি। এটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

(মোঃ হাবিবুল্লাহ)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং-১২৩
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা একমাত্র প্রতিপালক, সর্বজ্ঞানী, অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য। আর দুরূদ ও সালাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মানুষ মহানবি (স.)-এর প্রতি। আর মনের গহিন থেকে উৎসারিত ভালোবাসা প্রকাশ করছি সাহাবিগণের প্রতি যারা ক্লান্তিহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছেন।

নানামুখী প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **সুরা নূরের আলোকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানঃ একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে আবারো মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে হৃদয়ের গভীর থেকে শুকরিয়া আদায় করছি। গবেষণাকর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বপ্রথম গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের প্রতি যিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে গবেষণাকর্মের শেষ পর্যন্ত অবিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বহু ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভের প্রতিটি শব্দ পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করে অভিসন্দর্ভটির অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। স্যারের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

সাথে সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষককে, যাদের মমতামাখা সংস্পর্শ ও উদার পরামর্শ পেয়ে আমার চিন্তাশক্তি অনেক বেশি গতিশীল হয়েছে। তাদের অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ এ গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে। অতি আবেগ ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি শৈশব জীবনের স্মৃতি বিজড়িত পিতৃতুল্য শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যাপিঠগুলোকে, যাদের কোমল হাতছানি ও স্নেহের পরশে জীবনে বেড়ে উঠার সাথে সাথে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে গবেষণার এ দিগন্তে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছি। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, দেওয়ানীপাড়া দাখিল মাদরাসা, কেশবপুর বাহরুল উলুম কামিল মাদরাসা ও সেখানকার শিক্ষকবৃন্দ, সকলেই আমার হৃদয়ে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত কাঙ্খিত মানে টিকিয়ে রাখেন ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এছাড়াও যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তারা হলেন আমার হিফজখানার শিক্ষকদ্বয় হাফিজ মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান ও হাফিজ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান সাহেব, মিফতাহুল

Dhaka University Institutional Repository

উলুম মাদরাসা, কেশবপুরের সম্মানিত সুযোগ্য প্রিন্সিপাল অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক মাওলানা মোঃ আসাদুজ্জামান সাহেব এবং জীবন চলার দিক নির্দেশক ও শিক্ষক মাওলানা আহমাদ ঈসা সাহেব (হাফিজাহুমুল্লাহ)। সকলকে সম্মানের সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষভাবে হৃদয়ের গভীর থেকে তাদের নাম স্মরণ করছি যারা আল্লাহর দরবারে গভীরভাবে নিয়মিত দুআ করেছেন, তাদের মধ্যে আমার মমতাময়ী আম্মাজান, আমার আব্বাজান (রহ.)-এর খুব কাছের বন্ধু সদ্য ইহজগত ত্যাগকারী মোঃ দেলোয়ার হোসাইন কাকা, অত্যন্ত স্নেহের একমাত্র ছোট ভাই মোঃ মাহবুবুল্লাহ। আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ করুণার নিদর্শন আদরের দু'টি সন্তান আহমাদ আবদুল্লাহ ও আনাস আবদুল্লাহ এবং তাদের মা আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী। যাদেরকে এ গবেষণার স্বার্থে দীর্ঘদিন স্নেহ-মমতা, আদর-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে। সাথে সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানিত শ্বশুর মোঃ আব্দুস সোবহান ও সম্মানিতা শাশুড়ি মাকে। উল্লিখিত সকলের আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা, কল্যাণ কামনা ও দুআর ফলে মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে গবেষণকর্মটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি, তিনি যেন তাদেরকে তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দি হিসেবে কবুল করেন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন।

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ এবং আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি। গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমি আল-কুরআনের তাফসির, ফিকহ, সামাজিক সমস্যা ও নারী বিষয়ের উপর রচিত দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা লেখকের রচনাবলি, প্রতিবেদন, প্রামাণ্য পত্র-পত্রিকা ও জার্নালের সহযোগিতা নিয়েছি এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের নাম স্বসম্মানে উল্লেখ করেছি, তাদের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। মহান আল্লাহ তাদেরকে উভয় জাহানে উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন। অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সুবিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করার জন্য মুফতি তাজুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মোঃ ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ-এর কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাদেরকে ইহকালীন কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে হৃদয়ের গভীর থেকে দুআ করছি, তিনি যেন তার এ বান্দাকে তাঁর প্রিয়বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং উক্ত গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ, পরকালীন মুক্তি ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। আমিন।

মোঃ হাবিবুল্লাহ

এম. ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	: অনুবাদ
ইফাবা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	: খণ্ড
খৃ.	: খৃস্টাব্দ
খৃ.পূ.	: খৃস্টপূর্ব
ড.	: ডক্টর (পি.এইচ.ডি.)
পৃ.	: পৃষ্ঠা
১ম	: প্রথম
২য়	: দ্বিতীয়
৩য়	: তৃতীয়
৪র্থ	: চতুর্থ
৫ম	: পঞ্চম
৬ষ্ঠ	: ষষ্ঠ
৭ম	: সপ্তম
৮ম	: অষ্টম
৯ম	: নবম
১০ম	: দশম
প্রাগুক্ত	: পূর্বোক্ত/পূর্বেরউক্তি
বি.দ্র.	: বিশেষ দ্রষ্টব্য
তাং	: তারিখ

তা.বি.	: তারিখ বিহীন
স.	: সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	: রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু/আনহা
র./রহ.	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি
আ.	: আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম
আঃ	: আয়াত
হি.	: হিজরি সাল
p.	: Page
pp.	: Pages
ed.	: Edition
Ibid	: ibidem (in the same place)
vol.	: Volume
AD.	: Anno Domini (In the year of our Lord)
H.	: Hijrah
HTTP	: Hyper Text Transfer Protocol
IFB	: Islamic Foundation Bangladesh
M.Phil.	: Masters of Philosophy
Ph.D.	: Doctor of Philosophy
BIIT	: Bangladesh Institute of Islamic Thought

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা

(আরবী বর্ণসমূহের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত আরবী শব্দসমূহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ হয়নি। এছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	’ (ঊর্ধ্ব কমা) অ	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/য	ة / ه	ত/হ
د	দ	ع	‘ (উল্টা কমা)	ء	’(ঊর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ/য	غ	গ	ى	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ي	ইয়ে/য়ে

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ মানুষের শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ জীবন বিধানের মূলনীতি হলো আল-কুরআন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এমন কোন দিক নেই যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আলোচনা করা হয়নি। এ মহাগ্রন্থেরই অন্যতম সুরা হলো সুরা নূর। মদিনায় অবতীর্ণ এ সুরার কোরআনিক অবস্থান হচ্ছে গ্রন্থনার ক্রমানুযায়ী ২৪ এবং নাযিলের ক্রমানুযায়ী ১০২। সুরা নূরের আয়াত সংখ্যা ৬৪ এবং রুকুর সংখ্যা ৯।

ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার অনুষ্ঠানের নামবিশেষ নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সুরা তারই একটি অকাট্য প্রমাণ। সুরা নূরের ৬৪টি আয়াতে মানব জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ সুরাটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। ইভটিজিং, অশ্লীলতা, বিশেষ করে ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদের মত মারাত্মক সামাজিক সমস্যা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এ সুরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। একটি শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানুষের কাম্য, আর ইসলাম চায় এ জাতীয় একটি কল্যাণকর সমাজ উপহার দিতে। এ লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যে সব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন সুরা নূর তারই সমষ্টি।

সুরা নূরে সমাজ সংস্কারমূলক অনেকগুলো নীতি এবং বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এ সকল সামাজিক বিধি-বিধান নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মুসলিম সমাজকে কলুষমুক্ত রাখা এবং সমাজে এর বিস্তার রোধ করা। আর যদি সমাজ কোন কারণে কলুষিত হয়ে যায় তবে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা। একমাত্র আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থতা ফিরে আসতে পারে। কেননা সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ জীবন নির্ভর করে সুষ্ঠু সামাজিক বিধি-বিধানের উপর। আল্লাহ তাআলা সুরা নূরের প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন যাতে সমাজ কোন অনৈতিক ও চরিত্র বিধ্বংসী ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে না পারে। আর যদি আক্রান্ত হয়েই যায়, তাহলে যেন তা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা যায়। এ সুরার শেষার্ধে এমন সব বিধি-বিধান ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সমাজে দোষ-ত্রুটি, পাপ ও অন্যায়ের উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

সমাজ ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; কেননা এমন কোন সমাজ নেই যেখানে সামাজিক সমস্যা নেই। সমাজের জটিল প্রকৃতিই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সামাজিক সমস্যা তাই প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক এবং এর সাথে নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, মনোস্তাত্বিক প্রভৃতি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। সামাজিক সমস্যা সার্বজনীন। স্থান-কাল ভেদে সামাজিক সমস্যার ভিন্নতা থাকলেও পৃথিবীর সকল সমাজ এবং সমাজ ইতিহাসের সকল পর্যায়েই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইসলামে কোনটি সামাজিক সমস্যা আর কোনটি সামাজিক সমস্যা নয় তা নির্ধারণের অধিকার মানুষের নয়। কেননা পৃথিবীর এমন একটি সমস্যাও নেই যেটি পুরোপুরি সমস্যা এবং যার মাধ্যমে কোনো না কোনো মানুষ কিছু না কিছু উপকার লাভ না করেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি সমস্যার ব্যাপারটি নির্ধারণ করতে যায়, তা আপেক্ষিক বিষয় হয়ে পড়বে। তাই সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণে ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

স্বীয় সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণকামী রূপ প্রকাশ করেছে। ইসলামে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনায় যেটিকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন মহান আল্লাহ সেটিকে সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সকলের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে তাঁর পক্ষেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ এবং উদার থেকে সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব। তিনি নির্ধারণ করে দেয়ার পর পৃথিবীর আর কোনো মুসলিম তাকে অস্বীকার করতে পারেনি।

তাই মহান আল্লাহই যে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যে সকল সমস্যার সমাধান মহানবি (স.) সামাজিকভাবে সম্পন্ন করেছেন সেগুলোকে সমাজিক সমস্যা বলা যায়। অন্যদিকে তিনি যেগুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি সেগুলো কখনোই কোন সমস্যাই নয়। এ ক্ষেত্রে মুমিনদের সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অসুবিধার কারণজনিত কোনো বিষয়কে যেমন পালনীয় করেননি তেমনি মানুষের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় থেকে তাদেরকে বঞ্চিতও করেননি। তিনি যে নিষিদ্ধতা দিয়েছেন, মানুষ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা না হোক, তাতে যে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অকল্যাণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার তিনি যেগুলোর বৈধতা দিয়েছেন তাতে মানুষের কল্যাণ থাকার বিষয়টি অবিসংবাদিত। এ বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়া মুমিনের ঈমান পূর্ণতা পায় না। সামাজিক সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রেও এর পরিপূর্ণ প্রকাশ অনিবার্য। এ প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়াতের সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরের জীবনীতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সুরা নূর সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধানেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সুরা স্বয়ং রাসূল (স.)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.)-এর উপর অপবাদ নিরসনকল্পে নাযিল হয়।

সামাজিক সমস্যার সমাধানে সুরা নূর অবতীর্ণ হলেও এ সুরার বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। সুরা নূরে যে সকল বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা হলো- ইভটিজিং, অশ্লীলতা, অপবাদ আরোপ, যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা, পর্দাহীনতা, বিবাহ, মিথ্যা সাক্ষ্য, অপরাধীকে শাস্তির ক্ষেত্রে মমত্ববোধ, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, কপটতা বা দ্বি-মুখী নীতি, ভালো শাসকের প্রতি সন্দেহ-সংশয়হীন আনুগত্য প্রভৃতি।

আর আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা প্রত্যক্ষ করি ইভটিজিং, অশ্লীলতা, যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপবাদ আরোপ প্রভৃতি আমাদের সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যার শিকার হয়ে অসংখ্য নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেও দ্বিধা করছে না। আবার ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা নানা ধরনের মরণব্যাধি ও রোগ ছড়ানোসহ মানুষের বংশপরম্পরাকে করছে ক্ষতবিক্ষত। সমাজের সর্বত্রই নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর মিথ্যার ছড়াছড়ি। ছোট-বড় অগণিত এ জাতীয় সমস্যা আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে।

যেকোনো সমাজকে সমস্যামুক্ত করার সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রচেষ্টা সবসময়ই আমাদের চোখে পড়ে। বড় বড় সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম হয়, দেশে-বিদেশের অসংখ্য প্রজ্ঞাবান মানুষ সে সকল সমাবেশে সমস্যা নিরসনের মোক্ষম নানা উপায় বাতলে দেন। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় সমস্যার জায়গাতেই। এর কারণ হলো, সমাজের মানুষের নিকট সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে অব্যর্থ ব্যবস্থা ও মাধ্যম রয়েছে কোনো পক্ষই সে মাধ্যমটি ব্যবহারে আগ্রহী নন। সেই ব্যবস্থাটির নাম ইসলাম। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা নির্ধারণে গৃহীত নীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের নীতি হয়তো মিলবে না; কিন্তু মানুষের সমস্যা নিরসনে ইসলাম প্রদত্ত সমাধান তাই বলে মিথ্যে হয়ে যাবে না। বরং কেবল এর সমাধান মেনে নিলেই বিশ্বের সকল মানুষ সমস্যামুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে। কারণ সামাজিক সমস্যার প্রতিটি সমস্যার সমাধানই ইসলাম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার দাবানলে জ্বলছে সমাজ। অসহায়-অত্যাচারীর চাঁপা কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সর্বত্রই শান্তির জন্য হাহাকার করছে। যদিও সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সামাজিক সম্যার সমাধানে এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আইন আদালত বর্তমান রয়েছে। তথাপি ইহা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় রয়েছে নানা জটিলতা। অবৈধ অর্থের লেনদেন, বংশীয় ও সামাজিক প্রভাব, আইনের দীর্ঘসূত্রিতা প্রভৃতি কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়া ক্রমান্বয়ে সমাজকে দুর্বিষহ করে তুলছে।

সমাজের এহেন নানাবিধ সমস্যাকে সামনে নিয়ে সুরা নূরের দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুরার বিষয়বস্তু এবং আমাদের সামাজিক সমস্যার এক চমৎকার মিল রয়েছে। মহান রব্বুল আলামিন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগত গুণ এবং দোষসমূহকে সামনে রেখে সমাজের চিরন্তন সংবিধান হিসেবে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর আল-কুরআনের অংশ বিশেষ এ সুরায় নাযিল করেছেন। আর এ সমাধানের বাস্তবতা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের ইতিহাসই সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে। এ সমাধানের আলোকেই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট একটি সমাজ সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল। যে সমাজ ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে চিরদিনই সমুন্নত থাকবে। আজকের সমস্যাবহুল সমাজে যা শুধুই কল্পনা। বাহ্যত যা রূপকথার গল্পের মত মনে হলেও দিন দুপুরের সূর্যের ন্যায়ই তা ছিল মূর্তমান।
নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশক তথা নীতিমালা হচ্ছে আল-কুরআন। ইসলামের এ নীতিমালা প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি অন্ধকার সমাজ শুধুমাত্র আলোর সন্ধানই লাভ করেনি; বরং ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সোনালী সমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ নীতিমালার গুরুত্ব পৃথিবীর কোন লেখক, কবি, সাহিত্যিক বর্ণনা কওে শেষ করতে পারবে না। তবে এতটুকুই বলা সম্ভব যে, এর আবেদন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মানে কখনোই শেষ হবে না। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, "রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন প্রধান বিচারপতি। দীর্ঘ একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও যখন তার আদালতে একটি মামলাও দায়ের হয়নি, তখন হযরত ওমর (রা.) বিচার ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন।"

নিঃসন্দেহে বলা যায় ঐ সমস্যাবিহীন শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়েছিল আল কুরআনুল কারিমের প্রদত্ত অবকাঠামো অনুযায়ী। সুতরাং আজকের এই সমাজের সমস্যাগুলোর কিছু যদি আমরা উপরোক্ত সুরার আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করি, তাহলেই সমস্যাবিহীন শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব। তাই এ সুরার গবেষণা অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে।

এ অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "সুরা নূর-এর পরিচয়, পটভূমি, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব"। এতে সুরা নূর-এর পরিচয়, নূর শব্দের তাৎপর্য, নামকরণ, নাযিলের সময়কাল, বৈশিষ্ট্য, পূর্ববতী সূরার সাথে সম্পর্ক,

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং সুরা নূর-এর সামাজিক গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর উপযোগিতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "সামাজিক সমস্যা"। এ অধ্যায়ে সামাজিক সমস্যার পরিচয়, সামাজিক সমস্যার সাধারণ কারণ ও নেপথ্য কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলাম পরিচিতি, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় এবং সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর সামাজিক ব্যাধির পরিচয়, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাসহ সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা সুন্দরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "নারী ও জৈবিক চাহিদা "। এই অধ্যায়ে প্রথমে বিভিন্ন ধর্মের নারী তথা ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের নারীদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এরপর প্রাচীন যুগের গ্রীক, রোমান, ভারত, চীন, ইউরোপীয় সভ্যতার নারী ও ইসলাম পূর্ব আরবের নারীদের অবস্থা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর আধুনিক যুগে নারী প্রগতির নামে নারীদের নৈতিকতার অবক্ষয়, অশ্লীলতার আধিক্য, যৌন ব্যাধি, যুবক-যুবতীদের উপর যৌন প্রভাব, নারীত্বের বিলোপ সাধন, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, তালাক ও বিচ্ছেদে যে জাতীয় দুর্গতি তৈরি হয়েছে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেন হচ্ছে যৌন নিপীড়ন, বাংলাদেশে যৌন নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরার পর যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, অবৈধ যৌন সম্পর্কের পাপ ও অপকারিতা, অশ্লীলতা প্রচারের গুনাহ এবং যৌন সম্পর্কের সীমা ও তার বিধান দলীল ও যুক্তির আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাবলি"। এই অধ্যায়ে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাসমূহের মধ্য থেকে সূরা নূরের নির্দেশনা অনুযায়ী সমাধানযোগ্য কয়েকটি প্রধানতম সমস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো : ইভ-টিজিং, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ও অপবাদ আরোপ। প্রথমে ইভটিজিং-এর পরিচয়, কারণ, ভয়াবহতা, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা উল্লেখপূর্বক তা থেকে উত্তরণের উপায় ও প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে। এরপর অশ্লীলতার পরিচয়, সমাজে প্রচলিত অশ্লীলতা, অশ্লীলতা প্রসারে আধুনিক গণমাধ্যমের ব্যবহার, অশ্লীলতার পরিণাম বিষয়ে বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। তারপর ব্যাপক প্রসারিত সামাজিক সমস্যা যিনা-ব্যভিচারের পরিচয়, ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও পরিণাম এবং ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা কুরআন-হাদিসের আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধর্ষণের সংজ্ঞা, প্রচলিত আইন ও ইসলামি আইনে ধর্ষণের শাস্তি, বাংলাদেশে ধর্ষণ ও ধর্ষণ শেষে হত্যার চিত্র তুলে ধরে ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ এবং তা রোধের উপায় প্রমাণ ও বাস্তবতার ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সমাজের জন্য লজ্জাকর ব্যাধি পতিতাবৃত্তির পরিচয়, পতিতাবৃত্তির ইতিহাস, পতিতাবৃত্তির বিধান ও পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামি আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের সর্বশেষে কায্ফ বা যিনার অপবাদের পরিচয়, আল-কুরআন ও হাদিসে কায্ফ বা অপবাদ, কায্ফ-এর সাধারণ বিধান এবং কায্ফ প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান"। এই অধ্যায়ে সূরা নূরের আলোকে সমাজে প্রচলিত কিছু সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানের দিক-নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে পর্দার পরিচয়, পর্দার উদ্দেশ্য, পর্দার নির্দেশাবলী দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর মানব সমাজে বিবাহের ভূমিকা ও বিবাহের আহকাম সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তারপর ইসলামের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা, ইসলামে সংযমশীলতার মর্যাদা, কুরআনে সংযমশীলতার দৃষ্টান্ত, সংযমশীলতা রক্ষার জন্য দৃষ্টিকে সংযত রাখা, নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশে

Dhaka University Institutional Repository

নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর প্রতিকারমূলক সমাধান হিসেবে যিনার শাস্তি, পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে যিনার শাস্তি, ইসলামে যিনার শাস্তির ক্রম বিবর্তন, যিনা প্রমাণের পদ্ধতি এবং যিনার অপবাদের শাস্তি, শর্তাবলী, যিনার অপবাদের বিভিন্ন ভাষা ও তার হুকুম, লি'আনের নিয়ম এবং যিনার অপবাদের শাস্তি রহিত হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে কুরআন, হাদিস ও ফিকহের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ সূরা নূর-এর পরিচয়, পটভূমি, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব	**পৃষ্ঠা নং** **১-২৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর পরিচয়	**২**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর বিষয়বস্তু	**১৩**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর ঐতিহাসিক পটভূমি	**১৬**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর সামাজিক গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর উপযোগিতা	**২০**

দ্বিতীয় অধ্যায় : সামাজিক সমস্যা	**২৪-৫২**
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যার পরিচয়	**২৫**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যার নেপথ্য কারণ	**২৯**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি	**৩৭**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	**৪০**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও বাংলাদেশ	**৪৯**

তৃতীয় অধ্যায় : নারী ও জৈবিক চাহিদা	**৫৩-১১৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মের আবর্তে নারী	**৫৪**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাচীন যুগ ও নারী	**৬৯**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগ ও নারী	**৮০**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার নারী	**৯৬**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা	**১০০**

চতুর্থ অধ্যায় : ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাবলি	**১১৮-১৭৪**
প্রথম পরিচ্ছেদ : ইভ-টিজিং	**১১৯**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অশ্লীলতা	**১২৭**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যিনা-ব্যভিচার	**১৪৩**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধর্ষণ	**১৪৯**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পতিতাবৃত্তি	**১৬৩**
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অপবাদ আরোপ	**১৬৯**

পঞ্চম অধ্যায় : সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান	**১৭৫-২৩৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ : পর্দা	**১৭৬**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ	**১৯২**

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংযমশীলতা	**২০৬**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যিনার শাস্তি	**২১৪**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অপবাদ আরোপের শাস্তি	**২২৭**

উপসংহার	**২৩৬**
গ্রন্থপঞ্জি	**২৩৭**

প্রথম অধ্যায়
সূরা নূর-এর পরিচয়, পটভূমি, বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর বিষয়বস্তু
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর ঐতিহাসিক পটভূমি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সূরা নূর-এর সামাজিক গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর উপযোগিতা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ
সূরা নূর-এর পরিচয়

সূরা নূর পবিত্র কুরআনের ২৪তম সূরা। ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার অনুষ্ঠানের নামবিশেষ নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সূরা তারই একটি অকাট্য প্রমাণ। সূরা নূরের ৬৪টি আয়াতে মানব জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। ইভটিজিং, অশ্লীলতা, বিশেষ করে ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদের মত মারাত্মক সামাজিক সমস্যা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এ সূরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। একটি শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানুষের কাম্য, আর ইসলাম চায় এ জাতীয় একটি কল্যাণকর সমাজ উপহার দিতে। এ লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যে সব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন সূরা নূর তারই সমষ্টি।

একনজরে সূরা নূর

নাম : নূর

শ্রেণী : মাদানি সূরা

নামের অর্থ : আলো

পরিসংখ্যান

সূরার গ্রন্থনার ক্রম : ২৪

সূরার নাযিলের ক্রম : ১০২

আয়াতের সংখ্যা : ৬৪

রুকুর সংখ্যা : ৯

পূর্ববর্তী সূরা : সূরা আল-মুমিনূন

পরবর্তী সূরা : সূরা আল-ফুরকান

সূরা নূর-এর পরিচয়

سُوْرَةُ النُّوْرِ যৌগিক শব্দটি سُوْرَةٌ এবং النُّوْرُ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে গঠিত। নিম্নে শব্দ দু'টির পরিচয় তুলে ধরা হলো:

سُوْرَةٌ শব্দের পরিচয়

سُوْرَةٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন سُوَرٌ، سُوْرٌ ।[১] এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো, দেয়ালে পাথরের সারি, (ভবনের) সুউচ্চ ও সুন্দর অংশ, সম্মান, মর্যাদা, পদমর্যাদা, চিহ্ন, পবিত্র কোরআনের অধ্যায়, সূরা।[২]

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে:

১. পার্থক্য করা, পৃথক করা বা ভিন্ন করা। যেহেতু প্রতিটি সূরা অন্য সূরা থেকে পৃথক তাই একে সূরা বলা হয়।

২. উচ্চতা অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেহেতু পবিত্র কুরআনের পাঠকের মর্যাদা প্রতিটি সূরা পাঠ শেষে উঁচু হয় ও বৃদ্ধি পায়, তাই একে সূরা বলা হয়।

৩. খণ্ড, অংশ, টুকরা। এ অর্থে আল-কুরআনের প্রতিটি সূরা কুরআনের এক একটি অংশ বা খণ্ডস্বরূপ। যেমন- সূরা আল-বাকারায় এসেছে- فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ "তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা নিয়ে এসো।"[৩]

এখানে সূরা অর্থ আল-কুরআনের একটি খণ্ড বা অংশ। আরবীতে 'সূর' দুর্গকেও বলা হয়। একটি দুর্গ কয়েকটি মহল ও ঘরকে ঘিরে রাখে। এ হিসেবে আল-কুরআনের অধ্যায়সমূহকে সূরা বলার তাৎপর্য এই যে, প্রতিটি সূরা কতগুলো আয়াতকে যেন দুর্গের ন্যায় ঘিরে রেখেছে, তাই একে সূরা বলা হয়।

৫. সূরা অর্থ বিধান সম্বলিত বাক্য। যেমন- سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا

"আমি বিধান সম্বলিত এই বাণী নাযিল করেছি।"[৪]

৬. পুস্তকের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ। আল-কুরআনের পরিভাষায় প্রতিটি সূরা কুরআন মাজীদের এক একটি অধ্যায়ের

নাম।

نُوْرُ এর শাব্দিক পরিচয়

نُوْرُ (নূর) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন أَنْوَارٌ।[৫] এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো- আলো, আলোক, উজ্জ্বলতা, কিরণ, জ্যোতি, প্রদীপ, বাতি। এবং النُّوْرُ জ্যোতির্ময় সত্তা: আল্লাহ, সূরা আন-নূর: পবিত্র কোরআনের ২৪ তম সূরা।[৬]

نُوْرُ এর আভিধানিক পরিচয়

- নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন, الظَّاهِرُ بِنَفْسِه والمُظْهِرُ لِغَيْرِهِ অর্থাৎ 'যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে।'[৭]

---

১. *আল-মু'জামুল অসীত*, (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ২০০১খৃ.), পৃ. ৪৬২

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী], (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ৫৮১

৩. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা (২) : ২৩

৪. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ১

৫. *আল-মু'জামুল অসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬২

৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮৯

৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নবম সংস্করণ,২০১২),খ.৬, পৃ. ৪১৫

- তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে।' যেমন- সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।[৮]

نُوْرُ এর তাৎপর্য

সূরা নূর-এর মধ্যে উল্লিখিত نُوْرُ শব্দটির মর্মার্থ ৩টি হতে পারে। যথা-

১.আল্লাহর নূর

২.মুমিনের নূর

৩. নবি করিম (স.)-এর নূর

নিম্নে উক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১.আল্লাহর নূর। কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর জন্য **'নূর'** কয়েকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে:

এক. আল্লাহর নাম হিসেবে

যে সমস্ত আলেমগণ এটাকে আল্লাহর নাম হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন তারা হলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ খাত্তাবী, ইবনে মান্দাহ, হালিমী, বাইহাকী, ইস্পাহানী, ইবনে আরাবী, কুরতুবী, ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনুল ওয়ায়ীর, ইবনে হাজার, আস-সাদী, আল-কাহ্তানী, আল-হামুদ, আশ শারবাসী, নূরুল হাসান খান প্রমুখ।

দুই. আল্লাহর গুণ হিসেবে

আল্লাহর তা'য়ালা নূর নামক গুণ তাঁর জন্য বিভিন্নভাবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন-(ক) কখনো কখনো সরাসরি নূরকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ অর্থাৎ "আল্লাহর নূরের উদাহরণ হলো...।[৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا অর্থাৎ "আর আলোকিত হলো যমীন তার প্রভূর আলোতে।"[১০] হাদিসে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ،

"আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাতে তাঁর নূরের কিছু ঢেলে দিলেন। সুতরাং এ নূরের কিছু অংশ যার উপরই পড়েছে, সে হেদায়াত লাভ করেছে। আর যার উপর পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।"[১১] (খ) কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা তাঁর এ নূরকে তার চেহারার দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'আসমান ও যমীনের যাবতীয় নূর তাঁরই চেহারার আলো।[১২]

তিন. আল্লাহর নূরকে আসমান ও যমীনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে

---

৮. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, (নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, তৃতীয় প্রকাশ,২০১২),খ. ৮, পৃ. ৪২৬

৯. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩৫

১০. আল-কুরআন, সূরা আয-যুমার (৩৯) : ৬৯

১১. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০২), খ. ৮, পৃ. ১২০; তিরমিযী, *আল-জামি'*, (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮), হাদিস নং- ২৬৪২

১২. আবু সাঈদ, দারেমী

আল্লাহর নূরকে আসমান ও যমীনের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ "আল্লাহ আসমান ও যমীনের নূর।"[১৩]

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

"হে আল্লাহ, আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আপনি আসমান ও যমীনের আলো এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তারও (আলো)...।[১৪]

চার. আল্লাহর পর্দা ও নূর

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

حِجَابُهُ النُّورُ তাঁর পর্দা হলো নূর।[১৫] আর আল্লাহর রসূল (স.) মিরাজের রাতে এর নূরই দেখেছিলেন। হযরত আবু যর (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

"আপনি কি আপনার প্রভূকে দেখেছিলেন? তিনি বললেন, নূর! কিভাবে তাকে দেখতে পারি?"[১৬] অপর বর্ণনায় এসেছে رَأَيْتُ نُورًا "আমি নূর দেখেছি।"[১৭] এ হাদিসের সঠিক অর্থ হলো, আমি কিভাবে তাঁকে দেখতে পাব? সেখানে তো নূর ছিল। যা তাকে দেখার মাঝে বাধা দিচ্ছিল। আমি তো কেবল নূর দেখেছি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর পর্দাও নূর। এ নূরের পর্দার কারণেই সবকিছু পুড়ে যাচ্ছে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ

"যদি তিনি তাঁর পর্দা খুলতেন তবে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর নজর পড়ত সবকিছু তাঁর চেহারার আলোর কারণে পুড়ে যেত।"[১৮] সুতরাং আসমান ও যমীনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দু'ধরনের নূরই আল্লাহর প্রকাশ্য নূর। যেমন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নূর। তাঁর পর্দা নূরের। যদি তিনি তাঁর সে পর্দা উন্মোচন করেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টির যতটুকুতে তাঁর দৃষ্টি পড়বে তার সবকিছুই ভস্ম হয়ে যাবে। তাঁর নূরেই আরশ আলোকিত। তাঁর নূরেই কুরসী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি আলোকিত। অনুরূপভাবে তাঁর নূরেই জান্নাত আলোকিত। কারণ, সেখানে তো আর সূর্য নেই। আর অপ্রকাশ্য নূর যেমন-

وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ

আল্লাহর কিতাব নূর।[১৯],

اِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

তাঁর শরীয়ত নূর।[২০],

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

---

১৩. *আল-কুরআন*, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩৫

১৪. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: দারু তাওকিন্নাজাত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২),খ. ৮, পৃ. ৮৭০, হাদিস নং ৬৩১৭; ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি), খ. ১. পৃ. ৫৩২, হাদিস নং-৭৬৯

১৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৬১, হাদিস নং-২৯৩

১৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৬১, হাদিস নং-২৯১

১৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৬১, হাদিস নং-২৯২

১৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১. পৃ. ১৬১, হাদিস নং-২৯৫

১৯. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ (৭) : ১৫৭

২০. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা (৫) : ৪৪

তাঁর বান্দা ও রসূলদের অন্তরে অবস্থিত ঈমান ও জ্ঞান তাঁরই নূর।[২১]

যদি এ নূর না থাকত তাহলে অন্ধকারের উপর অন্ধকারে সবকিছু ছেয়ে যেত। সুতরাং যেখানেই তাঁর নূরের অভাব হবে সেখানেই অন্ধকার ও বিভ্রান্তি দানা বেঁধে থাকে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স.) দো'আ করতেন,

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا» أَوْ قَالَ: «وَاجْعَلْنِي نُورًا». وفي راية وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا».

"হে আল্লাহ, আমার অন্তরে নূর দিন, আমার শ্রবণেন্দ্রীয়ে নূর দিন, আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দিন, আমার ডানে নূর দিন, আমার বামে নূর দিন, আমার সামনে নূর দিন, আমার পিছনে নূর দিন, আমার উপরে নূর দিন, আমার নীচে নূর দিন। আর আমার জন্য নূর দিন অথবা বলেছেন, আমাকে নূর বানিয়ে দিন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আর আমার জন্য আমার আত্মায় নূর দিন। আমার জন্য বৃহৎ নূরের ব্যবস্থা করে দিন।"[২২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, "হে আল্লাহ, আমাকে নূর দিন, আমার জন্য আমার অস্থি ও শিরা-উপশিরায় নূর দিন। আমার মাংসে নূর দিন, আমার রক্তে নূর দিন, আমার চুলে নূর দিন, আমার শরীরে নূর দিন।" অপর বর্ণনায় এসেছে,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ... ونورا في عظامي

"হে আল্লাহ, আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন। আমার হাড্ডিতে নূর দিন।"[২৩] অন্যত্র এসেছে,

وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا

"আর আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন, আমার নূর বাড়িয়ে দিন।"[২৪]

وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورٍ

"আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন।"[২৫]

পাঁচ. আল্লাহ নূর দানকারী

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে।' যেমন- সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে।[২৬]

এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তাফসিরবিদের মতে 'মুনাওয়ির' অর্থাৎ 'উজ্জ্বল্যদানকারী' অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে 'ন্যায়পরায়ণতা' বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তাফসিরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা

---

২১. আল-কুরআন, সূরা যুমার (৩৯) : ২২

২২. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত,খ. ৮, পৃ. ৮৭০, হাদিস নং ৬৩১৬; ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১. পৃ. ৫৩২, হাদিস নং-৭৬৩

২৩. তিরমিযী, *আল-জামি'*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ৩৪১৯

২৪. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, (বৈরূত: দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া, তৃতীয় সংস্করণ,১৯৮৯), পৃ. ২৪২

২৫. ইব্ন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ), খ. ১১, পৃ. ১১৮

২৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪২৬

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টজীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে।

ইবনে কাসীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তাফসির এরূপ বর্ণনা করেছেন,

عن ابن عباس: {الله نور السموات والأرض} يقول: هادي أهل السموات والأرض

"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়াতকারী।"[২৭]

২. মুমিনের নূর

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ মুমিনের অন্তরে আল্লাহ তাআলার যে নূরে-হিদায়াত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে এর তাফসির প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন,

هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال: {الله نور السموات والأرض} فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال: فكان أبي بن كعب يقرؤها: "مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره.

"এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কোরআনের নূরে-হিদায়াত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তাআলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন, **الله نور السموات والأرض** অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন **مَثَلُ نُورِهِ** উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এই আয়াতের কিরাআতও (**مَثَلُ نُورِهِ**) এর পরিবর্তে (**مثل نور من آمن به**) পড়তেন।[২৮]

সাঈদ ইবনে জুবায়ের এই কিরাআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর লিখেছেন,[২৯]

مَثَلُ نُورِهِ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। এক. এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হিদায়াত, যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত **كَمِشْكَاةٌ** এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি।

দুই. সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মুমিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপসদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মুমিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল রাখা নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহর ওহি ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়িগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

---

২৭. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত)*, (খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প), পৃ. ৯৪৪

২৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৪১৫

২৯. ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১১৬

একটি সহিহ হাদিস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে,

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، »

"প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে।"[৩০]

এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত। ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গম্বর ও তাদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহির জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। মুমিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।[৩১] এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক; বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন,

اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَى + فَأَوَّلُ مَنْ يُجْنِيْ عَلَيْهِ اِجْتِهَادُهُ

অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।'[৩২]

৩. নবি করিম (স.)-এর নূর

ইমাম বাগাভী (র.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আয়াতের তাফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তাওরাত ও ইনজীলের সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন : এটা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। 'মিশকাত' তথা 'তাক' মানে তার বক্ষদেশ, زُجَاجَة তথা কাচপাত্র মানে- তার পূতপবিত্র অন্তর এবং مِصْبَاحٌ তথা প্রদীপ মানে নবুওয়ত। এই নবুয়তরূপী-নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও উজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহি ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুওয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মের পূর্বে তার নবুওয়াতের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদিসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা 'মুজিযা' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুওয়াতের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুওয়ত দাবির পূর্বে এক ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালদীন সুয়ূতী 'খাসায়েসে-কোবরা' গ্রন্থে আবু নায়ীম 'দালায়েলে নবুওয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিম স্বতন্ত্র

---

৩০. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ১০০, হাদিস নং ১৩৮৫, ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ. ২০৪৭, হাদিস নং-২৬৫৮

৩১. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ৩৫

৩২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ.৬,পৃ. ৪১৭

গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতে অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।[৩৩]

সূরা নূর-এর নামকরণ

নামহীন বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই যে কোন কিছুর নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণের মাধ্যমেই কোন বস্তুর বিমূর্ত বিষয় মূর্ত হয়ে উঠে। তাই নামকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। সূরাসমূহের নাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর নামকরণ মানব রচিত সাহিত্য কর্মের মত নয়। এ নামগুলো প্রতিটি সূরার জন্যে এক একটি প্রতীকস্বরূপ। সূরা নূরের নামকরণের ভিত্তি হচ্ছে 'নূর' শব্দটি। এ শব্দটি এ সূরার পঞ্চম রুকুর প্রথম আয়াত এবং সূরার ৩৫ নং আয়াত ' اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ '[৩৪] গৃহীত। তাফসিরবিদগণ এ সূরার নামকরণে কতিপয় কারণ উল্লেখ করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হল,

ক. মহান আল্লাহ স্বয়ং নূর

মহান আল্লাহ তাআলা হলেন নূর, আর একথাটি অত্র সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় বলা হয়েছে আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে নূর। এখানে নূর বলতে হিদায়াতের নূর বা আলোকে বুঝানো হয়েছে। ফলে এর নাম সূরা নূর রাখা হয়েছে।[৩৫] এ ব্যাপারে তাফসির ফী যিলালিল কোরআন গ্রন্থে আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'নূর'- আলো বা আলোকবর্তিকা... এখানে শুভ্র সমুজ্জ্বল, আলোকবর্তিকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নিজ অস্তিত্বের সাথে, এই সূরারই এক আয়াতে যেমন রয়েছে "আল্লাহ তা'য়ালাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর।"[৩৬]

খ. সমাজকে নূর বা আলো প্রদানকারী

নূর অর্থ আলো বা জ্যোতি। নূর কলতে এমন বিষয় বা বস্তুকে বুঝায় যার সাহায্যে অন্য বস্তু আলোকিত, বিকশিত ও উদ্ভাসিত হয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে ব্যভিচার, অনাচার, অবিচার এবং অসামাজিক কাজকর্ম সংঘটিত হতো, যার ফলে মানব সমাজ অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সূরা আন-নূর এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর আইন করে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর সন্ধান দেয়। তাই এ সূরাকে 'সূরাতুন নূর' তথা 'আলোর সূরা' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

গ. বিষয় বস্তুর আলোকে

তাফসিরবিদগণ মনে করেন, সূরা আন-নূরে এমন কতিপয় বিধান ও হিদায়াত বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যা মেনে চললে মানব জীবন আলোকময় হয়ে উঠে। এ সব বিধিবিধান মূলত হিদায়াতের নূর বা আলো এবং এ নূরের কেন্দ্রবিন্দু হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আর এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আন-নূর।[৩৭]

সূরা নূর নাযিলের সময়কাল

গ্রন্থনার ধারাবাহিকতায় সূরাটি ২৪তম সূরা এবং নাযিলের ধারাবাহিকতায়১০২ তম সূরা। সূরাটি সূরা আল-হাশরের পরে নাযিল হয়।[৩৮]এ সূরাটি যে বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়, এ বিষয়ে সবাই

---

৩৩. প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ৪১৭

৩৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩৫

৩৫. ইসলামিক স্টাডিজ, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা), পৃ. ৬১

৩৬. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (ইউ কে: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ৪র্থ সংস্করণ,২০০৩খৃ.), খ. ১৪, পৃ.৭৯

৩৭. বাউবি, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৩৮. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত,খ. ৮, পৃ. ২৭৭

একমত।[৩৯] তবে কোন হিজরিতে নাযিল হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসিরবিদগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু মতামত তুলে ধরা হলো, এ সূরাটি পঞ্চম হিজরি সনে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত। এ সূরাটি বনি মুস্তালিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মদিনায় নাযিল হয়। পঞ্চম হিজরিতে বনি মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে অভিযান থেকে ফেরার কিছুদিন পরই এ সূরা নাযিল হতে থাকে। ইফকের ঘটনাটিও পঞ্চম হিজরিতেই সংঘটিত হয়েছিল, যা এ সূরার একটি মূল আলোচিত বিষয়। এ সকল প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পঞ্চম হিজরি সনে এ সূরাটি নাযিল হয়।[৪০]

তবে আল্লামা সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) স্বীয় গ্রন্থ তাফসির ফী যিলালিল কোরআন-এ বলেন এটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ হিজরীর মধ্যে অবতীর্ণ সূরা।[৪১]

কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়িশা (রা.) এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে এটি নাযিল হয়।[৪২] দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূতে এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ ঘটনাটা ঘটে । কিন্তু এ যুদ্ধটা ৫ হিজরি সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরিতে আহযাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পর্দার বিধান কুরআন মাজিদের দুটি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটা সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুরা আহযাব। আর আহযাব যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাযিল হয় এ ব্যাপারে কারোর দ্বিমত নেই। এখন যদি আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, পর্দার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহযাবে নাযিলকৃত নির্দেশসমুহের মাধ্যমে এবং তাকে পূর্ণতা দান করে এ সূরার নির্দেশগুলো। আর যদি বনি মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং তার পূর্ণতা সূরা আহযাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা পর্দার বিধানে ইসলামি আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে নাযিলের সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরি।

ইবন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, বনি মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরি ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর ঐ বছরেরই যিলকদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব যুদ্ধ। এর সমর্থনে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনো কোনোটিতে হযরত সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) ও হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা.)-এর বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদিস অনুযায়ী হযরত সা'দ ইবন মুআয রা.-এর ইন্তিকাল হয় বনি কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই ৬ হিজরিতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

অন্যদিকেই ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরির শা'বান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়িশা (রা.) ও অন্যান্য লোকদেও থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয় আর এ বিধান পাওয়া যায় সুরা আহযাবে। এ থেকে জানা যায়, সে সময় হযরত যয়নব (রা.)-এর সাথে নবী (সা.)-এর বিয়ে হয়ে

---

৩৯. উলামা বোর্ড কতৃক সম্পাদিত, *আত-তাফসিরুল মুয়াসসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০

৪০. বাউবি, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

৪১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৯

৪২. আয-যামাখশারি, *তাফসিরে কাশশাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮-৭৪০

গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরির জিলকদ মাসের ঘটনা। সূরা আহযাবে এ ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদিসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত যয়নব (রা.)-এর বোন হামনা বিনতে জাহ্শ হযরত আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোয় শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়িশা তাঁর বোনের সতিন ছিলেন। আর একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ্য ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়।

মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর উপস্থিতির বর্ণনা থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসংগে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে যেসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সা'দ ইবনে মা'আয (রা.)-এর কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তার পরিবর্তে হযরত উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর (রা.)-এর কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য যদি বনী মুস্তালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহযাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত অবতীর্ণ হওয়া ও যয়নব (রা.)-এর বিয়ের ঘটনা তার পূর্বে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কোরআন ও অসংখ্য সহিহ হাদিস উভয়ই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যয়নব (রা.)-এর বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহযাব ও কুরাইযার পরবর্তী ঘটনা। এ কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন যে, আহযাব যুদ্ধ ৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা এবং বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরির শা'বান মাসে। এ মতটি মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) গ্রহণ করে তাফসির মা'আরেফুল কোরআনে বলেন যে, ষষ্ঠ হিজরিতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলো।[৪৩] এবং আমিও এই মতটি সঠিক মনে করি।

সূরা নূরের বৈশিষ্ট্য

এই সূরার অধিকাংশ বিধান নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ ও পর্দা-পুশিদা সম্পর্কিত। এরই পরিপূরক হিসেবে ব্যভিচারের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরা আল-মুমিনূনে মুসলমানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য যেসব গুণের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ ছিল যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এটাই সতীত্ব অধ্যায়ের সারমর্ম। এ সূরায় সতীত্বের প্রতি গুরুত্বদানের জন্যে এতদসম্পর্কিত বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে। এ কারণেই নারীদেরকে এই সূরা শিক্ষা দেয়ার জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে।[৪৪]

হযরত ওমর ফারুক (রা:) কুফাবাসীদের নামে এক ফরমানে লিখেছিলেন, علموا نساءكم سورة النور অর্থাৎ "তোমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সূরা আন-নূর শিক্ষা দাও, যাতে করে তারা অবহিত হয় যে, চরিত্রের পবিত্রতাই হলো নূর এবং চরিত্রের অপবিত্রতা হলো অন্ধকার।"[৪৫]

হযরত আয়িশা (রা.) বলতেন, স্ত্রীলোকদেরকে উঁচু ইমারতে অবস্থান করাবেনা, তাদেরকে লেখা শিক্ষা দেবেনা, তাদেরকে সূরা নূর শেখাবে এবং তাদেরকে চরকায় সূতো কাটা শিক্ষা দেবে।[৪৬]

---

৪৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত,খ. ৬, পৃ.৩৬০

৪৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত)*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৪

৪৫. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নুরুল কোরআন*, (ঢাকা: আল-বালাগ পাবলিকেশন্স,তৃতীয় প্রকাশ,২০০৮), খ. ১৮, পৃ. ১২৫

৪৬. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১২৫; তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইসি কালতী (র.), খ.৫, পৃ. ৯৩

সায়ীদ ইবনে মনসুর, এবনুল মুনজের, বায়হাকী মুজাহেদ (র.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা শেখাও আর তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সুরায়ে নূর শেখাও।"[৪৭]

হারেসা ইবনে মেজরাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "তোমরা তোমাদের স্ত্রী লোকদেরকে সূরায়ে নিছা, সূরায়ে আহযাব এবং সূরায়ে নূর শেখাও।"[৪৮]

এ সূরার ভূমিকা যে ভাষায় রাখা হয়েছে; অর্থাৎ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا এটাও এ সূরার বিশেষ গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ সূরার প্রথম আয়াতটি ভূমিকাস্বরূপ, যদ্দ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য।[৪৯]

তাফসির ফী যিলালিল কোরআনে এই সূরার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সূরাটি শুরু হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অকাট্য এক ঘোষণার সাথে, যার মধ্যে সূরার মধ্যে বর্ণিত আলোচ্য বিষয়সমূহের পূর্বাভাস এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নির্দেশাবলী, তার দেয়া সীমারেখাগুলো ও বাধ্যতামূলক কাজগুলোর বর্ণনা-সবই স্থান পেয়েছে।[৫০] তিনি আরো বলেন, অন্য সূরার তুলনায় সমগ্র কোরআনের মধ্যে এ হচ্ছে এক অতুলনীয় ভূমিকা সম্বলিত সূরা। এখানে নতুন একটি কথা দেখতে পাচ্ছি 'ফারাদ্বনাহা' অর্থাৎ 'আমি একে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছি।' এ কথার যে অর্থ আমরা বুঝেছি তা হচ্ছে, সূরাটির মধ্যে বর্ণিত কথাগুলোকে একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, বাড়ি-ঘরের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা এবং পরস্পরের সাথে ব্যবহারের আদব কায়দা রক্ষা করা তেমনই ফরয, যেমন অন্যান্য শাস্তিযোগ্য আইন মানা ফরয। মানুষের স্বভাব প্রকৃতির মধ্যেই এই আদব রক্ষা করার প্রবণতা বর্তমান রয়েছে; অবশ্যই প্রবৃত্তির তাড়না অথবা মানবিক দুর্বলতার কারণে মানুষ এসব আদব কায়দা অনেক সময় ভুলে যায়, সেজন্যেই আলোচ্য সূরার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন মানব সমাজে শান্তি রক্ষায় এসব আদব-কায়দার গুরুত্ব কত বেশী।[৫১]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা মুমিনুন এর প্রারম্ভে মুমিনদের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছিল যে, মুমিনদের নৈতিক মান উন্নীত থাকে, তারা চরিত্র মাধুর্যের অধিকারি হয়, কখনো তারা অন্যায় অসৎ ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়না, ব্যভিচারের ন্যায় ঘৃণ্য, নিন্দনীয় অসামাজিক কাজ থেকে তারা থাকে অনেক দূরে আর এমনি গুণাবলীর অধিকারি হওয়ার কারণেই তারা হয় জান্নাতুল ফেরাদৌসের উত্তরাধিকারি। আর এ সূরার প্রারম্ভে সে সব লোকদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে যারা চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দেয়, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে মানবতার অবমাননা করে, যারা এ পর্যায়ে সীমালংঘন করে। যারা এমনি অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তর থেকে নূর দূরীভূত হয়ে যায়। আর যারা অনাচার, ব্যাভিচার থেকে আত্মরক্ষা করে তাদের অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, ঐ নূরই কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হবে। এজন্যে হাদিস শরিফে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, পুলসিরাতে পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর বিদায় নেবে, তারা আর

---

৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১২৫

৪৮. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১২৫

৪৯. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৭

৫০. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৮০

৫১. প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৮২

পুলসিরাতের পথ দেখবেনা। এজন্যে মুমিনগণ ভীত সন্ত্রস্ত হবে যে মুনাফেকদের ন্যায় মুমেনদের নূরও দূরীভূত না হয়।[৫২] এ কারণেই মুমিনরা আল্লাহর দরবারে তাদের নূরকে পরিপূর্ণ করার জন্যে মুনাজাত করে বলে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিও এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৫৩]

আর এই নূর কোথায় পাওয়া যায় একথার জবাবও রয়েছে আলোচ্য সূরায়, অর্থাৎ মসজিদসমূহে, আল্লাহর জিক্‌রের মাধ্যমে তথা তাঁর বন্দেগির মাধ্যমে।

পক্ষান্তরে, অন্ধকার সৃষ্টি হয় অন্যায়-অনাচার ও ব্যভিচার এবং জুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে। আর এ নূর হলো হেদায়েতের নূর। এ নূরের প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"আর আল্লাহই আসমান-জমীনের নূর।"[৫৪]

অতএব, মুমিনগদের নেক আমল হলো নূরানি এবং তার দ্বারা মুমিনের কাল্‌ব থেকে নূর বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্য মানুষের অন্তরও আলোকিত হয়। অন্যদিকে যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের থেকে গোমরাহির অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। যারা এ জীবনে সিরাতুল মুস্তাকিম বা সরল সঠিক পথে চলে, তারাই কাল কেয়ামতের দিন অতি সহজে পুলসিরাত পার হবে। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবনে অন্যায়-অনাচারে, ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তারা গোমরাহির অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকবে। তারা কাল কেয়ামতের কঠিন দিনে পুলসিরাত পার হতে পারবেনা। যদি তাওবা করে ক্ষমা লাভ করতে না পারে, তবে তাদের জীবন হবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।[৫৫] এজন্যে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে, পরহেজগারি অবলম্বন করে, তারাই হবে (জীবন-সাধনায়) সফলকাম।"[৫৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সূরা নূর-এর বিষয়বস্তু

সূরা নূর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ২৪তম সূরা। এ সূরা নাযিল হয়েছিল এক কঠিন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি ও পরিবেশে। শক্তির দাপটে নবোত্থিত ইসলামি শক্তিকে পরাজিত করতে না পেরে ইয়াহূদি, মুশরিক ও মুনাফিকগোষ্ঠী মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রের উপর মিথ্যা কলংক লেপনের মাধ্যমে-এর গতিরোধ করতে

৫২. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১২৬

৫৩. আল-কুরআন, সূরা আত-তাহরিম (৬৬) : ৮

৫৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩৫

৫৫. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১২৭

৫৬. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৫২

চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই হীন চক্রান্ত সফল হয়নি। আল্লাহ্ তাআলা ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক সংশোধনমূলক এবং অপরাধ প্রতিরোধমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী এ সূরায় নাযিল করেন। এর দ্বারা সমাজকে সংশোধন ও বিনির্মাণ করা হয়। সূরায় আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ, ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তির বিধান, পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের সুস্থতা এবং পূণর্গঠনের বিধান। এ সূরায় সমাজ-সভ্যতাকে কলুষমুক্ত করার লক্ষ্যে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনার চর্চা ও চরিত্রহীনতা প্রতিরোধের বিধান দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন তাফসিরবিদগণ সূরা নূরের বিষয়বস্তু ও আলোচ্যবিষয় তাদের বক্তব্যের মধ্যে তুলে ধরছেন। মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, সর্বপ্রথম এ সূরার গুরুত্ব অনুধাবনের ও উপদেশ গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে যে সব মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছিল, তাদের শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। অবশেষে তৌহিদের বিবরণ ও আখেরাতের স্মরণের তাগিদ করে সূরা শেষ করা হয়েছে।[৫৭]

তাফসির মা'আরেফুল কোরআনে বলা হয়েছে, বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যভিচারের শাস্তি -যা সূরা নূরের উদ্দেশ্য-উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও এজন্যে দৃষ্টির হেফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হয়েছে।[৫৮]

সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) তাফসির ফী যিলালিল কোরআন গ্রন্থে বলেন, এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে নূর- আলো বা আলোকবর্তিকা...এখানে শুভ্র সমুজ্জ্বল, আলোকবর্তিকা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, যার সম্পর্ক রয়েছে স্বয়ং আল্লাহর নিজ অস্তিত্বের সাথে, এই সূরারই এক আয়াতে যেমন রয়েছে আল্লাহ তায়ালাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। এ আলোর প্রভা ও প্রকাশ অবশ্যই আলোকিত অন্তর ও আত্মাগুলোকে প্রভাবিত করে, এ প্রভাবসমূহ অতপর মানুষের মধ্যে আদব শৃঙ্খলা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চরিত্র আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই কথাগুলোই হচ্ছে এ সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়।[৫৯]

তাই দেখা যায়, সমগ্র সূরাটি জুড়ে রয়েছে সেই সব শিক্ষা, যা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার পর্যন্ত একটা সমাজ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষার আলোকেই অন্তর আলোকিত হয়, জীবন সমুজ্জ্বল হয়। গোটা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে আলোকমালা রয়েছে তার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে মানবাত্মাগুলোকে স্নিগ্ধ পবিত্র আলো দান করে, এ আলোই মানুষের অন্তরসমূহে প্রবিষ্ট হয় এবং এটা বিবেকের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এসব কিছুই মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সুবিশাল আলোকবর্তিকা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। আরো বর্ণিত হয়েছে জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও চারিত্রিক মূলনীতিগুলো।

মূল যে বিষয়টিকে ঘিরে সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলো আবর্তিত হয়েছে তা হচ্ছে মানুষকে সত্যিকারে ভালো মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করা, তাদের চেতনা ও আবেগ-অনুভূতিকে সন্নিহিত করা, জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে চারিত্রিক মাপকাঠির এতোটা উন্নয়ন করা যেন জীবনের সব কিছুর ওপর এর প্রভাব পড়ে ও আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নূরের সাথে এর একটা সংযোগ সাধিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক নিয়ম শৃংখলা গড়ে ওঠে, বাড়িঘর ও পরিবারের মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর ব্যবস্থা রক্ষিত হয়, দল ও দলীয় নেতৃত্ব সবাই যেন আল্লাহর ওপর ইমানের মূল উৎস থেকে জীবনের সুমধুর রস গ্রহণ করতে পারে, সবশেষে

---

৫৭. মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১২৭

৫৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৩৭

৫৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৭৯

সেই কেন্দ্রীয় নূরের সাথে সবাই গিয়ে মিলিত হয়, এটা মূলত আল্লাহ রব্বুল ইযযতেরই নূর। এই নূরই সব কিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে সব কিছুকে আলোকিত করে, সমুজ্জ্বল করে ও পবিত্র বানায়।

তাই সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র.) বলেন, "সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম। তার আলোচনাকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে,[৬০]

এক. এ অধ্যায়ে যিনার ওপর প্রথম ও চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়ক শাস্তির বিধান সম্পর্কেও ঘোষণা দেয়া হয়েছে। চরম ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে এ জঘন্য অপরাধের প্রতি এবং মুসলিম জামায়াত থেকে যিনাকারীদেরকে একঘরে করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক রাখা হয়নি, ওরাও মুসলিম জামায়াতের কেউ নয় বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর সূরাটিতে পাথর মেরে হত্যা করার হুকুম জারি করা হয়েছে এবং এই কঠোরতার কারণও জানানো হয়েছে। তারপর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে লানত পাঠানোর অবস্থায় তাদেরকে পৃথক হওয়া থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। এরপর মিথ্যা দোষারোপ (ইফ্ক)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে...আর এ অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, নষ্ট পুরুষ নষ্ট মেয়ের জন্যে এবং নষ্ট মেয়ে নষ্ট পুরুষের জন্যে, অপরদিকে চরিত্রবান পুরুষ এর উপযোগী চরিত্রবতী স্ত্রী লোক এবং চরিত্রবতী স্ত্রী লোক চরিত্রবান পুরুষের জন্যে উপযোগী, অর্থাৎ যারা যেমন তাদের মতন মানুষের সাথেই হতে পারে।

দুই. এ পর্যায়ে এসব অপরাধজনক কাজ ও ব্যবহার থেকে বাঁচার উপায়গুলো বিবৃত হয়েছে। এখানে সে সব লোকদেরকেও সমাজচ্যুত করতে বলা হয়েছে যারা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে বা কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বদনাম করে। তারপর ভদ্রজনদের বসতবাড়িতে যেসব নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা প্রয়োজন সেগুলো বলতে গিয়ে প্রথমে গৃহবাসীকে সালাম দানের অভ্যাস গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারপর হুকুম দেয়া হয়েছে দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখার জন্যে এবং নিষেধ করা হয়েছে মুহার্‌রম পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে। এরপর বালেগ-বালেগা ছেলেমেয়েদের যথাশীঘ্র পাত্রস্থ করার জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যুবতী মেয়েদেরকে দেহপসরিনী হওয়ার কাজে এগিয়ে দেয়া থেকে। এ সবই হচ্ছে মনে-মগযে ও দৈহিক দিক দিয়ে সচ্চরিত্রের অধিকারী থাকার জন্যে রক্ষাকবচ। এসব উপায় অবলম্বন করার মাধ্যমে পাশবিক প্রবণতা থেকে রক্ষা পেতে পারে, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আর একটি দিক পাশব-প্রবৃত্তি ঘুমন্ত অবস্থায় সব সময়েই থাকে। একটু সুযোগ বা উস্কানি পেলেই সেটা জেগে উঠে। এই পশু-বৃত্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্যে এবং সকল উস্কানির মোকাবেলা করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল সতকর্তা অবলম্বন করার শিক্ষা আলোচ্য অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

তিন. সকল নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে, অতপর এ সবকে আল্লাহর নূরের সাথে সম্পর্কিত বলে জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যে ঘরে এসব নিয়ম-শৃঙ্খলা বর্তমান আছে সে ঘর আল্লাহর ঘর হিসেবেই তাঁর কাছে গৃহীত হবে। অপরদিকে যারা কুফরী করবে, মানবে না আল্লাহর দেয়া নিয়ম-শৃঙ্খলা, তাদের সৎকাজগুলো মিথ্যা মায়া-মরীচিকার মতো চাকচিক্যময় হবে, অথবা সেগুলো এমন অন্ধকারচ্ছন্ন, যেন মনে হয় অন্ধকারের স্তরগুলো একের পর আরেকটি পরতে পরতে সাজানো। এরপর দেখানো হয়েছে কিভাবে দিগন্তব্যাপী ছড়ানো রয়েছে আল্লাহর নূর। সকল সৃষ্টির মধ্যে আনুগত্য পাওয়া যায়, সব কিছুকে আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী চলতে দেখা যায়, আসলে এ সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নূরের বহিপ্রকাশ। সে সুদূর নীল আকাশে মৃদুমন্দ গতিতে মেঘমালার সন্তরণ, রাত্রি দিনের আনাগোনা এবং সকল জীবজন্তু পানি থেকে পয়দা হওয়ার বাস্তবতা, তারপর একই পানি থেকে পয়দা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্নরূপ ও কর্মক্ষমতার অধিকারী হওয়া, বিভিন্ন পেশায় বিভক্ত হওয়া, বিভিন্ন শ্রেণীতে ও

---

৬০. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৮১

দলে নিয়োজিত হওয়া, যা নিয়ত প্রত্যেক দর্শক ও সকল দৃষ্টির সামনে ভাসছে- এসব কিছুও মূলত সে মহান আল্লাহরই নূরের বহিপ্রকাশ।

চার. এখানে আলোচনা হয়েছে মুনাফেকদের সম্পর্কে। রাসূল (স.)-এর সাথে আদব রক্ষা করে চলাকে সবার জন্যে ওয়াজেব করে দেয়া সত্তেও মুনাফেকরা একথা মানতো না-যদিও তারা মুসলমানদের মধ্যে মিলে মিশে থাকতো ও নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো। বাহ্যিক কাজ কর্ম ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাত (যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদি) দ্বারা নিজেদেরকে মুসলমান সমাজের লোক বলে বুঝানোর চেষ্টা করতো। তাদের সামনে খাঁটি মুমিনদের আদব কায়দা ও সঠিক আনুগত্যের চিত্র তুলে তাদেরকে এসব শৃঙ্খলা মেনে চলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদেরকে আল্লাহর এ ওয়াদাও শোনানো হচ্ছে যে, যদি খাঁটিভাবে তারা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের আনুগত্য করে, তাহলে তারা আল্লাহর খলিফা হিসেবে দুনিয়ায় বাস করবে, আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়ায় বিভিন্ন ক্ষমতার আসনে তাদেরকে সমাসীন করা হবে এবং কাফেরদের ওপরও তাদেরকে বিজয়ী করা হবে।

পাঁচ. এর মধ্যে নিজেদের বাড়ির বাইরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে প্রবেশের জন্যে অনুমতি চাওয়া ও মেহমানদারী করার আদব শেখানো হয়েছে। মুসলিম জামায়াতের লোকেরা সবাই এক পরিবারের লোক এই হিসেবে তাদের বাড়িতে প্রবেশের নিয়ম শৃঙ্খলার তালীমও দেয়া হয়েছে।

এরপর একথার ঘোষণার সাথে সূরাটি শেষ করা হচ্ছে যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী ও মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন, তাঁর জ্ঞান সবাইকে ঘিরে রেখেছে। তাঁর জানা আছে, ওদের মধ্যে কে ধ্বংস হবে আর কে নিষ্ঠার সাথে তাঁর দিকে রুজু করবে। তাদের সকল ব্যাপারের জ্ঞানই তাঁর কাছে আছে- তিনিই সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সূরা নূর-এর ঐতিহাসিক পটভূমি

বদরের যুদ্ধের পর যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা আমাদের জানা আবশ্যক। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পেছনে যে কারণসমূহ রয়েছে তা জানা না থাকলে এ সূরার গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ করার পর আরবে ইসলামি বিপ্লবের যে উত্থান শুরু হয়, খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত সে বিপ্লব এত বেশি ব্যাপকতা লাভ করে যে, আরবের মুশরিক, ইয়াহূদি, মুনাফিক ও প্রতীক্ষমান লোকেরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে, ইসলামি শক্তির এ উত্থানকে অস্ত্র দ্বারা আর বাধা দিয়ে লাভ নেই। তথাপি খন্দকের যুদ্ধে ইসলামের শত্রুরা এক জোট হয়ে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণ করে। কিন্তু তারা মদিনা উপকণ্ঠে একমাস কাল মাথা ঠুকেও মুসলমানদের কিছুই করতে সক্ষম হয়নি। ফলে এ অভিযান ব্যর্থ হয়ে পড়ে এবং তারা স্বদেশে ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার সাথে সাথেই নবি (স.) ঘোষণা দেন,

مَا تَغْزُوْكُمْ قُرَيْشُ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

"এরপর কুরায়িশরা আর তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারবে না বরং তোমরাই তাদের উপর আক্রমণ করবে।"[৬১]। রাসুল (স.)-এর এ উক্তি দ্বারা একথারই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, ইসলাম বিরোধী শক্তির ক্ষমতা শেষ হয়ে আসছে। মুসলমানরাই এখন শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করবে। বদর থেকে খন্দক যুদ্ধ পর্যন্ত এ সময়কালের মধ্যে মুসলমানরাই কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করেছিল। যদিও কাফিররা সংখ্যায় কয়েকগুণ বেশি ছিল। ইসলামের এই ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতিতে তারা ভীত হয়ে পড়ে। অস্ত্র ও জনবলের দিক দিয়ে শক্তিশালী কাফির-মুশরিক বাহিনী এটা বুঝতে পারে যে, অস্ত্র ও শক্তির দ্বারা মুসলমানদেরকে প্রতিহত করা যাবে না। তাই ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্যে তারা বিভিন্ন পথ বেছে নেয়। তারা মুসলমানদের বিজয়ের মূল উৎস 'নৈতিক শক্তি'কে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা রাসুল (স.) ও সাহাবা কিরামের নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর কালিমা লেপনের চেষ্টা করতে থাকে। কেননা এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছে যা অস্ত্র দ্বারা রোধ করা সম্ভব নয়।[৬২] অন্যদিকে তারা পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিত্রতা মুসলমানদের মধ্যে এমন ঐক্য, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে, যার সামনে মুশরিকদের শিথিল ও বিশৃঙ্খল সামাজিক ব্যবস্থাপনা সর্বাবস্থায় তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুশরিকদের দুর্বল চরিত্র ও সামাজিক ব্যবস্থা তাদের মাঝে হীন মনমানসিকতারই জন্ম দেয়। আর এ কদর্যপূর্ণ মন-মানসিকতার কারণেই তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবিদের বিভিন্নভাবে হেয় করতে থাকে এবং তাঁদের চরিত্রের উপর কালিমা লেপন করতে আরম্ভ করে।[৬৩] আর এজন্য ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মদিনার মুসলিমদের মধ্যে নানারূপ ফিত্নার সৃষ্টি করে, ইসলামের শত্রু ইয়াহূদি ও মুশরিকরা বেশি-বেশি ফায়দা লুটার লক্ষ্যে তাদের সকল কর্ম কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করে। এ নতুন চেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের প্রকাশ ঘটে পঞ্চম হিজরির যিলকদ মাসে। এ সময় মহানবি (স.) পালক পুত্র গ্রহণের জাহেলী প্রথার চূড়ান্ত অবসানের জন্যে নিজেই তার পালক পুত্র যায়দ ইবন হারিসার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিয়ে করেন। এতে মদিনার মুনাফিকরা রসূলের (স.) বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার এক সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে। আর ইয়াহূদিরাও মুনাফিকদের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে মিথ্যা দোষারোপের এক মহাতুফান সৃষ্টি করে।

অনুরূপভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা দ্বিতীয় আক্রমণ চালায় বনি মুস্তালিক যুদ্ধের সময়, যা ছিল কঠিনতর এক আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র। বনি মুস্তালিক ছিল বনি খোজায়া নামক গোত্রের একটি শাখা। পঞ্চম হিজরি সনের শাবান মাসে নবি করিম (স.) এদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে অগ্রসর হন। মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিপুল সংখ্যক মুনাফিক নিয়ে এ যুদ্ধে নবি করিম (স.)-এর সঙ্গী হয়। 'মুরাইসী' নামক স্থানে পৌছে নবি করিম (স.) শত্রুর উপর হামলা পরিচালনা করেন[৬৪] এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরই সমগ্র গোত্রটিকে তাদের সম্পদসহ গ্রেফতার করে ফেলেন। এ অভিযান থেকে অবসর লাভের পর মুসলিম বাহিনী মুরাইসীতে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করার সময় একদিন হযরত উমর (রা.)-এর জনৈক কর্মচারী এবং খাজরাজ গোত্রের জনৈক সহযোগীর মধ্যে পানি নিয়ে ঝগড়া হয়। তাদের একজন আনসারদেরকে এবং অপরজন মুহাজিরদেরকে ডাকে। এতে উভয় দিকে লোক সমবেত হতে থাকে। মহানবি (স.)-এর হস্তক্ষেপে উপস্থিত ক্ষেত্রেই বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিক-সর্দার) তিলকে তাল বানিয়ে ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলে। সে আনসার বাহিনীকে এই বলে

---

৬১. ইবনে হিশাম, *সিরাতে ইবনে হিশাম*, খ. ৩, পৃ. ২৬৬

৬২. আব্দুস সালাম মিতুল, *কোরানের সূরাসমূহের নামকরণ ও নাজিলের পটভূমি*, (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ,প্রথম প্রকাশ,২০০১),পৃ. ৬৭

৬৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৯৯

৬৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মা' আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩২

উত্তেজিত করতে থাকে যে, এই মুহজিররা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমাদের ও কুরায়শ কাঙ্গালদের উদাহরণ এরূপ যে,"কুকুর পাল যেন তোমাকেই খেয়ে ফেলে। এ সবকিছু তোমাদেরই সৃষ্টি। তোমরা নিজেরাই ওদের এখানে নিয়ে এসে বসিয়েছো। তোমরাই এদেরকে নিজেদের বিত্ত-সম্পত্তিতে অংশীদার বানিয়েছো, এখন তোমরাই যদি এদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নাও, তখন দেখবে এদের আর কোথাও আশ্রয় মিলবে না।

অতপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কসম খেয়ে বলল,"মদিনায় পৌঁছার পর আমাদের মধ্যে যে সম্মানিত সে সম্মানহীনকে বহিষ্কার করবে।"[৬৫] নবি করিম (স.) যখন এ সব কথাবার্তা শুনতে পেলেন, তখন হযরত উমর (রা.) মহানবি (স.)কে পরামর্শ দিলেন যে, এ ব্যক্তিকে খুন করে ফেলা উচিত, কিন্তু নবি করিম (স.) বললেন,

فكيف يا عمر، اذا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

"হে উমর! তা কেমন করে হয়? তা করলে তো লোকেরা বলবে, মুহাম্মদ (স.) তাঁর সঙ্গীদেরকে হত্যা করছে।"[৬৬] তারপর নবি করিম (স.) সে স্থান ত্যাগ করে সবাইকে অবিলম্বে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কোথাও অবস্থান না করে বিরামহীনভাবে চলতেই থাকলেন। পথিমধ্যে উসায়েদ ইবন হুজাইর (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর নবি! আজ তো আপনি আপনার নীতির বিপরীত অসময়ে চলার নির্দেশ দিলেন।" জবাবে তিনি বললেন, "তোমাদের সঙ্গীটি কি সব কথাবার্তা বলছে তা তুমি শুনতে পাচ্ছ না?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন-"কে সে সঙ্গী"? নবি করিম (স.) বললেন, "আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করে দিন। আপনি যখন মদিনায় এসেছিলেন, তখন এ ব্যক্তিকে আমরা নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার জন্য নেতৃত্বের মুকুট তৈরি হয়েছিল। আপনার আগমনে তার সকল আশা নস্যাৎ হয়ে যায়। এ কারণে তার মনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়েছিল সে এখন তাই উদগীরণ করছে মাত্র।"

এ হীন কারসাজির রেশ তখনো শেষ হয়নি। এরই মধ্যে একই সফরে আরেকটি ভয়াবহ অঘটন ঘটে যায়। ঘটনাটি এমন যে, নবি করিম (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ যদি পরিপূর্ণ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এর মোকাবিলা না করতেন, তাহলে মদিনার এই নবোত্থিত মুসলিম সমাজ এক সর্বাত্মক আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যেতো। ঘটনাটি ছিল এরূপ- এ পাপাত্মা মুনাফিক হযরত আয়িশা সিদ্দিকার (রা.) বিরুদ্ধে এক চরম আপত্তিকর ও অবমাননাকর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বসলো। এ অপবাদকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেই মহান আল্লাহ অপবাদের ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর বিধানসহ সূরা আন-নূরের বেশ কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। আর এ অপবাদের ঘটনাটিই হল মূলত অত্র সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি।

হযরত আয়িশার (রা.) ঘটনা

বুখারি-মুসলিমসহ অন্যান্য সমস্ত হাদিস ও তাফসির গ্রন্থে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি নিম্নরূপ:[৬৭]

পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরিতে মহানবি (স.) যখন বনি মুস্তালিক নামান্তরে মুরাইসী-এর যুদ্ধে গমন করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) এ যুদ্ধে তার সফরসঙ্গী ছিলেন। ইতোপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই এ সফরে হযরত আয়িশা (রা.)-এর জন্যে উটের পিঠে পর্দা বিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়িশা (রা.) প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হতেন, এরপর উটের চালক

---

৬৫. আল-কুরআন, সূরা মুনাফিকুন (৬৩) : ৮

৬৬. আব্দুস সালাম মিতুল, *কোরানের সূরাসমূহের নামকরণ ও নাজিলের পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬৭. ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*,প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ, ৫০-৫৫

আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। যুদ্ধ শেষে মদিনায় ফেরার পথে এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। কোন এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান করার পর শেষ রাতের দিকে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। সবাইকে প্রস্তুত হতে বলা হল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে গেলেন। ঘটনাক্রমে ফেরার পথে তাঁর গলার হারটি হারিয়ে যায়। তিনি গলার হার খোঁজ করতে গিয়ে বেশ কিছু সময় বিলম্ব করে ফেলেন। ইতোমধ্যে কাফেলা তাকে রেখে সে স্থান ত্যাগ করে। তাঁর উট চালকও যথারীতি যাত্রা শুরু করেন। সে ধারণা করেছিল যে, হযরত আয়িশা (রা.) হাওদার ভেতরেই আছে। কেননা হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন ক্ষীণকায়, তার দেহের ওজন ছিল অত্যন্ত হালকা। তাই বাহকগণ তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন যে, হযরত আয়িশা (রা.) হাওদার মধ্যেই রয়েছেন এবং তাঁকে নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) সে স্থানে ফিরে এসে দেখেন কাফেলা সেখান থেকে চলে গেছে। তখন তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, তিনি কাফেলার পেছনে না দৌঁড়ে স্ব-স্থানে চাদর মুড়িয়ে বসে থাকলেন। তিনি ভাবলেন, প্রিয় নবি (স.) যখন তাকে পাবেন না, তখন তার খোঁজে তিনি নিশ্চয় এখানেই লোক পাঠাবেন। সেজন্য তিনি ঐ স্থানে অবস্থান করাই সমীচীন মনে করলেন। তখন সময় ছিল শেষ রাত। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রিয় নবি (স.)-এর যাবতীয় কাজ ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল। কাফেলার কোন কিছু যেন ভুলক্রমে রাস্তায় পড়ে না থাকে তার জন্য তিনি একজন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতেন, সে সবার শেষে রওয়ানা হতো। কোন কিছু পড়ে থাকলে সে তা কুড়িয়ে নিয়ে আসত। এ সফরে হযরত সাফওয়ান ইবন মুয়াত্তালকে (রা.) তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। ফেরার পথে অতি প্রত্যুষে সাফওয়ান একজনকে চাদর মুড়িয়ে ঘুমিয়া থাকতে দেখেন। তিনি কাছে এসে হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.)-কে দেখতে পান, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠেন,'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।' হযরত সাফওয়ানের (রা.) মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যটি শোনা মাত্রই হযরত আয়িশা (রা.) জেগে উঠেন। হযরত সাফওয়ান (রা.) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উটটি হযরত আয়িশার (রা.) সামনে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়িশা (রা.) উটের পিঠে পর্দা করে বসে পড়লেন। হযরত সাফওয়ান (রা.) উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন এবং দুপুরের সময় মূল কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। এটাই ছিল প্রকৃত ঘটনা।

মিথ্যা অপবাদ রটনা

মুনাফিকরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকতো। তাই তারা তিলকে তাল বানিয়ে মিথ্যা রটনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশার (রা.) নামে মিথ্যা অপবাদের ঝড় তুলে ফেলে। মুনাফিকদের এ ষড়যন্ত্রের সূক্ষ্মজালে কতক সরল প্রাণ মুসলমানও জড়িয়ে পড়ে। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাস্‌সান, মিসতাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিলেন এদের অন্তর্ভুক্ত। রটে যাওয়া অপবাদে স্বয়ং মহানবি (স.) খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়িশার (রা.) এর তো দু:খের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এ আলোচনার ঝড় বইতে থাকল। অবশেষে মহান আল্লাহ হযরত আয়িশার (রা.) পবিত্রতা বর্ণনায় ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় সূরা আন-নূরের ১১ থেকে ২০তম আয়াত পর্যন্ত দশটি আয়াত নাযিল করেন।[৬৮] আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এই ঘটনার সৃষ্টি করে একই ঢিলে একাধিক পাখি শিকার করতে চেয়েছিল।

---

৬৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন* (সংক্ষিপ্ত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৩; মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, খ. ১৮, পৃ.১৫৪-১৬১

প্রথমত: সে রসূল (স.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইজ্জতের উপর হামলা করল।
দ্বিতীয়ত: সে ইসলামি আন্দোলনের সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও মর্যাদাকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করল।
তৃতীয়ত: সে এমন এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করল যে ইসলাম যদি মুসলমানদের মধ্যে সত্যি কোন পরিবর্তনের সূচনা না করত, তা হলে মুহাজির ও আনসার এবং আনসারদের উভয় গোত্রেই পরস্পরের সাথে কঠিন লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ত। আল্লাহ তাআলা এরূপ একটি বিপদ থেকে মুসলমানদের রক্ষা করলেন।[৬৯]

সারকথা, সূরা আন-নূর পবিত্র কুরআনের ২৪তম সূরা। ইসলাম শুধু বাহ্যিক কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম বিশেষ নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সূরা তারই একটি অকাট্য প্রমাণ। সূরা আন-নূরের ৬৪টি আয়াতে মানব জীবনের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক ও বিভাগের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাটি সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষ করে ব্যভিচার ও মিথ্যা অপবাদের মত মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এ সূরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। একটি শান্তিপূর্ণ কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠাই মানুষের কাম্য, আর ইসলাম চায় এ জাতীয় একটি কল্যাণকর সমাজ উপহার দিতে। এ লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা যে সব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন সূরা আন-নূর তারই সমষ্টি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সূরা নূর-এর সামাজিক গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর উপযোগিতা

সূরা নূরে সমাজ সংস্কারমূলক অনেকগুলো নীতি এবং বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এ সকল সামাজিক বিধি-বিধান নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম সমাজকে কলুষমুক্ত রাখা, সমাজে এর বিস্তার রোধ করা। আর যদি সমাজ কোন কারণে কলুষিত হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তার প্রতিবিধান করা। একমাত্র আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুস্থতা ফিরে আসতে পারে। কেননা সুষ্ঠু ও সুস্থ সমাজ জীবন নির্ভর করে সুষ্ঠু সামাজিক বিধি-বিধানের উপর। আল্লাহ তাআলা সূরা নূরের প্রথম দিকে এমন সব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন যাতে সমাজ কোন অনৈতিক ও চরিত্র বিধ্বংসী ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে না পারে। আর যদি আক্রান্ত হয়েই যায়, তাহলে যেন তা প্রতিরোধ ও নির্মূল করা যায়। এ সূরার শেষার্ধে এমন সব বিধি-বিধান ও উপদেশ প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে সমাজে দোষ-ত্রুটি, পাপ ও অন্যায়ের উৎসসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

সমস্যায় জর্জরিত সমাজে সূরা নূর-এর গুরুত্ব ও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এর উপযোগিতায় সূরা নূরে বর্ণিত সামাজিক সংস্কারমূলক বিধানাবলী এখানে আলোচনা করা হল-

ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত বিধান

ব্যভিচার একটি অত্যন্ত জঘন্য ও কদর্যপূর্ণ সামাজিক অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিতে এটি একটি মহাপাপ, যা সমাজকে কলুষিত করে। পরিবারের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। বিবাহ বা পারিবারিক বন্ধনের দিকে নারী-পুরুষের মধ্যে তীব্র অনীহার সৃষ্টি করে। তা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সমাজের যুবক-যুবতীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে পশুর ন্যায় চরম পাশবিক যৌনতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর দরুন পবিত্র বংশধারার বিশেষত্ব হারিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এ কাজের খারাপ পরিণতি অনুধাবন করতে পারবে, এর মানবিয় মর্যাদা বিধ্বংসী ভূমিকা বুঝতে সক্ষম হবে, সেই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবে তা নিষিদ্ধ হওয়ার গভীর তাৎপর্য, এর জন্য প্রণীত শাস্তির বিধানের যৌক্তিকতা। ব্যভিচারের শাস্তি শুধু ইসলাম ধর্মেই বর্ণিত হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমগ্র মানব সমাজেই এর শাস্তির

৬৯. বাউবি, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

বিধান ছিল এবং আছে। আল-কুরআনে সূরা আন-নিসার তৃতীয় রুকুতে ব্যভিচারকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৭০] আলোচ্য সূরায় ব্যভিচারকে একটি ফৌজদারী অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ব্যভিচারি পুরুষ ও নারীর জন্য শাস্তিস্বরূপ একশত বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে।"[৭১]।

উল্লেখ্য যে, ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ অবিবাহিত হলে সে অবস্থায় এ শাস্তির বিধান প্রযোজ্য। আর বিবাহিত হলে সে ক্ষেত্রে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যার বিধান রয়েছে।

ইসলামের বিধান মতে, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করার ন্যায় এটিও একটি বড় অপরাধমূলক কাজ। সূরা আল ফোরকানের ৬৮নং আয়াতে শিরক, বিনা কারণে নর-হত্যা ও ব্যভিচারকে একই পর্যায়ের জঘন্য অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন,

لَا اَعْلَمُ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ شَيْئًا أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا

'নর হত্যার পর যিনার তুলনায় অধিক অপরাধের কাজ আর কোনটি আছে বলে আমার জানা নেই।'[৭২]

ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্কিত বিধান

ব্যভিচার শুধু অপরাধই নয়; বরং তা অনেক অপরাধের সমষ্টি। তাই ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের সঙ্গে সৎ সতী-সাধ্বী মুমিন নারী-পুরুষের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। এমনকি তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যভিচারের মত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের জন্যে উক্ত বিবাহ সম্পর্কিত বিধান প্রযোজ্য হবে না। কেননা, তাওবা ও নৈতিক সংশোধনের পর তাদেরকে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য করা হবে না।

মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি সম্পর্কিত বিধান

কেউ কাউকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিলে তা প্রমাণ করার জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হয়। সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে ইসলামি শরিআত এহেন অপবাদকে কঠোর অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে। আর এ শাস্তি স্বরূপ ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ যাতে কোন পুরুষ বা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস না পায়, সে জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয়টিকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ সংক্রান্ত বিধান

কোন স্বামী যদি স্ত্রীর উপর অথবা স্ত্রী স্বামীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়, তবে তার জন্য ইসলামি শরিআতে লি'আনের বিধান রয়েছে।

আর লি'আন হল, অপবাদ প্রদানকারী স্বামী বা স্ত্রী তার অপবাদের সত্যতার পক্ষে চারবার শপথ করবে এবং পঞ্চমবার বলবে, "সে যদি মিথ্যাবাদী হয়-তাহলে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ণিত হোক।" অনুরূপভাবে যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সেও তার পবিত্রতা প্রমাণের জন্য চারবার শপথ এবং পঞ্চমবার উক্ত কথাটি বলবে। এক্ষেত্রে যদি অপবাদদানকারী শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করার বিধান রয়েছে।

---

৭০. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ১৫-১৬

৭১. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ২

৭২. বাউবি, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

ভিত্তিহীন খবর প্রচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ

হযরত আয়িশা (রা.)-এর উপর মুনাফিকদের আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের শাস্তির বিধান এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যে সব লোক সমাজে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ ছড়ায় আর নিজেদের কথার সত্যতার পক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদের জন্য আশিটি বেত্রাঘাত-এর বিধান রয়েছে। আর অন্য যে কোন বিষয়ে তাদের সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা হল পাপী, অন্যায়কারী ও সত্যবিচ্যুত। এ ব্যাপারে ইসলাম একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছে আর তা হল-সমাজে সামগ্রিক সুসম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শুভ ধারণা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নির্দোষ মনে করতে হবে। দোষ বা অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে এ মর্যাদাই পেতে থাকবে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটানো যাবে না।

অপরের গৃহে প্রবেশ সংক্রান্ত বিধান

সাধারণভাবে লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যেন অপরের ঘরে বিনা অনুমতিতে অবাধে প্রবেশ না করে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে সামাজিক রীতি-নীতি ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিধান হল, কারো সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হলে প্রথমে অনুমতি নিবে এবং সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। বিনা অনুমতিতে এবং সালাম না দিয়ে কারো গৃহে প্রবেশ করা অন্যায়। কারণ অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করলে কারো একান্ত ব্যক্তিগত অবস্থা অপরের নিকট প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে। পর নারীর প্রতি বেপর্দা অবস্থায় দৃষ্টিপাত হতে পারে। অবাধ মেলামেশার কারণে যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অনুমতি ও সালাম ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করাকে আল্লাহ্ কড়াভাবে নিষেধ করেছেন। এ বিধানটিও নারী নির্যাতন রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দৃষ্টি সংযত ও লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান

ইসলামের বিধান মোতাবেক নারী-পুরুষ উভয়ই পরস্পরের প্রতি তাদেও লোলুপ দৃষ্টি বিনিময় করা অবৈধ। অর্থাৎ একজন পুরুষের জন্য নিজের স্ত্রী এবং মুহাররমাত (যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা অবৈধ এমন মহিলা) ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে এবং একজন স্ত্রীলোক নিজের স্বামী ও মুহাররম (যে সমস্ত পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয় এমন পুরুষ) ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে কামভাব নিয়ে চোখ ভরে দেখা অবৈধ। নারী-পুরুষ উভয়ে তাদের দৃষ্টিকে অবশ্যই নিচু ও সংযত রাখবে। এরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপকে ইসলামি শরিআত চোখের ব্যভিচার হিসেবে অভিহিত করেছে। এ বিধান পালিত হলে অবশ্যই সমাজে নারী নির্যাতন কমবে এবং ধর্ষণ ও ব্যভিচার প্রতিরোধ সহজতর হবে।

নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান

নারীদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান এই যে, নারীরা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে। তবে এ সময় তাকে সংযত হয়ে শালীন ও মার্জিত পোশাক পরে তথা মাথা ও শরীরকে বড় ওড়না বা চাদর দ্বারা আবৃত করে পর্দাসহ চলতে হবে। নিজেদের সাজ-সজ্জা ও রূপ-লাবণ্য লুকিয়ে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই তা বাইরের অপর পুরুষের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। শব্দ করে এমন কোন অলংকার পরিধান করে বা খুব আটষাট পোশাক পরিধান করে অথবা শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা থাকে এমন পোশাক পরিধান করে ঘরের বাইরে যাওয়া অবৈধ। বস্তুত নির্দিষ্ট পরিবেষ্টনীর বাইরে নিদেজের সাজ-সজ্জা ও রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে নারীদের চলাফেরা ও কাজ কর্ম করতে নিষেধ নেই। তবে ইচ্ছা করে বা বেপরোয়াভাবে ঘোরাফেরা করা বা সৌন্দর্য লোলুপ দৃষ্টি পরনারীদের থেকে ফিরিয়ে নেবে এবং নারীরা পুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। আর এতে নারী নির্যাতনও হ্রাস পাবে।

পুরুষদের পর্দা সম্পর্কিত বিধান

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা মেনে চলা ফরয। পুরুষ তার চোখ পরনারী থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে ও সংযত রাখবে। নিজেকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হেফাজত রাখবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিনদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৭৩]

বৃদ্ধা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিধান

বৃদ্ধা নারীদের পর্দা সংক্রান্ত বিধানে কিঞ্চিত শৈথিল্য আরোপ করা হয়েছে। তারা যদি নিজেদের ঘরের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা রাখে, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তারা যেন পর-পুরুষের নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বেড়ায়। বরং বার্ধক্য অবস্থায়ও যদি তারা স্বীয় শারীরিক সৌন্দর্য ও অলংকারাদি সংগোপনে রাখতে অভ্যস্ত হয় তবে তা তাদের জন্য উত্তম।

অবিবাহিত নারী পুরুষদের বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত বিধান

সমাজে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষদের অবিবাহিত থাকাকে অপছন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা বিবাহের উপযুক্ত অথচ বিবাহ হয়নি, তাদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্রীতদাস-দাসীদের মধ্যে যারা যোগ্য তাদের বিবাহ সম্পাদন করার জন্য মালিক প্রভুদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা অবিবাহিত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল কাজের উদ্ভব হয়ে থাকে। কাজেই বিবাহের উপযুক্ত হলে প্রত্যেক নারী-পুরুষকেই বিবাহিত জীবন যাপন করা কর্তব্য। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

« وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

"আমি নারীদেরকে বিয়ে করে থাকি। আর যে ব্যক্তি আমার নীতি উপেক্ষা করবে সে আমার অনুসারী নয়।"[৭৪]

পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত বিধান

পতিতাবৃত্তি একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ। ইসলাম বেশ্যাবৃত্তি এবং যারা এ পেশায় নিয়োজিত তাদেরকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে। তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া নারীদের বা দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করা, তাদের দ্বারা দেহব্যবসায় বা পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তদানীন্তন আরব দেশে দাসীদের দ্বারা এহেন জঘন্য কাজ করানো হতো। এখনো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে নারীদেরকে এ পেশায় নিয়োজিত রেখে অর্থ উপার্জন করা হচ্ছে এবং পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে আধুনিক সমাজে নারী নির্যাতন করা হচ্ছে। ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তি প্রবর্তন করে মানবতার জন্য অবমাননাকর জঘন্য কাজ পতিতাবৃত্তি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

সারকথা সূরা আন-নূর সামাজিক বিধি-বিধান সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ সূরা, যাতে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য যৌক্তিক ও কার্যকর বিধান দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সমাজ ইভটিজিং, অশ্লীলতা,পর্দাহীনতা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ও এ জাতীয় সামাজিক অপরাধ থেকে কলুষমুক্ত থাকবে। পরিবার, সমাজ ও পরিবেশকে সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও বেকারমুক্ত রাখার জন্য ইসলামের বিধানাবলি খুবই উপযোগী। এ সূরায় নারী নির্যাতন, যৌন অপরাধ ও অশ্লীলতা প্রতিরোধমূলক যেসব বিধানের কথা আলোচিত হয়েছে তা হল নিজ

---

৭৩. *আল-কুরআন*, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩০

৭৪. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত,খ. ৭, পৃ. ২, হাদিস নং ৫০৬৩, ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২. পৃ. ১০২০, হাদিস নং- ১৪০১

নিজ দৃষ্টি ও নিজ-নিজ রূপ সৌন্দর্যকে সংযত রাখা এবং দেহ মনের পবিত্রতা, লজ্জাস্থানের নিয়ন্ত্রণ, অপরের ঘরে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ, পর্দার বিধান, নর-নারীর অবিবাহিত থাকাকে নিরুৎসাহিত করা ও যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার ব্যবস্থা।

আর অপরাধ সংঘটিত হলে যেসব দণ্ড-বিধান কার্যকর করে সমাজকে সুস্থ ও সমস্যামুক্ত রাখার বিধান রয়েছে তাহলো- ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে বেত্রাঘাত ও মৃত্যুদণ্ড, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের ক্ষেত্রে লি'আন ও বেত্রদণ্ড এবং বেশ্যা বা পতিতাবৃত্তির নিষিদ্ধতার বিধানাবলী। মূলত এসব বিধান বাস্তবায়ন করে নারী-পুরুষের সমন্বিত মর্যাদা রক্ষা করা যায় এবং একটি পূতঃপবিত্র ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : সামাজিক সমস্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যার পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যার নেপথ্য কারণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সামাজিক সমস্যা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও বাংলাদেশ

প্রথম পরিচ্ছেদ
সামাজিক সমস্যার পরিচয়

মহান আল্লাহ তাআলার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে নিজেদের প্রয়োজনপূরণ ও সহজ-স্বাভাবিক জীবন যাপনের লক্ষ্যে মানুষ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সমাজবদ্ধ মানুষদের সাথে সামাজিক সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত হয় এবং সমাজের মানুষদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। সমাজ সচেতন মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। অনুরূপভাবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকেও অনেক সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ করে তা থেকে উত্তরণের উপায় বের করা যায়। সামাজিক সমস্যা একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এবং সর্বদা সমাজের জন্য অকল্যাণকর বিধায় এ থেকে সবাই মুক্ত হতে চায় অথবা নিরসনের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে।

সামাজিক সমস্যার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি প্রায়শই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা গঠনে প্রায়শই ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আমেরিকাবাসী তাদের সমাজে গর্ভপাতের প্রচলনকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন। অপরদিকে, কেউ কেউ এর অনুপস্থিতি বা এই প্রথার উপরে নিষেধাজ্ঞাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন। কিছু আমেরিকাবাসী সমকামিতাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন, অপরদিকে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের উপরে কেউ কেউ Prejudice এবং Discrimination পোষণ করেন। বস্তুত, সামাজিক সমস্যা বলতে কী বুঝানো হবে সে সম্পর্কে পার্থক্য নির্ভর করে সমাজের সদস্যদের পোষণ করা আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উপর, এমনকি তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করেও তা গঠিত হতে পারে। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা গঠনে শুধুমাত্র একটি সমাজের মধ্যেই পার্থক্য দেখা যায় তাই নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে এবং সময়ের আবর্তে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দিতে স্বামীর আইনগত

এবং বৈবাহিক অধিকার ছিল তার শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার। বর্তমানে, বৈবাহিক অধিকার সত্ত্বেও স্বামী কোনো ক্রমেই তার স্ত্রীকে নির্যাতন করার আইনগত অধিকার পায় না। চা পান করা অপর একটি উদাহরণ, সময়ের আবর্তে সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর প্রতি মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডে চা পান করাকে বিবেচনা করা হতো "Base Indian practice" হিসেবে, যাকে মনে করা হতো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান হিসেবে, অস্পষ্ট শিল্প হিসেবে, জাতিকে হেয় করার চক্রান্ত হিসেবে, বর্তমানে ইংরেজরা বিকেলে চা পানের জন্য স্বনামধন্য হয়ে আছে।[৭৫] তাই আমরা দেখি মুসলিম সমাজ বিজ্ঞানী ও মুসলিম সমাজকর্মীগণ এমন অনেক সমস্যা ও ব্যাধি নির্ধারণ করেন, যা সাধারণ সমাজকর্মীদের দৃষ্টিতে সামাজিক সমস্যা হিসেবে ধরা নাও পড়তে পারে, তবে গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা ব্যক্তি, সমাজ ও সামাজিক মানুষের জন্য বহুমুখী ক্ষতি সাধন করে। নিম্নে সামাজিক সমস্যার পরিচয় তুলে ধরা হলো।

সামাজিক সমস্যার পরিচয়

সামাজিক বিজ্ঞানে সমস্যা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। মানুষের অপূরণ জনিত চাহিদা এবং দ্বন্দ্বময় সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ হতেই মূলত : সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। মানুষের সামাজিক জীবনে অনেক সময় এমন কিছু অবস্থার উদ্ভব হয় যা সমাজের মানুষের সার্থক জীবনযাপনকে বাধাগ্রস্থ এবং সমাজে একধরণের অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অস্বস্থিকর অবস্থার সৃষ্টি করে যা সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধাজনক এ সমস্ত অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজ ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; কেননা এমন কোন সমাজ নেই যেখানে সামাজিক সমস্যা নেই। সমাজের জটিল প্রকৃতিই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সামাজিক সমস্যা তাই প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক এবং এর সাথে নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, মনোস্তাত্বিক প্রভৃতি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান।

'সামাজিক সমস্যা' শব্দটি 'সামাজিক' ও 'সমস্যা' এ দুটি প্রত্যয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। এখানে 'সামাজিক' প্রত্যয়টি সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে নির্দেশ করে যার মাঝে রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। সামাজিক এ বিষয়সমূহ সরাসরি সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং জীবনধারাগত আদর্শ ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

অন্যদিকে 'সমস্যা' প্রত্যয়টির মাধ্যমে সাধারণত : অবাঞ্ছিত, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম এবং জটিল এক অবস্থা, শর্ত, পরিস্থিতি বা আচরণকে বোঝানো হয়। কাজেই সামাজিক ও সমস্যা এই প্রত্যয় দুটির মিলিত রূপ "সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা হলো মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ কাঠামো প্রভৃতি। অর্থাৎ, এক কথায় সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত এক অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা পরিস্থিতি বা আচরণ। এ ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সামাজের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করে এবং সমাজের মানুষের প্রাত্যহিক বা নিত্যদিনের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।[৭৬]

সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত সার্বজনীন বা বিশ্বব্যাপি দৃষ্টিভঙ্গি প্রণয়ন করা সমস্যাবহুল। সামাজিক সমস্যা প্রত্যয়টি দ্বারা যে অবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে তা আপেক্ষিক। "There is no universal,

---

৭৫. আবু ইব্রাহিম মুহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, (ঢাকা: বিএসএস পাবলিকেশন্স, সংশোধিত সংস্করণ, ২০১৬ খৃ.), পৃ. ২

৭৬. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খৃ.), পৃ. ৪

constant or absolute definition of what constitutes a social problem." ।[77] কেননা সমাজে নানান ধরণের সমস্যা অর্থাৎ, অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি বা অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। আবার উৎপত্তি, ধরণ, ব্যাপকতা, প্রবণতার, সমস্যা সৃষ্টির কারণ, সমস্যার সাথে অন্যান্য বিষয় প্রভৃতি সকল দিক থেকেই এক সমস্যা হতে অন্য সমস্যার প্রকৃতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। আবার সামাজিক সমস্যা স্থান, সময় ও সংস্কৃতি ভেদেও ভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক সমস্যা তাই প্রকৃতিগত দিক বিচারে বেশ বিচিত্র। তবে তাই বলে সামাজিক সমস্যাকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা যে থেমে আছে তা নয়; বরং সামাজিক সমস্যার কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদানের বহুমুখী প্রচেষ্টা সমাজ বিজ্ঞানীদের মাঝে লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক সমস্যার সাধারণ অর্থে সমাজের স্বার্থে দূর করা দরকার এমন ক্ষতিকর বা ভীতিজনক কোন অবস্থাকে বুঝায়।[৭৮]

Arnold Rose সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন - "A social problem may be defined as a situation which has influenced a good majority of people, i.e., they believe that this situation itself is responsible for their difficulties or displeasures which may be reformed."[৭৯] অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যা এমন একটি অবস্থা যা সমাজের বেশিরভাগ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যাদের উপর সামাজিক সমস্যা প্রভাব বিস্তার করে তারা তাদের কঠিন অথবা অসন্তোষজনক অবস্থার জন্য একে দায়ী করে এবং এ থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়।

সামাজিক সমস্যার একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার লক্ষ্যে Mckee M. Rebertson তাঁর 'Social Problem' গ্রন্থে বলেন, "A social problem exists when a significant people, percive an undersirable difference between social ideals and social realities and before that this difference can be eliminated by collective action."[৮০] অর্থাৎ সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অথবা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোক যখন সামাজিক আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে অবাঞ্ছিত বৈপরিত্য বা পার্থক্য লক্ষ্য করে এবং যদি তারা বিশ্বাস করে যে, ঐ পার্থক্যগুলো যৌথ প্রয়াসের দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব, তখন বুঝতে হবে যে কোন সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা বিরাজ করছে।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞাকে অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন পল. বি. হর্টন ও জেরাল্ড আর. লেসলী। তাঁরা তাঁদের পুস্তক The sociology and social problems-এ বলেন, সামাজিক সমস্যা হলো, "অস্বস্তিকর হিসেবে বিবেচিত একটি অবস্থা, যা সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোককে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং যার সম্পর্কে দলীয় সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে এ সংজ্ঞাটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য।[৮১]

---

৭৭. Mooney, A. Linda, David Knox, & Caroline Schacht, *Understanding Social Problems*, (Thomson Wadsworth, fifth edition, 2007), P. 3.

৭৮. Samuel Koenig, *Sociology: An Introduction to the science of Society*, (New York: Barms & Noble Inc. 1968), P. 303.

৭৯. Arnold Rose, in. Dr. Rajendra K. Sharma, *Social Problems and Welfare*, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 1998), P.1

৮০. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৮১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪ খৃ.), পৃ. ৪৬

আবার সমাজ মাত্রই এর সদস্যগণ কতিপয় আদর্শ ও মূল্যবোধ বিশেষত ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধের অনুসারী হয়ে থাকেন। এ সমস্ত আদর্শ ও মূল্যবোধের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজস্থ মানুষেরা যেমন তাদের প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করে তেমনি এগুলোর কার্যকর অনুশীলনই আবার সমাজকে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে। কিন্তু, সামাজিক সমস্যা এমনই এক অবস্থা যা সমাজের এ সকল আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য হুমকীস্বরুপ বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় অথবা এগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। আর সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ এ অবক্ষয় তথা ধ্বংস সমাজের মানুষকে অর্থনৈতিক ও আবেগীয় দুর্দশায় নিপতিত করে।

তাই Robert L. Barker (editor) তাঁর 'The Social Work Dictionary'তে বলেছেন সামাজিক সমস্যা হলো,-"Conditions among people leading to social responses that violates some people values and norms and cause emotional or economic suffering."[82] অর্থাৎ সমস্যা এমন এক অবস্থা যা সমাজের মানুষদেরকে সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রথার পরিপন্থী কাজের দিকে ধাবিত করে এবং আবেগীয় ও অর্থনৈতিক দুর্দশা সৃষ্টি করে।

Eurl Rabington and Martin S. Weinberg সামাজিক সমস্যার নির্ভরযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তাঁদের 'The Study of Social Problems' নামক গ্রন্থে, "a social problem to be an alleged situation that is in compatible with values of a significant number of people who agreed that action is needed to after the situation."[৮৩] অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা একটি অনভিপ্রেত অবস্থা যা অধিকাংশ মানুষের উপর মূল্যবোধগত সংশয় প্রদর্শন করে এ ধরণের পরিস্থিতি দূর করার জন্য কার্যক্রম প্রয়োজন হয়। এই ব্যাখ্যাটি বিশ্লেষণ করলে চারটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়।

১. অনভিপ্রেত অবস্থা (Alleged Situation)

২. মূল্যবোধগত সংশয় (Compatible with values)

৩. অধিকাংশ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে (Significant number of people)

৪. সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ প্রয়োাজন (action is needed)

মানুষ যখন কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন সে কর্মশক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দুর্বলতার জন্য কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। তেমনি সমাজ দেহকে মানব দেহের সাথে তুলনা করা চলে। সমাজের বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো অপরাধ, অত্যাচার ও অবিচার, সৃষ্টি হয় পরস্পরের সাথে পরস্পরের দ্বন্দ্ব; হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে। এর ফলে নষ্ট হয় সমাজের সংহতি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঝগড়া-ঝাটি কলহ ইত্যাদি সমাজের অন্যতম দৈনন্দিন বৈশিষ্ট্য হিসেবে ফুটে উঠে।[৮৪]

ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ১৯৯০ সালে এর প্রথম মানব উন্নয়নের বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করে, যা সারা পৃথিবীব্যাপি মানুষের কল্যাণজনক পরিস্থিতি পরিমাপে Human Development Index প্রণয়ন করে। এই ইনডেক্সটি তিনটি মৌলিক দিককে উন্মোচিত করে:

(ক) দীর্ঘ জীবন (longevity)-যা জন্মের ক্ষেত্রে জীবন প্রত্যাশা দ্বারা পরিমাপ করা হয়;

খ) জ্ঞান (যা হলো সাক্ষরতা, শিক্ষা অর্জন); এবং

গ) একটি সুন্দর জীবন যাপনের মাত্রা।[৮৫]

---

৮২. Robert L. Brker (editor), *The Social Work Dictionary*, (Washington, D.C.: NASW Press, 1995), P. 355

৮৩. Eurl Rubington and Martin S. Weinberge, *The Study of Social Problems Fine Perfectives*, (New York, Oxford University Press, Second Edition, 1977), P.4

৮৪. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

৮৫. আবু ইব্রাহিম মুহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৯৪২ সালে ইংল্যান্ডের বিভারিজ রিপোর্টে ৫টি সামাজিক অনাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো : Want (অভাব), Disease (রোগব্যাধি), Ignorance (অজ্ঞতা), Squalor (মলিনতা) এবং Idleness (অলসতা)।[৮৬]

মহাত্মা গান্ধী ৭টি অনাচারের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, politics without principles.[৮৭]

কতিপয় সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞায়িত করে বলেন, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থ প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে সমাজের মধ্যে ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- অনাচার, বিশৃংখলা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, ব্যভিচার, উন্মত্ততা, চুরি, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদি। এসব ব্যাধির ফলে সমাজে নানা রকম অপরাধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা ও সংজ্ঞাসমূহ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত পরিষ্কার ধারণা প্রদানে সক্ষম। সামাজিক সমস্যা মূলত: সমাজস্থ মানুষের জীবনের এমন এক অস্বাভাবিক, যাতনাদায়ক, অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত, অবাস্তব পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং যা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দেয় এবং যার প্রতিকার তথা উক্ত অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সমাজের মানুষ যৌথ ও সমবেত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সামাজিক সমস্যার নেপথ্য কারণ

সামাজিক সমস্যার কারণ

সামাজিক সমস্যা মূলত বহুবিধ কারণে সৃষ্ট এক অস্বস্তিকর সমাজিক অবস্থা বা পরিস্থিতি। তবে যে কারণেই সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হোক না কেন এটা সবসময়ই সমাজের জন্য হুমকীস্বরূপ এবং সামাজিক সমস্যা সর্বদাই বিশৃঙ্খল, অসংগঠিত, এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এটা সমাজকে পিছনের দিকে টানে এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এছাড়াও সামাজিক সমস্যা সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং সমাজের অনৈক্যকে উৎসাহিত করে।

একজন ৩১ বছর বয়সী নারী ব্যাংক কর্মকর্তা ধনী দেশ আমেরিকার দারিদ্র্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "দরিদ্ররা নিজেরাই এর জন্য দায়ী কারণ তাদের অধিকাংশ অলস এবং অনির্ভরশীল এবং যে সামান্য পরিমাণ অর্থ তারা উপার্জন করে তা তারা মদ বা অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় করে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা চিন্তা না করেই।" এধরনের মনোভাব সমস্যার প্রতি একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি, তা হলো,

---

৮৬. মোঃ শহীদুল্লাহ, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*,(ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪),পৃ. ১৮

৮৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Social_Sins

এই ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হলো ব্যক্তিগত সমস্যা। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ব্যক্তিকেই এজন্য দায়ী করা হয়। সমস্যার উদ্ভব এবং সমাধান উভয়ই ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তির সাথে জড়িত।[৮৮]

এভাবে আমরা সমস্যাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি-ব্যক্তিগত এবং সামাজিক-এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমস্যার কারণ নির্ধারণে। কোনো সমস্যাকে ব্যক্তিগত বা সামাজিক বলার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে জানতে পারি।

Sennett এবং Cobb (1972) বলেন, একজন আবর্জনা সংগ্রহকারী, যিনি একেবারে নিরক্ষর, যিনি তার নিজের বর্তমান অবস্থানের কারণে নিজের উপরেই দোষ চাপাতে চান, "দেখ, আমি জানি এটি কারও ভুল নয়, কিন্তু আমার একারই দোষ যে আমি বর্তমানে এই অবস্থানে আছি, আমি মনে করি, যদি আমি এই ময়লা-আবর্জনা না ঘাটতাম।"[৮৯] এই মানুষটি তার সমস্যাকে ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিচ্ছে এবং নিজেকে অসামর্থ্য ভাবছে। অপরদিকে, কোনো সমস্যাকে সামাজিক বলা হলে তা আমাদেরকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং ভিন্ন ফলাফলের দিকে আমাদেরকে ধাবিত করে। যদি কোনো ব্যক্তি তার দরিদ্রাবস্থার জন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করে, তিনি যৌথ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন, যার মৌলিক লক্ষ্য হবে সমাজকে দরিদ্রাবস্থা থেকে মুক্ত করা। সেক্ষেত্রে তিনি নিজেকে তুচ্ছ ভাববেন না, কারণ তার দারিদ্র্যাবস্থার জন্য তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছেন না। যদিও তার সাময়িকভাবে ক্ষোভ থাকতে পারে তবে তিনি নিজেকে ঘৃণা করবেন না। তিনি তার সমস্যাকে ব্যক্তিগত ভাববেন না; বরং তার সমাজের সমস্যা হিসেবে দেখবেন। তিনি মনে করবেন তিনি ভুক্তভোগী।

সমস্যা ব্যক্তিগত হলেও তা যেমন ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক হতে পারে তেমনি সামাজিক সমস্যাও কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে আঘাত করতে পারে। যখন কোনো সমস্যা সমাজে বসবাসরত কোনো ব্যক্তিকে একক বা পারিবারিকভাবে সমস্যায় আবর্তিত করে এবং তা যদি সমাজের বৃহত্তর অংশকে বা একটি ক্ষুদ্র অংশকে আবর্তিত না করে তবে নিঃসন্দেহে তা ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে গৃহীত হবে। তবে ব্যক্তির এ ধরনের সমস্যা ক্রমান্বয়ে যদি ব্যাপক অংশকে আক্রান্ত করে তবে তখন সেই সমস্যা আর ব্যক্তিগত থাকে না; বরং সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। কেননা, সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, সামাজিক সমস্যা হলো একটি সামাজিক অবস্থা (যেমন দারিদ্র) বা একটি আচরণের ধরণ (যেমন সমন্বিত নির্যাতন) যা কোনো সমাজের কিছু ব্যক্তিকে বা সকল মানুষকে ক্ষতি করে।[৯০]

নিম্নে সামাজিক সমস্যার কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হলো:

১.সামাজিক বিশৃঙ্খলা : সমাজকে একটি সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার অংশসমূহ একটি নিয়মের মাধ্যমে সংযুক্ত। সামাজিক সমস্যা তখনই উদ্ভূত হয় যখন সামাজিক ব্যবস্থা বা এর কোনো অংশ বা অংশসমূহ সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমহ্রাসমান কার্যকারিতার কারণে বিশৃংখল হয়ে পড়ে। এভাবে সামাজিক বিশৃংখলা সমাজের সাংগঠনিক কাঠামোর ভেঙ্গে পড়াকে নির্দেশ করে, সমাজের বিভিন্ন উপাদান অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সামাজিক আদর্শ, বিশেষ গোষ্ঠি বা ব্যক্তির প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক বিশৃংখলা ব্যক্তিগত বিশৃংখলার জন্ম দিতে পারে, যেমন, মানসিক অসুস্থতা, মাদকাসক্তি বা অপরাধমূলক আচরণ।[৯১] সামাজিক বিশৃংখলার অনেক কারণ থাকতে পারে: আদর্শ ভেঙ্গে পড়তে পারে অপর্যাপ্ত সামাজিকীকরণের কারণে; সামাজিক ব্যবস্থা হীনভাবে তার আঙ্গিক পরিবেশের সাথে পরস্পর

---

৮৮. আবু ইব্রাহিম মুহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৮৯. Sennett, Richard, and Jonathan Cobb, *The Hidden Injuries of Class*,(New York, Vintage Books, 1972), p.96.

৯০. আবু ইব্রাহিম মুহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

৯১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

সম্পর্কিত হবার কারণে; অথবা সামাজিক কাঠামো এমন হতে পারে যে, অনেক মানুষ আবেগনির্ভরভাবে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছুতে বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। বহুবিধ সামাজিক বিশৃংখলার কারণ দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন। কেন সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক বিশৃংখলা আনে এ সম্পর্কে উইলিয়াম জি, অগবান তার সাংস্কৃতিক ব্যবধান (Cultural lag) তত্ত্বটি প্রদান করেছেন।[৯২]

২. মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ও অবক্ষয়ঃ শুধু ব্যক্তিভেদে নয়; বরং পরিবার, দল, গোষ্ঠী ভেদেও মূল্যবোধের পার্থক্য দেখা যায়। সমাজে বহু ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী বিদ্যমান থাকায় তাদের মধ্যে মূল্যবোধের পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব থাকাও স্বাভাবিক। মূল্যবোধের এই পার্থক্য বা দ্বন্ধ সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

আমেরিকান সমাজে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব খুব বেশি হওয়ার একটি কারণ হলো সমাজের অসমত্ত্বতা, সমাজে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ বিরাজমান, ফলে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তুলনামূলকভাবে একটি ছোট সনাতন সম্প্রদায়ে, একটি সহনীয় মাত্রায় যৌথ মতের ভিত্তিতে সৃষ্ট মূল্যবোধ রয়েছে; মানুষ একই বিশ্বাস এবং স্বার্থ পোষণ করে, ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব খুব কম। কিন্তু একটি জটিল গণসমাজে দ্বন্দ্বপূর্ণ মূল্যবোধ এবং স্বার্থ বিরাজমান থাকে। আমরা যেভাবে দেখেছি, সমাজে বিভিন্ন অবস্থানের মানুষ বিভিন্নভাবে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে থাকে, ফলে সামাজিক সমস্যাকে তারা বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তাদের শ্রেণি, আয়, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইতিহাসের ভিত্তিতে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে তাদের মনোভাব ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। আবার প্রত্যেক গোষ্ঠি ভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত।

৩. মানসিক চাপ ও বিচ্যুত আচরণঃ আধুনিক সময়ে মানুষের গতিশীল ও জটিল সমাজ জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে মানুষকে প্রতিনিয়তই তীব্র প্রতিযোগিতা ও মানসিক চাপ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এতে সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা।

বিচ্যুত আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক আচরণের প্রতিফল হিসেবে কিছু সামাজিক সমস্যা বিবেচিত হতে পারে, যে আচরণ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আদর্শ দ্বারা নির্দেশিত হয়। বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কারণ, অধিকাংশ মানুষ সমাজে প্রভাবশালী কিছু আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচ্যুত আচরণের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। এসব আদর্শকে তারা অপছন্দনীয় এবং হুমকিস্বরূপ মনে করে, সমাজে বিরাজমান তাদের মূল্যবোধের জন্য অসম্মানজনক মনে করে এবং চলমান সমাজের জন্য বিপদজনক মনে করে থাকে।[৯৩] Paul B. Horton and Gerald R. Leslie এর *The Sociology of Social Problems* গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে :

কোনো ব্যক্তি যার মধ্যে বিচ্যুত আচরণের ব্যক্তিত্ব সংগঠন রয়েছে, তারা হলো সমন্বয়হীন মানুষ যাদের স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ততার চাপ, প্রবল উৎসাহ, ঘৃণা, সংকল্প রয়েছে এবং এসব তাদেরকে গভীরভাবে সামাজিক সমস্যার মধ্যে নিপতিত করে। তাদের যুক্তিহীন উৎসাহ তাদেরকে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করে... ।[৯৪]

সামাজিক সমস্যার আরও কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে,[৯৫]

- ব্যক্তিগত সমস্যা

---

৯২. আবু ইব্রাহিম মুহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৯৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৯৪. Paul B. Horton and Gerald R. Leslie, *The Sociology of Social Problems*, (New York, Free Press, 4" Edition,1970), p. 37

৯৫. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

- সাংস্কৃতিক সমস্যা
- কাঠামোগত সমস্যা

ক. ব্যক্তিগত সমস্যা : ব্যক্তি তার মনস্তাত্ত্বিক, জৈবিক, সমবয়সী বা পারিপার্শ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, আদর্শ বা বিশ্বাসকে ধারণ না করে সমাজের চোখে বিচ্যুত আচরণ হিসেবে স্বীকৃত কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করে। শহরায়ন, শিল্পায়ন, পাশ্চাত্যকরণ, উচ্চশিক্ষা, বেকারত্ব, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, মাদকাসক্তি, ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান, আইন প্রয়োগে শৈথিল্য বা আইনের ফাঁক, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সামাজিক সুযোগের দুষ্প্রাপ্যতা বা অসম বণ্টন প্রভৃতি একক ক্ষেত্রে আবার কখনও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচ্যুত আচরণকারী সৃষ্টি করে থাকে। সমাজে এভাবে ব্যক্তিগত বিচ্যুত আচরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। যেমন একসময়ে আমাদের সমাজে ইভ টিজিংকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা হতো না। কিন্তু তা নিতান্তই ব্যক্তিগত কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুত আচরণ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজে ইভ টিজিং-এর সংখ্যা এবং ক্ষতিকর প্রভাব এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, ইদানিং সরকার ইভটিজিং বিরোধী আইন প্রণয়ন করে একে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে ইভ টিজিং এখন আমাদের সমাজে সামাজিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত।

খ. সাংস্কৃতিক সমস্যা : বিশ্বায়নের ফলে উন্নত বিশ্বসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এখন আর কোনো একটি একক মৌলিক সংস্কৃতির ধারক বা বাহক নয়। প্রতিটি সংস্কৃতি বিশ্বায়নের প্রভাবে তার নিজস্ব মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রথা, বিশ্বাস, লোকাচার প্রভৃতিতে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। যাকে আমরা নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে দেখছি। আবার বিশ্বায়নের ফলে স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাবও পড়ে থাকে। তবে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব Cultural lag সহ বিবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারগুলোর ব্যর্থতা, পরিবারগুলোতে বা প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বা মূল্যবোধ ভিত্তিক আদর্শের বাণী শিক্ষার সুযোগ হ্রাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস, সহনশীলতা ও ধৈর্যের অভাব প্রভৃতি সমাজে বিচ্যুত আচরণ বা অপরাধ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়।

গ. কাঠামোগত সমস্যা : সমাজের কাঠামোগত ত্রুটি সামাজিক বিচ্যুতি সৃষ্টি করে। কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ বা মার্কসবাদীদের মতে, সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে সামাজিক কাঠামোই মূলত দায়ী। কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদীদের মতে, সমাজে বিভিন্ন System এবং Sub-system এর কারণে সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। যদি এই system এবং Sub-system এর মধ্যে কোনোরূপ ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়, তবে সমাজের কোনো অঙ্গ বা অঙ্গসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়।

মূলত ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, জৈবিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি কারণের প্রেক্ষিতেই সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। সামাজিক সমস্যাগুলোও প্রকৃতিগত দিক বিচারে বিচিত্র হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকে সামাজিক সমস্যার বহুমুখী কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানী Ogburn ও Nimcoff তাঁদের A Handbook of Sociology গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার নিম্নোক্ত ৩টি কারণের কথা উল্লেখ করেন:[৯৬]

১. প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষ ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্যহীনতা, বিশেষত কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা যেমন মহামারী, বন্যা, ভূমিকম্পের সাথে মানুষ খাপ খাওয়াতে পারে না।

---

৯৬. 1.The maladjustment of men and culture to the natural environment, particularly certian, extra ordinary manifestation such as epidemics, floods and earthquakes.

2.The lack of adjustment of man's inherited nature to the demands of group life and culture.

3.The stress caused in correlated parts of culture when they change at unequal rates of speed.

Ogburn and Nimcoff, *A Handbook of Sociology*, (London: Routhedge and Kegan Paul Ltd. 1960), P. 546-547

২. দলীয় জীবন এবং সাংস্কৃতিক চাহিদার সাথে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানের অভাব।
৩. সংস্কৃতির বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত অংশের অসম গতিসম্পন্ন পরিবর্তন হেতু উদ্ভূত চাপ।
আবার সমাজ বিজ্ঞানী C.M. Case সামাজিক সমস্যার জন্য যে সমস্ত কারণ দায়ী বলে উল্লেখ করেছেন তা হলো:
১. বিরূপ প্রতিকূল অবস্থা
২. অসংগঠিত ও ত্রুটিযুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা
৩. বিভিন্ন দলের মাঝে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব
৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ত্রুটিযুক্ত প্রকৃতি [৯৭]
সামাজিক সমস্যার কারণ সম্পর্কে Gillin ও অন্যান্যরা বলেন,
"All social problems grow out of the social. The problem of the adjustment of man to his universe and the social universe to man."[৯৮]
অর্থাৎ সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয় বিশ্বজগতের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে বিশ্বের সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যা হতেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে।
আর সমাজ বিজ্ঞানী Talcott Persons পার্থিব সম্পদের সাথে মানুষের অসঙ্গতিকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৯৯]
তবে সার্বিক দিক বিবেচনায় সামাজিক সমস্যার আরো কিছু নিম্নোক্ত সাধারণ কারণসমূহ উল্লেখ করা যায়:

১. সম্পদ ও সুযোগের অসম বন্টন

সম্পদের অসম বণ্টন সমাজে সৃষ্টি করে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। সমাজের সকল সম্পদ ও প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার উপর যদি কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের অধিকার থাকে তবে সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। আর এই ভারসাম্যহীনতাই জন্ম দেয় নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা।[১০০]

২. সামাজিক পরিবর্তন

সমাজ মাত্রই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। সময়ের আবর্তে সমাজের প্রথা প্রতিষ্ঠান, সমাজের কাঠামো, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতিতে আসে পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন যে সবসময়ই সমাজের জন্য ইতিবাচক হয় তা নয়; বরং অনেক সময় সামাজিক পরিবর্তন সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

৩. জনসংখ্যার ত্রুটিপূর্ণ কাঠামো

কোন দেশের জনসংখ্যার কাঠামো হতে হবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশের আয়তনের তুলনায় মোট জনসংখ্যা যদি কম অথবা বেশী হয়, তাহলে সমাজের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।[১০১]

৪. যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

---

৯৭. 1. Hostile physical condition.
2.Unorganized and defective social system
3.Conflict of culture of different group
4. Defective nature of population increase
ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৯৮. Gillin, etal, *Social Problems*, (Bombay,The Times of India Press,1969), P. 451.
৯৯. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১০০. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*, (ঢাকা: শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৭), পৃ. ১৯
১০১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

যুদ্ধ বা সশস্ত্র সংঘাত তৈরি করে নানা সামাজিক সমস্যা। যুদ্ধ যদি কল্যাণকরও হয় তারপরও তা সমস্যামুক্ত সমাজ উপহার দিতে পারে না। অন্যদিকে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত অবস্থায়ও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাপন সংকটাপন্ন হতে পারে।

৫. অশুভ শ্রেণীর উদ্ভব

সমাজে প্রতারণা, শঠতা এবং অবৈধ পন্থায় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠির সংখ্যাধিক্য ঘটলে তারা তাদের অবৈধ অর্থ ও পেশী শক্তি দিয়ে মানবতা-নৈতিকতা বর্জিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়। ফলে সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা অবরুদ্ধ ও অকার্যকর হয়ে ওঠে এবং ভোগান্তিকর বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।[১০২]

৬. মৌল-মানবিক চাহিদার অপূরণ

সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ যদি কোন সমাজে অপূর্ণ থেকে যায় অথবা মানুষ যদি এগুলো সমানভাবে ভোগ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলেও সমাজে বিশৃঙ্খলা তথা সমস্যা দেখা দেয়।

৭. সাংস্কৃতিক শূন্যতা

সাংস্কৃতির উপাদানগুলোর মাঝে কোন কারণে যদি অসম পরিবর্তন সংগঠিত হয় তবেই দেখা দেয় সাংস্কৃতিক শূন্যতা। আর সাংস্কৃতিক এ শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা।

৮. শিল্পায়ন ও শহরায়ন

শিল্পায়ন ও শহরায়ন আধুনিক ও গতিশীল জীবন দান করলেও সমাজের জন্য আবার নানা সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এছাড়া সমাজের নানা বিশৃঙ্খলার জন্যও এই উপাদান দুটি দায়ী। বস্তি, মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, শিশুশ্রম প্রভৃতি সমস্যাগুলোর সাথে শিল্পায়ন ও শহরায়ানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

৯. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি এবং এদের প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১০৩]

সমস্যার নেপথ্য কারণ

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ আমরা উপরে আলোচনা করেছি এবং যেকোনো সমাজকে সমস্যামুক্ত করার সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রচেষ্টা সবসময়ই আমাদের চোখে পড়ে। বড় বড় সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম হয়, দেশে-বিদেশের অসংখ্য প্রজ্ঞাবান মানুষ সে সকল সমাবেশে সমস্যা নিরসনের মোক্ষম নানা উপায় বাতলে দেন। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয়না। এর কারণ হলো, সমাজের মানুষের নিকট সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে নেপথ্য মূল কারণ রয়েছে সেগুলো আমরা চিহ্নিত করতে এড়িয়ে যায়। ফলে সমস্যা থেকে যায় সমস্যার জায়গাতেই। নিম্নে তেমন কিছু সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির নেপথ্য কারণ উল্লেখ করা হলো-

ক. নারীদের অমার্জিত চালচলন/উচ্ছৃংখল চলাফেরা

পবিত্র কুরআনে নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে তাগিদ দেবার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের মতো সাজ-সজ্জা করে নির্লজ্জের মতো রাস্তায় চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

---

১০২. এ.এফ.এম. আলী ইমাম, *সমাজতত্ত্ব*, (ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২), পৃ.১৯

১০৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"হে নবি পত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতা যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।"[১০৪]

কিন্তু আজ মেয়েরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসে কুরআনের হুকুমের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেহায়ার মতো চলাফেরা শুরু করেছে। আপত্তিকর পোশাক পরে হরেক রকমের প্রসাধনী মেখে চরম সাজসজ্জা করে রাস্তা-ঘাটে, বাইরে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের মাঝে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেড়াচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এভাবে তারা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ফলে তারা পুরুষের কাছে নিজেদেরকে সহজলভ্য করে তুলছে। আর তাদের এহেন সৌন্দর্য প্রদর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশের একশ্রেণীর টগবগে যৌবনের যুবকেরা উন্মাদের ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কাম চরিতার্থ করছে।[১০৫] যেসব মেয়ে ইসলামের নির্ধারিত পর্দার সীমা রক্ষা করে প্রয়োজনে বাইরে চলাফেরা করে তারা অবশ্যই পুরুষ দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয় না। নারীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো জঘন্য সামাজিক অপরাধ।

খ. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ

প্রগতির নামে দিন দিন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশে কতিপয় এনজিও ও তথাকথিত কিছু নারীসংগঠন। তারা সে সকল মুসলিম প্রধান দেশের মুসলিম ঘরের যুবতী, অবিবাহিত মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে এনে পুরুষের কাজে লাগাচ্ছে এবং পুরুষের সাথে একসঙ্গে একই মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছে। দারিদ্র্য আর বেকার সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের কোমলমতি মেয়েরা নিজেদেরকে এসব কাজে জড়িয়ে ফেলছে। তারা যা কিছু করছে নারীদের জন্য তাতে নারী আরও ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান সংখ্যক কোটা বাড়িয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা, পুরুষের সাথে ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করে বাসে-ট্রেনে চলাফেরা করা। যুবক-যুবতী একসাথে সুইমিং কষ্টিউম পরে সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা, গেঞ্জী হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা, দেহের বিশেষ অংশ দুলিয়ে দুলিয়ে ভলিবল, ফুটবল খেলা এসবই নারীদেরকে পুরুষের কাছে সহজলভ্য করে দিচ্ছে। আর সমাজের একশ্রেণীর বিকৃত রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত প্রগতিবাদী কিছু অভিভাবক এগুলোকে নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন বলে জাহির করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বস্তুত নারী স্বাধীনতা নামে নারী-পুরুষের এহেন অবাধ মেলামেশার সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর সম্ভ্রমহানির পথকেই সুগম করে দেয়া হচ্ছে।[১০৬]

গ. সহশিক্ষা

---

১০৪. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব (৩৩) : ৩২-৩৩।

১০৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৫০৯

১০৬. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

নারীসমাজের জন্য আর এক মহা অভিশাপ হচ্ছে সহশিক্ষা। নারী পুরুষের যৌবনের ভরাবসন্ত অতিবাহিত হয় তাদের শিক্ষাজীবনে। সহশিক্ষার সুযোগে বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছে। এদের এসব প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ নিচ্ছে দৈহিক সম্পর্কে। তরুণ-তরুণীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হাজারো ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আর যেক্ষেত্রে তরুণেরা তরুণীদের সম্মতি আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে সেক্ষেত্রে বেছে নিচ্ছে ধর্ষণের পথ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ষণ বৃদ্ধি সহশিক্ষারই অনিবার্য প্রতিফল। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা ও সহশিক্ষার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার চরম সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। এক রিপোর্টে দেখা যায় বর্তমানে আমেরিকার একটি শহরের মাধ্যমিক স্কুলে শতকরা ৪৮জন ছাত্রী গর্ভবতী। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১ লক্ষ ১০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে যাদের বয়স বিশ বছরের নিচে। এরা প্রাথমিক স্কুলেই যৌনচর্চা শুরু করে। এগারো ও বারো বৎসরের ৩১২ জন ছাত্রীর উপর এক জরিপ করে দেখা যায় তন্মধ্যে ২২৫ জন যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্থ।[১০৭]

আমেরিকার Oklahuma বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিদায় অনুষ্ঠানে অতি আনন্দের এক পর্যায়ে সকলে উলঙ্গ হয়ে রাতভর নাচের অনুষ্ঠান করে। সহশিক্ষার কারণে আমেরিকার স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ৪৫ ভাগ মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে থাকে, সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ১০৭ টি কলেজ এবং রাশিয়াতে ১১০ টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[১০৮]

আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্সের দেশে যদি সহশিক্ষার কুফল এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে থাকে সেখানে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান রক্ষণশীল দেশে আমরা আমাদের যুবসমাজকে কিভাবে এর কুফল থেকে রক্ষা করতে পারি?

ঘ. নগ্ন চলচ্চিত্র ও অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন

যৌন হয়রানির মত অনেক সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো নগ্ন দৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও কুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার । এ দেশের সিনেমা হলগুলোতে হরহামেশা চলছে অশ্লীল চলচ্চিত্র। ছবিতে নায়ক-নায়িকাদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় অভিনয় ও নাচ-গান প্রদর্শিত হচ্ছে। এতে করে আমাদের যুবসমাজ ধর্ষণের কৌশল জানতে পারছে। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির আশীর্বাদে ডিস এ্যান্টেনা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাশ্চাত্য নগ্ন সংস্কৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে। কম্পিউটারের সিডি ও হার্ডডিস্কের মাধ্যমে নীল ছবি দেখানো হচ্ছে যা যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি অনুষ্ঠানমালায় তরুণ-তরুণীদের একত্রে নাচের ঢলাঢলি, গানের কলাকলি, বিজ্ঞাপনে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। দেশী-বিদেশী সুন্দরী নর্তকী আমদানি করে লাখ লাখ দর্শকের সামনে কাত হয়ে চিত হয়ে যুবতী মেয়েদের দৈহিক কসরৎ প্রদর্শন করে তরুণদেরকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আর তখনই যৌবনের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে ঐ সব তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারীদের উপর।[১০৯] আর এর জলন্ত প্রমাণ থার্টি ফার্স্ট নাইটে 'বাঁধন' যখন গভীর রাতে যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য প্রদর্শন করতে আসে তখনই একই অনুষ্ঠানে আসা এ দেশের কয়েকজন তার বস্ত্রহরণ করে শত শত দর্শকের সামনে তাকে দিগম্বর করে এক কুৎসিত উৎসবে মেতে ওঠে। পরে অবশ্য বস্ত্রহরণকারীরা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। কিন্তু যদি এ দেশের বাঁধনেরা এহেন পাশ্চাত্য কৃষ্টি-

---

১০৭. সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া-সালামুল আলাম* (বৈরূত: দারুস সালাম, ১৯৯৩ খৃ.), পৃ.২১

১০৮. *আদ-দাওয়াহ পত্রিকা*, ঢাকা: ১৯৭৮।

১০৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১

কালচার পালন করতে এভাবে বাইরে বের হয়ে না আসত আর আমাদের যুবকদেরকে এভাবে উত্তেজিত না করত তবে হয়তো এহেন ঘৃণিত অপরাধটি নাও ঘটতে পারত। এসব অশ্লীল, নোংরা, যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে যুবক-তরুণেরা, যুবক-পুলিশেরা কেন আধবয়সী বৃদ্ধদেরও যৌনউত্তেজনা না দেখা দিয়ে পারে না। বিড়ালের সামনে ভাজা মাছ রেখে সারাদিন ঠেঙ্গালেই কি বিড়াল ভাজা মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে ঠেঙ্গানীর ভয়ে? আগুনের উপর ঘি রেখে সারাদিন যদি বলা হয়ে এই ঘি গলবিনা, তাহলে ঘি না গলে থাকবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে তার অনিবার্য পরিণতি ভোগ করতেই হবে। এটাই বাস্তবতা।

ঙ. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবেই মূলত সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক নর-নারীর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য একথা সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত । একমাত্র ইসলামি শিক্ষা পারে মানুষকে তার পাশবিকতা দূর করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে । ইসলামি শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে সবসময় সৃষ্টার ভয় নিহিত থাকে। তার পক্ষে সহজেই বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ ও পাপকাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। জাহেলী যুগে নারীর যে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র আমাদের কাছে ভেসে ওঠে তার অবসান ঘটায় ইসলাম। যে বর্বর আরব জাতি একসময় নারীকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত তারাই পরবর্তীতে ইসলামের সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ইজ্জত-আব্রুর একশত ভাগ রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হয়। নারীকে তারা সমাজে একজন মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং কন্যা হিসেবে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামি শিক্ষায় সুশিক্ষিত একজন যুবক সবসময় পরকালের ভয়ে ভীত থাকে। নারী ধর্ষণ তো দূরের কথা নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকে যে তাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহলে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। নৈতিক শিক্ষার অভাবেও অসংখ্য সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যৌন হয়রানির ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রক্ষকদের ভেতরে যদি নৈতিকতা না থাকে তবে কাদের কাছে আমরা নিরাপত্তা আশা করব। তাদের মধ্যে যদি নীতিবোধ থাকত তবে তাদের হাতে কোন নারীর সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হতো না। বরং তারা অপরাধীদের পাকড়াও এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। নীতি-নৈতিকতার অভাবে আজ রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছে।[১১০]

চ. ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা

সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির আর একটি বড় কারণ অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার না হওয়া। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধের ঘটনা বিচারের আওতায় আসে না। কতিপয় দু'চারটি মামলা আদালতে উত্থাপিত হলেও তার প্রকৃত বিচার হয় না। আদালতে অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়েও নির্যাতিত ব্যক্তি নানা বিড়ম্বনার শিকার হয়। তাই অনেকে নির্যাতিত হয়েও আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে লাঞ্ছনার গ্লানি নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। কেউবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার কখনও যদি অপরাধের আলামত প্রমাণিতও হয় সেক্ষেত্রে আদালত নির্যাতিত ব্যক্তির চেয়ে অপরাধীর পক্ষাবলম্বনে বেশি তৎপর থাকে এবং নানা কৌশলে অপরাধীকে মুক্তি দিয়ে দেয়। ফলে অপরাধীরা আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার নব উদ্যোমে অপরাধে মেতে ওঠে।

---

১১০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সামাজিক সমস্যা ও প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা যেমন নির্ধারিত নয়, তেমনি সমস্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গৃহিত নীতিমালাও নির্ধারিত নয়। এক্ষেত্রে নেই কোন সর্বজনীন ব্যবস্থা বা নীতি। আজ যেটিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় অতীতে তা কোন সমস্যাই ছিল না। আবার এ সমস্যাটি ভবিষ্যতে সমস্যা বলে চিহ্নিত হতে নাও পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন গ্রীসে পতিতাবৃত্তিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হত না। অনুরূপভাবে আমেরিকায় দাসপ্রথা সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ছিল না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এভাবে আধুনিক যুগে মাদকাসক্তি, অপরাধ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, আত্মহত্যা প্রবণতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম, যুব অসন্তোষ, শ্রম অসন্তোষ, পতিতাবৃত্তি, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা, বস্তি, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি সমস্যাগুলো আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের বিশেষ করে সমাজকর্মীদের আলোচনা ও সমস্যা সমাধানমূলক কর্মকৌশলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে।[১১১]

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠি প্রায়শই সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা গঠনে প্রায়শই ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আমেরিকাবাসী তাদের সমাজে গর্ভপাতের প্রচলনকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন। অপরদিকে, কেহ কেহ এর অনুপস্থিতি বা এই প্রথার উপরে নিষেধাজ্ঞাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন। কিছু আমেরিকাবাসী সমকামিতাকে সামাজিক সমস্যা বলে মনে করেন, অপরদিকে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডের উপরে কেহ কেহ Prejudice এবং Discrimination পোষণ করেন। বস্তুত, সামাজিক সমস্যা বলতে কী বুঝানো হবে সে সম্পর্কে পার্থক্য নির্ভর করে সমাজের সদস্যদের পোষণ করা আদর্শ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের উপরে, এমনকি তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করেও তা গঠিত হতে পারে। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত ধারণা গঠনে শুধুমাত্র একটি সমাজের মধ্যেই পার্থক্য দেখা যায় তাই নয়, বরং, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে এবং সময়ের আবর্তে এর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঊনবিংশ শতাব্দিতে স্বামীর আইনগত এবং বৈবাহিক অধিকার ছিল তার শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্ত্রীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার। বর্তমানে, বৈবাহিক অধিকার সত্ত্বেও স্বামী কোনো ক্রমেই তার স্ত্রীকে নির্যাতন করার আইনগত অধিকার পায় না। চা পান করা অপর একটি উদাহরণ, সময়ের আবর্তে সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর প্রতি মানুষের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দিতে ইংল্যান্ডে চা পান করাকে বিবেচনা করা হতো "Base Indian practice" হিসেবে, যাকে মনে করা হতো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান হিসেবে, অস্পষ্ট শিল্প হিসেবে, জাতিকে হেয় করার চক্রান্ত হিসেবে, বর্তমানে ইংরেজরা বিকেলে চা পানের জন্য স্বনামধন্য হয়ে আছে।[১১২]

পৃথিবীর সকল দেশে, সকল কালে সামাজিক সমস্যা থাকলেও সমস্যাসমূহ যেমন এক রকম ছিলো না তেমনি একই বিষয়কে পৃথিবীর সকল দেশে, সকল সমাজে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনাও করা হয়নি। এর কারণ সমস্যা নির্ধারণে গৃহীত নীতিমালা বা দৃষ্টিভঙ্গি। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সমস্যা একটি আপেক্ষিক বিষয়, নির্ধারিত নয়। এক সমাজের জন্য যা সমস্যা অন্য সমাজের জন্য তা

---

১১১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১১২. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২

সমস্যা নয় বরং সুবিধা। যেমন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার একটি সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়া সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ জাতীয় সমস্যার উল্লেখ করে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, "আমেরিকায় শিশু জন্মহার আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। বাবা-মা'রা শিশু মানুষ করার কঠিন দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। শিশু মানুষ হয় যে পরিবারে সেই পরিবারই ভেঙে পড়েছে- কে নেবে শিশুর যন্ত্রণা? জীবনকে উপভোগ করতে হবে। আনন্দ খুঁজে বেড়াতে হবে। শিশু মানেই বন্ধন। বিয়ে এখানকার তরুণ সমাজে খুব আকর্ষণীয় কিছু নয়। কারণ সেখানেও বন্ধন। একটি মাত্র তরুণীর সঙ্গে জীবন কাটিয়ে দিতে হবে, কি ভয়ঙ্কর! তারচে' অনেক ভালো লিভিং টুগেদার। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে পছন্দের তরুণ-তরুণীর একত্রে বসবাস। যদি কোনো কারণে বনিবনা না হয়, জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে সরে পড়ে দু'দিকে। সাধু ভাষায় বলা চলে, 'গেল ফুরাইল। মোকদ্দমা হইল ডিসমিস।' এখানে সবাই দ্রুত মামলা ডিসমিস করতে চায়। মামলা বাঁচিয়ে রাখতে চায় না।[১১৩] বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশে জন্মহার কমে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা কাউকে করতে দেখা যাচ্ছে না। বরং জন্মহার হ্রাস করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সরকারকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে হচ্ছে।

মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে মাদক দ্রব্যে যে কোনো ধরনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অমুসলিম দেশগুলোতে এ নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও মাদকদ্রব্যের ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর সকল শিল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশ মাদকাসক্তিকে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর বিবেচনা করে এর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে।[১১৪] বাস্তবে সে ঘোষণা নিতান্তই একটি কৌতুক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অমুসলিম দেশগুলোতে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট মাদকদ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মীয় নিষিদ্ধতা অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবসায়ীদের মাদক ব্যবসায়ের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। মাদকাসক্তিকে যদি সত্যিকারার্থে সমস্যা মনে করা হতো, তাহলে এভাবে নামেমাত্র বাধা দিয়ে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হতো না। কোথাও কোথাও এই বাধাটুকুও নেই। বাংলাদেশের একটি অভিজাত ক্লাবের মাদকদ্রব্য বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া যায়। "ঢাকা ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা ১৫শ। এদের মধ্যে সাড়ে ৪শ সদস্য বৈধ পারমিটধারী বা সরকারিভাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত। কিন্তু দেখা গেছে, পারমিট না থাকা সত্ত্বেও প্রতি রাতে শত শত সদস্য এবং তাদের বন্ধু অতিথিরা ক্লাবের বিভিন্ন ফ্লোরে বসে মদপান করছেন। বছরে ঢাকা ক্লাবে গড়ে বিয়ার বিক্রি হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ ক্যান। ঢাকা ক্লাবের সদস্য সচিব গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মোজাহেদুল ইসলাম ৫ অক্টোবর ২০০৯-১০ অর্থবছরের চাহিদাপত্র উল্লেখ করে জানান, এ পর্যন্ত ক্লাবে ৪০৫ জন মুসলমান ও ১৪ জন অন্য ধর্মাবলম্বী পারমিটধারী তাদের মদ্যপানের পারমিট নবায়ন করে মদপান করছেন।[১১৫]

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে আদর্শ ও নীতিগত ভিন্নতার কারণে নানা পার্থক্য তৈরি হলেও এটা যথার্থ যে, সকল সামাজিক সমস্যাই সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। সে অন্তরায়ের পরিধি ক্ষেত্র বিশেষে কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু অন্তরায় যে হয় তাতে কোনো সংশয় নেই। উদাহরণত বলা যায়, প্রাচীন গ্রিসে পতিতাবৃত্তি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ছিলো না। এর অর্থ এই নয় যে, তখন এই পাপাচারগুলো সমাজে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করতো না বা এতে মানুষের অসুবিধা হতো না। কিন্তু মানুষের বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সুকৃতি মূর্খতা, অজ্ঞতা ও পাপাচারে এতটাই

---

১১৩. হুমায়ূন আহমেদ, *আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ১১৩-১১৪

১১৪. আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং জাতিসংঘের সে সময়কার মহাসচিব জনাব কফি আনান এক যুক্ত ঘোষণায় মাদক প্রতিরোধের জন্য জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে সর্বাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ জুন ২০০৪)

১১৫. দৈনিক যুগান্তর, ২০ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.২

ঢেকে গিয়েছিল যে, এগুলোর সমস্যা উপলব্ধি করার মত অবস্থা তাদের ছিল না। কুরআন মজিদে তাদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ () أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ

"যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ বা সন্ত্রাস, বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি কর না, তখন তারা বলে, নিশ্চয় আমরা হলাম শান্তি স্থাপনকারী। হুঁশিয়ার! মূলত তারাই হলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।"[১১৬]

তাদের এ বোধশূন্যতা এবং প্রকৃতি বিষয় না বোঝার অক্ষমতার কারণ হলো, ক্রমাগত পাপাচার ও অব্যাহত কুফরির কারণে তাদের বোধই নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের এ অবস্থা বর্ণনা করে কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহ (অবিরাম কুফরির কারণে) তাদের অন্তর ও কানসমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখসমূহের উপর রয়েছে পর্দা এবং তাদের জন্য আছে চরম শাস্তি।"[১১৭]

প্রাক-ইসলাম আরবেও পতিতাবৃত্তিকে সমস্যা মনে করা হয়নি। মাদকাসক্তি, জুয়াখেলা, যুদ্ধ, আক্রমণ ইত্যাদিও এ সময়ে সমস্যা হিসেবে স্বীকৃত ছিলো না। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে উল্লিখিত বিষয়গুলোই প্রবল সামাজিক সমস্যার রূপ লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত মাদকাসক্তি, ব্যভিচার, অশ্লীলতা, অপরাধ প্রবণতা, যৌতুক, নারী নির্যাতন, শিশুনির্যাতন, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, আত্মহত্যা প্রবণতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম, যুব অসন্তোষ, শ্রম অসন্তোষ, স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়গুলো দেশে দেশে, কালে কালে জটিলতর সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিছু কিছু সমস্যা মানব জাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সাধারণ অস্তিত্বের জন্য হুমকি তৈরী করে।

এ সকল সমস্যা সনাক্তকরণ এবং সমাধানে সচেতন মানুষ নিজেদের স্বার্থেই নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করে। বস্তুত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, গোষ্ঠি প্রভৃতির স্বার্থ সুরক্ষার চিন্তা করে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের সুবিধা সংহত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তি নিজেই সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং তা সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য, মানুষের পক্ষে এ ক্ষেত্রগুলোতে মানবিক ত্রুটি ও স্বার্থান্ধতার কারণে কখনোই নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে নিজেদের অসুবিধা হলে তারা যাকে সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য করেছে অন্যের অসুবিধার ক্ষেত্রে সেটিকে আর তেমনভাবে মূল্যায়ন করেনি।

বস্তুত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা নির্ধারণে সর্বজনীন কোনো নীতিমালা না থাকায় সমস্যার ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতা তৈরি হয়েছে। এর ফলে একটি সত্যিকারের সমস্যা, যা মানবজাতির জন্য প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতিকর, তা গুরুত্ব পাচ্ছে না। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন অনেক বিষয় নিয়ে মানুষ অহেতুক কালক্ষেপণ করছে। কারণ প্রচলিত সমাজে সমস্যার ক্ষেত্রে সামাজিক বা সামষ্টিক শব্দটি ব্যবহার করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা জাতির এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তির সীমানাও অতিক্রম করতে পারে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সামাজিক সমস্যা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

---

১১৬. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা (২) : ১১-১২

১১৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা (২) : ৭

ইসলাম পরিচিতি

বিশ্বে ইসলামই একমাত্র মহান ধর্ম, যার মর্মবাণী হল শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতা। ইসলাম সার্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য ধর্মের নামকরণ সে সব ধর্মের প্রবর্তক, প্রচারক, অনুসারী কিংবা জাতির নামে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম হওয়ার কারণে এর নামকরণ কারও নামে করা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্যের মাধ্যমে শান্তির পথে জীবন পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এর নামকরণ করা হয়েছে ইসলাম। তাই বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ধর্মই বিশিষ্ট নামকরণের অধিকারী।

ইসলাম শব্দটি- سِلْمٌ (সিলমুন) মূলধাতু হতে নির্গত, سِلْمٌ অর্থ 'শান্তি, 'শান্তি স্থাপন' বা 'আত্মসমর্পন'।[১১৮] আর মুসলিম শব্দের অর্থ 'শান্তি স্থাপনকারী' বা 'আত্মসমর্পনকারী'। 'ইসলাম' পরিভাষাটির অর্থ আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা পার্থিব জীবন ও আখিরাতে শান্তির পূর্বশর্ত। আর এ আত্মসমর্পণের প্রতিফল হলো শান্তি । ইসলাম পরিভাষার মূল শব্দ হলো 'সিলমুন' বা 'সিন, লাম, মীম। 'সিন' দ্বারা 'সালামত' বা সুস্থতা, শান্তি, স্বস্তি, শালীনতা ইত্যাদি বোঝায়। 'লাম' দ্বারা 'লিনাত' বা নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য ইত্যাদি বোঝায়। আর 'মীম' দ্বারা বোঝায় 'মহব্বত' বা ভালবাসা, সম্প্রীতি, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি। সুতরাং 'ইসলাম' শব্দের মাঝেই লুকিয়ে আছে শান্তি, স্বস্তি, সুস্থতা, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, নম্রতা, বিনয়, পারস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি ইত্যাদি মানবীয় গুণ, যা মানুষকে প্রকৃত 'মানুষ' হতে শেখায়।[১১৯]

স্রষ্টা ও সৃষ্টি আল্লাহ ও আল্লাহর মাখলুকাতের সাথে শান্তি স্থাপনই ইসলামের মর্মবাণী, ইসলামের অনুসারী মুসলমানের জীবনাদর্শ, কর্ম-প্রেরণা ও গতিশক্তি। আল্লাহ ও আল্লাহর সৃষ্টির সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক স্ফুরণ ঘটে বলে ইসলামকে 'দিনে ফিতরৎ' বা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বলা হয়েছে। শান্তি স্থাপন কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে ইসলামকে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বা মানুষের ধর্ম কেন বলা হয়েছে তা বিশদভাবে বুঝা যাবে।[১২০] ইসলাম মানুষকে শান্তির পথে পরিচালনা করে। ইসলামি বিধি-বিধান মেনে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তিময় জীবন লাভ করতে পারে। এ জন্য ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলা হয়।

ইসলাম বলতে বুঝায় উচ্চতম আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ এভাবে শুধু শান্তি অর্জন করা যায়। শান্তি কথাটিকে বুঝতে হবে প্রচলিত অর্থের চেয়ে এক ব্যাপকতর অর্থে। এ অর্থে শান্তি বলতে বুঝায়, আদর্শের প্রতি পরিপূর্ণ অনুরাগ ও আনুগত্যকে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন বিরোধী প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং এভাবে মানসিক শান্তি অর্জনই জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়। নিজের শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠাও জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য।[১২১]

শান্তিই হল ইসলামের মূলমন্ত্র। কারণ এই শান্তির পথেই ইসলামের উদ্ভব এবং এই শান্তিই এর শেষ ফলশ্রুতি। অতএব, ইসলাম মূলত শান্তির ধর্ম। মানুষকে অধিকতর সহজ সরল পথ প্রদর্শন করা,

---

১১৮. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত* (ঢাকা: খানভী লাইব্রেরী, ২০০৩ খৃ.), পৃ. ৩৯০

১১৯. মোঃ মুখলেসুর রহমান, *সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*, (ঢাকা: এনআরবি গ্রুপ, ২০১১ খৃ.),পৃ. ৭৩

১২০. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, ২০০৯ খৃ.), পৃ. ২৫

১২১. Prof. Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, (Dacca, 1963), P. 24

ইসলামের মূল লক্ষ্য।[১২২] ইসলামের আরেকটি উদ্দেশ্যে হল সর্বশক্তিমান পরমসত্তা আল্লাহর স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সাথে শান্তি স্থাপন করা।

ইসলাম যেমন আল্লাহর সাথে শান্তির কথা বলে, তেমনি তা সমগ্র বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও আগ্রহী। এর অর্থ মানুষ একজন অন্যজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবেনা। ইসলামে শান্তি ভঙ্গকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়। পিতার প্রতি পুত্রের ও পুত্রের প্রতি পিতার, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, ভৃত্যের প্রতি প্রভুর ও প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, একজন মুসলমানের প্রতি আর একজন মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও তা বজায় রাখাই হল এ সকল নির্দেশিত কর্তব্যের মৌলিক উদ্দেশ্য। তাই গবেষক, পণ্ডিত আবুল হাশিম তাঁর "*The Creed of Islam*"গ্রন্থে বলেছেন-

"Islam does not suppress or oppress human nature but fully recognizes the natural demand of the body, mind and intellect and induces harmonious development of all the faculties of man so that the ego might get full satisfaction of natural needs of man without infringing similar rights of other."[১২৩]

উপরিউক্ত বাক্যমালার মূল বক্তব্য হলো- ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দাবিয়ে রাখেনা বা তার উপর জোর যুলুম চালায় না। ইসলাম দেহ, মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে মানুষের যাবতীয় সম্ভাবনার সুসমাঞ্জস্য বিকাশ ঘটাতে চায়, যাতে অন্যের অনুরূপ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করে মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাভাবিক প্রয়োজন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়।

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা

ইসলাম একটি সামাজিক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, ন্যায়-নীতিভিত্তিক শান্তিপূর্ণ সুখী সমাজ গঠনে যেসব উপাদান প্রয়োজন তার সব কিছুর ব্যবস্থা ও সমাবেশ আছে ইসলামে। একটি সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা, প্রেম-প্রীতি, সম্প্রীতি-সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, ন্যায়–নীতি, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সাহায্য ও সহায়তা-এ সব উপাদান ও গুণাবলি অপরিহার্য।

ইসলামের বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, সালাত, সাওম, হজ, জাকাত প্রভৃতিতে উল্লিখিত উপাদানগুলো পুরোমাত্রায় শুধু বিদ্যমানই নয়; বরং সেগুলোর পরিচর্যা, অনুশীলন ও বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা আছে। সালাতের মাধ্যমে নিয়ম-শৃঙ্খলা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলির শিক্ষা ও অনুশীলন হয়ে থাকে। জামাআতে নামায আদায়ে গুণাবলির পরিপূর্ণ পরিচর্যা হয় বলে জামাআতে নামাযের গুরুত্ব বেশি।

সাওমের মাধ্যমে যেমন আত্মার পরিশুদ্ধি হয়, তেমনি সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সম্প্রীতি, পারস্পরিক। দায়িত্ববোধ ইত্যাদি সদগুণাবলির পরিচর্যা ও অনুশীলন হয়ে থাকে। জাকাত মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সেতু বন্ধন সৃষ্টি করে, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। হজের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপকতর আন্তর্জাতিকতার বিকাশ ঘটে, বিশ্ব ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৪]

---

১২২. অধ্যাপক কে আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, (ঢাকা: আলী পাবলিকেসন্স, ১৯৭৯ খৃ.), পৃ. ৫

১২৩. Abul Hashim, *The Creed of Islam or the revolutionary Character of Kalima,*(Dhaka, *Islamic Foundation Bangladesh* 1985), p. 24

১২৪. এ. বি. এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা,* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, জুন ২০১৯),পৃ. ১৩৩

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও শোচনীয়। বহু বিবাহ, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া খেলা, অত্যাচার, অনাচার, লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন খারাবি ইত্যাদি ছিল তখনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। যৌন নৈতিকতার মান এতই স্থূল ও নিম্ন ছিল যে, আরবরা সত ও সৎ ছেলের এমনকি ভাই ও বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক অনুমোদন করত। শিশু হত্যা, নারী নির্যাতন, গোত্র-কলহ, পাপাচার ও কুসংস্কারে গোটা বিশ্ব বিশেষ করে আরব সমাজ আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। আইন শৃঙ্খলার অভাবে অরাজকতা, কলহ-বিবাদ, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে সমাজ জীবন কলুষিত ও অভিশপ্ত ছিল। মদ, নারী ও যুদ্ধ-এ তিনটি জিনিসকে কেন্দ্র করে আরবদের সমাজ জীবন গড়ে উঠেছিল। নীতিবোধ ও মানবতার অবর্তমানে আরবের সমাজ ব্যবস্থা অধঃপতনের চরম পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। নারী জাতির কোনো অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের কোনোই অধিকার ছিল না। পিতামাতা নিজেদের মান-মর্যাদা রক্ষার জন্য কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দিত। তখনকার দিনে দাসপ্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। পশুর মতো মানুষও বাজারে বিক্রয় হতো। "হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর আবির্ভাবের আগে আরবদের নৈতিক ও বৈষয়িক অবস্থা ছিল যীশু খৃস্টের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় অবস্থার চেয়েও খারাপ। অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের অক্টোপাশে আবদ্ধ আরবের সাধারণ জনতা তখন আর্তনাদ করছিল এবং একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষায় ছিল। আর সেই ত্রাণকর্তাকেই তারা খুঁজে পেল মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সুমহান ব্যক্তিত্বে।"[১২৫]

এমনি এক মহা দুর্যোগময় যুগ সন্ধিক্ষণে রাহমাতুল্লিল আলামীন সমগ্র সৃষ্টির রহমতস্বরূপ বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব হলো। বিশ্বনবি (স) আল্লাহর কালাম আল-কুরআনের আলোকবর্তিকা দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করতে এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করতে আত্মনিয়োগ করলেন।

কুরআনুল কারীম বজ্র নিনাদে ঘোষণা করল,

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অবশ্যই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা থেকে দূরে থেকো তাহলে তোমরা সফল হবে।"[১২৬]

সমাজ থেকে মদ্যপান ও জুয়ার অভিশাপ দূর হলো। ব্যভিচারের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কুরআন মজিদে এরশাদ হলো,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, কারণ এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং অকল্যাণের প্রশস্ত পথ।"[১২৭]

১. গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে সামান্য কারণে গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ লেগে যেত এবং তা দীর্ঘকাল যাবৎ স্থায়ী হতো। ওকায মেলায় জুয়া খেলা ও ঘোড় দৌড় এবং কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায় সমর নামে পরিচিত। মহানবি (স.) যুদ্ধের ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা তার কোমল হৃদয়ে ভীষণ সাড়া জাগিয়েছিল। তিনি সমমনা, শান্তিপ্রিয় বন্ধুদেরকে নিয়ে একটি সেবা সংঘ গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধ করা, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করা, সবলদের অত্যাচার থেকে দুর্বলদের রক্ষা করা, আর্তমানবতার সেবা। রাসূলুল্লাহ (স.) নিজে বলেছেন,

---

১২৫. Prof. Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Ibid, P. 20

১২৬. আল-কুরআন, মায়েদা (৫) : ৯০

১২৭. আল-কুরাআন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

(لِيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهُ)

"প্রতিটি লোকের উচিত তার ভাইকে সাহায্য করা, সে জালিম হোক বা মাজলুম আর যদি সে অত্যাচারী হয় তাহলে তাকে প্রতিহত কর।"[১২৮]

২. দাস প্রথার উচ্ছেদ

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে দাস প্রথা চালু ছিল। পশুর মতো হাটে-বাজাওে মানুষ বিক্রয় হতো। তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। মালিকগণ খেয়াল-খুশিমত তাদের ওপর অত্যাচার করতো।

মহানবি (স.) তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, "দাসকে মুক্তিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।" তিনি নিজে অনেক দাস-দাসী মুক্ত করেছিলেন। তিনি কৃতদাস যায়েদকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁকে সেনাপতির পদমর্যাদাও দান করেছিলেন। তিনি হাবসী কৃতদাস হযরত বিলালকে মুক্ত করিয়ে মদিনা মসজিদের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। তিনি সালমান ফারসীসহ আরও অনেক কৃতদাস মুক্ত করেছিলেন।

৩. নারীর মর্যাদা

প্রাক-ইসলামি যুগে নারীদের কোনো অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। বিবাহের আগে পিতার গৃহে বাঁদীর মতো কাজ করতো। পিতা কন্যাদেরকে বিক্রয়ও করতে পারতো। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অধিকার ছিল না। বিবাহের পর স্বামীর ঘরেও তারা বাঁদীর মতো গণ্য হতো এবং আসলে তারা অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবেই গণ্য ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোনো অংশ তো ছিলই না, বরং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো পুত্রদের মধ্যে বণ্টিত হতো। মহানবি (স.) সর্বপ্রথম নারী জাতিকে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন।

তিনি বলেন-

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهَاتِ "জান্নাত জননীর পদতলে।"[১২৯]

হাদিস শরিফে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার উত্তম সাহচর্যের সর্বাধিক অধিকারী কে?" এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করায় রসূল (স) তিন বারই উত্তর দিলেন, "তোমার মাতা" এবং চতুর্থবার বললেন, "তোমার পিতা"। এতে বোঝা যায় নারীর মর্যাদা অগ্রণী।

নারীদের অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যেমন ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের তদ্রূপঅধিকার রয়েছে।"[১৩০]

বিদায় হজের অমর ভাষণেও হযরত মুহাম্মদ (স) নারীদের অধিকার ঘোষণা করেছেন। তিনি এও বলেছেন,

أَطْعِمُوْهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْسُوْهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُوْنَ

"তোমরা যা আহার করবে, তাদেরকেও তা থেকে আহার করাবে। তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা থেকে পরাবে।"[১৩১]

নারীদের অধিকার সম্বন্ধে কুরআন মজিদে 'আন-নিসা' নামক একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

---

১২৮. ইমাম দারেমী, *আস-সুনান*, (সৌদি আরব: দারুল মুগনী, প্রথম সংস্করণ, ২০০০,) খ. ৩, পৃ. ১৮১২, হাদিস নং- ২৭৯৫

১২৯. শিহাবুদ্দীন কাযাঈ, *আল-মুসনাদ*, (বৈরূত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬), খ.১, পৃ. ১০২, হাদিস নং- ১১৯

১৩০. আল-কুরআন, সূরা বাকারা (২) : ২২৮

১৩১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ), খ. ২, পৃ. ২৪৫, হাদিস নং- ২১৪৪

৪. শিশু হত্যা প্রতিরোধ

প্রাক-ইসলামি যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা পিতা-মাতার জন্য ছিল অপমানকর। এ অপমানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরিদ্র পিতামাতা তাদের শিশু কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। রাসূলুল্লাহ (স) আরব সমাজ থেকে এ জঘন্য প্রথা বন্ধ করেন এবং তাদেরকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"আর দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না, আমি তাদের এবং তোমাদের আহার দান করি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।"[১৩২]

ইয়াতীম মিসকিনদের অধিকার দান ও ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব সমাজে ইয়াতীম-মিসকিনদের কোনো অধিকার ছিল না। আরবরা ইয়াতীমদের সম্পদ লুণ্ঠন ও আত্মসাৎ করতো। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। মহানবি (স.) নিজে ইয়াতীম-মিসকিনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন এবং অন্যদেরও সুন্দর ব্যবহার করতে উপদেশ দিতেন।

রসূল (স) বলেছেন,

«خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ»

"মুসলমানদের মধ্যে ঐ ঘর উত্তম যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদাচার করা হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐ ঘর নিকৃষ্ট যে ঘরে ইয়াতীম রয়েছে আর তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়।"[১৩৩]

৫. প্রতিবেশীর অধিকার

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবগণ নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তারা পাড়া প্রতিবেশীর খবর নিত না এবং তাদের বিপদ-আপদে এগিয়ে আসত না। এ মর্মে রাসূল (স.) বলেন,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الذِيْ يَشْبَعُ، وَجَارُهُ جَائِعٌ،

"যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়।"[১৩৪]

প্রতিবেশীর প্রতি অনিষ্ট থেকে সাবধান করে মহানবি (স) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

"যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ তাকে রক্ষা পায় না সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"[১৩৫]

৬. স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি দূরীকরণ

আরব সমাজে নানা ধরনের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি জেঁকে বসেছিল। একই অপরাধ অপর লোক করলে এক ধরনের বিচার হতো আর আপন লোক করলে অন্যরকম বিচার হতো। রসুল (স) এ স্বজনপ্রীতি বাতিল করে ঘোষণা করলেন,

وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

"আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদেও কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করত তাহলেও তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।"[১৩৬]

---

১৩২. আল-কুরআন, সূরা আন'আম (৬) : ১৫

১৩৩. ইব্‌ন মাজাহ, *আস-সুনান*, দারু ইইয়িয়ালি কুতুবিল আরবী, খ. ২, পৃ. ১২১৩, হাদিস নং- ৩৬৭৯

১৩৪. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (কাহেরা: মাকতাবাতু ইব্‌ন তায়মিয়া, দ্বিতীয় সংস্করণ) খ. ১২, পৃ. ১৫৪, হাদিস নং- ১২৭৪১

১৩৫. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৪, হাদিস নং- ৮৮৫৫

৭. বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়োকনিষ্ঠদের অধিকার

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব সমাজে বয়োকনিষ্ঠগণ বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতো না, আবার বয়োজ্যেষ্ঠগণ বয়োকনিষ্ঠদেরকে স্নেহ করতো না। রসূলুল্লাহ (স) সমাজের ছোট-বড় সবাইকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের (মুসলিম) সমাজভুক্ত নয়।"[১৩৭] তিনি নিজে বড়দের শ্রদ্ধা করতেন এবং ছোটদের স্নেহ করতেন।

৮. কৌলিন্য প্রথার উচ্ছেদ

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব সমাজে কৌলিন্য প্রথা অত্যন্ত প্রকট ছিল। কুলীন সম্প্রদায় জন্মগতভাবে বংশ পরম্পরায় কৌলিন্যের উত্তরাধিকারী হতো। যদিও তারা বাস্তবজীবনে জঘন্য মানসিকতা ও নিকৃষ্ট চরিত্রের হতো। সমাজে কুলীন সম্প্রদায় সব রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করত আর সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত হতো। মহানবি (স) এই মানবতা বিরোধী প্রথার মূল উৎপাটনের জন্য ঘোষণা করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلاَنِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ،

"হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলী যুগের আচরণ এবং বাপ-দাদার ওপর গর্ব করার প্রথা বাতিল করে দিয়েছেন। এখন এ পৃথিবীতে দু ধরনের লোক বাস করবে-(১) আল্লাহ ভীরু সৎকর্মশীল যিনি আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত, (২) পাপাচারী দুর্ভাগা লোক যে আল্লাহ্‌র কাছে অপদস্থ। সব মানুষ এক আদমের সন্তান, আর আদমকে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।"[১৩৮] প্রকৃতপক্ষে মহানবি (স) অনারবদের ওপর আরবদের, অকুরায়েশদের ওপর কুরায়েশদের এমনিভাবে যত রকমের মিথ্যা কৌলিন্য প্রথা চালু ছিল সে সব কিছুর মূল উৎপাটন করেন।

মর্যাদার মানদণ্ড নির্ধারণ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে।"[১৩৯]

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় যাজক শ্রেণী নেই, নেই কোনো ইতর ভদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য। সকলেই আল্লাহর বান্দা, সকলেই শান্তি স্থাপনকারী। সকলেই এই শান্তির পতাকাতলে বিনয় মস্তকে দণ্ডায়মান। এহেন শ্রেণীহীন সমাজই মুসলমানী সমাজ- এর নজির ইতিহাসের অন্য কোথাও মিলবে না।[১৪০]

মহানবি (স) সমাজ থেকে সব রকমের সমস্যা- কলুষতা, অশ্লীলতা, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দূরীভূত করে এক শান্তিপূর্ণ কল্যাণধর্মী আদর্শ সমাজ গঠন করেন।

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে বুঝা দরকার। যথা-

ক. আল্লাহই মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা।

---

১৩৬. ইমাম দারেমী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৪৮২, হাদিস নং- ২৩৪৮

১৩৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ৩৪৫, হাদিস নং- ৬৭৩৩

১৩৮. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪২, হাদিস নং- ৩২৭০

১৩৯. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১৩

১৪০. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, ২০০৯),পৃ.৩৮

খ. সমাজ ও সমাজের সবকিছুরও একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা তিনিই।

গ. মহান আল্লাহই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণ এবং উদার।

ঘ. তাঁর প্রণীত সমাজ পরিচালনার মূলনীতি ও সকল বিধি-বিধান বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত।

ঙ. ইসলামে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনা করা হয়।

চ. ইসলামের সকল বিধি-বিধান সর্বজনীন, শাশ্বত এবং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর।

ছ. ইসলামের আগমনের উদ্দেশ্যই হলো সামাজিক সমস্যা দূরীভূত করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

জ. ইসলামে সামাজিক সমস্যা আপেক্ষিক নয়; বরং নির্ধারিত। প্রাগুক্ত

ঝ. ইসলামের পরশেই অন্ধকারের যুগ আলোর যুগে, অন্ধকারের সমাজ আলোর সমাজে এবং অন্ধকারের মানুষগুলো আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিলো।

এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে দৃষ্টিপাত করি-

সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণে ইসলাম স্বীয় সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণকামী রূপ প্রকাশ করেছে। ইসলামে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর স্বার্থ নয় বরং সমগ্র মানবজাতির সার্বিক স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনায় যেটিকে সমস্যা হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন মহান আল্লাহ সেটিকে সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর সকলের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বলে তাঁর পক্ষেই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ন্যায়পরায়ণ এবং উদার থেকে সমস্যা চিহ্নিত করা সম্ভব। তিনি নির্ধারণ করে দেয়ার পর পৃথিবীর আর কোনো মুসলিম তাকে অস্বীকার করতে পারেনি বা তিনি যেমন গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বও দিতে পারেনি।

যেমন ইসলামে যে কোন প্রকারের অশ্লীলতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য। পৃথিবীর সকল মানুষও যদি এর বিপক্ষে চলে যায় তাতে এ নিষিদ্ধতা ও সমস্যা হওয়ার বিষয়টি বদলে যাবে না। বরং এই নিষিদ্ধতা ও সমস্যা হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর কালামের মতই চিরন্তন বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা কোন সামাজিক সমস্যা নয়; উপরন্তু অনেক মুসলিম দেশেও এখন অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সমস্যা মনে করা হয় না। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত ও বুদ্ধি সংকীর্ণ। তাই মানুষ বুঝতে পারে না কিংবা সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগের উত্তেজনার কারণে বুঝতে চায়না। কিন্তু বাস্তবতা হলো অশ্লীলতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা মানবীয় নৈতিকতা, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই প্রচলিত বিশ্বাস ও চিন্তাধারা অনুসারে যাকে সমস্যা মনে করা হয়, ইসলামে তা সমস্যা নাও হতে পারে। আবার ইসলামে এমন অনেক বিষয়কেই সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে প্রচলিত মতবাদ ও জীবন দর্শনে যাকে সমস্যা মনে করা হয়নি। তাই সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নির্ধারণে ইসলামের সাথে অন্যদের এই ভিন্নতার কারণ নীতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য।

যে সকল সমস্যার কারণে সমাজের অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং মানুষের সামাজিক জীবন যাপন বিপর্যস্ত হয় ইসলামে সে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে ইসলামের নীতিগত দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমাজের লোকেরা যদি ক্ষতিকর না ভাবে বা সকলেই যদি বিষয়টিকে গ্রহণ করে তাহলে তাকে সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য করা হয় না।

উদাহরণস্বরূপ পর্দাহীনতার কথা বলা যায়। শুধু অমুসলিম দেশ নয়, বাংলাদেশসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশে এটি এখন কোন সামাজিক সমস্যা নয়; বরং পর্দা করাকে প্রগতির অন্তরায় বলা হয়। অথচ পর্দাহীনতার কারণেই ইভটিজিং, ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এখন অনেক সমাজের লোকেরা আইনগতভাবে এর স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে এবং সামাজিকভাবে এর প্রচলন বহাল রেখেছে, তাই এটি বর্তমানে সমাজে সমস্যা হিসেবে গণ্য হচ্ছে না।

অথবা মাদক দ্রব্য গ্রহণের কথাও বলা যায়। পশ্চিমা বিশ্বেও সকল দেশে আঠারো বছর বয়স থেকে যে কোনো নারী বা পুরুষ মদ পান করতে পারে। দেশগুলোর সকল আঠারো বছরোর্ধ্ব নাগরিকরা মদ পান ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এটা দেশগুলোর সামাজিক সমস্যার মধ্যে গণ্য নয়। কেননা তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। একইভাবে দেশগুলোর অনৈতিকতা, ব্যভিচারিতা, বিবাহপূর্ব দাম্পত্য জীবনযাপন, মাতাপিতার প্রতি দাত্বিপালন না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হয় না। সমকামিতার মত জঘন্য আচরণও দেশগুলোতে সাংবিধানিকভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর কারণ হলো, দেশগুলোর নীতি-নির্ধারকগণ এবং অধিকাংশ মানুষ এতে কোনো ক্ষতি দেখতে পাননি। তাই এগুলো সেখানে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য নয়। বাস্তবে এগুলো ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। দেশগুলোর ভোগবাদী নেতৃত্ব আর নীতিহীন মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্য এই নীতি গ্রহণ করে প্রতিদিনই এর ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করছে। নানা রকম দূরারোগ্য ব্যাধি, হতাশা, বিবাহ বিচ্ছেদ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি মাধ্যমে সমস্যার নানা বিচ্ছিন্ন পরিণতি নির্মমভাবেই পাচ্ছে তারা। কিন্তু ভোগে ও লোভের পণ্যে হ্রাস ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা সমস্যাগুলোর ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকছে, যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সমস্যা নির্ধারণের অধিকার মানুষকে দেয়ার কারণেই মূলত এ অবস্থা হয়েছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত অসংখ্য সংবাদ পশ্চিমা বিশ্বেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় অন্তহীন অশান্তির যে চিত্র তুলে ধরে তা সর্বান্তকরণে উল্লিখিত বক্তব্যই সমর্থন করে।[১৪১]

মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষত বাংলাদেশেও সামাজিক সমস্যা নির্ধারণে দৃষ্টিভঙ্গিগত বিপর্যয় দেশগুলোর ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে দারুনভাবে বিধ্বস্ত করেছে। যেমন বাংলাদেশে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে থার্টি ফাস্ট নাইট, ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন করা হয়। এ দিন উপলক্ষ্যে কনসার্ট হয়, নামিদামি হোটেল-রেস্তরা-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো আকর্ষণীয় নানা প্যাকেজ অফার করে। এর পাশাপাশি বাংঙ্গালী সংস্কৃতির নামে পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন ইত্যাদি দিবসগুলো অশ্লীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হচ্ছে। এই দিন প্রেমিক-প্রেমিকারা সঙ্গীকে নিয়ে একান্তে এ সকল আয়োজনে অংশ নেবে এটি সামাজিকভাবে আমরা মেনে নিয়েছি। অথচ মুসলিম হিসেবে এ ধারার কোনো প্রেমের স্বীকৃতি দেয়া যায় না। কারণ ইসলামে নর-নারীর বিবাহপূর্ব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে এভাবে নিবীড়ভাবে সময় কাটানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ বাংলাদেশে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং প্রতিবছর এর ব্যাপ্তি বেড়ে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

ইসলামে কোনটি সামাজিক সমস্যা আর কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়, তা নির্ধারণের অধিকার মানুষের নয়। কেননা পৃথিবীর এমন একটি সমস্যাও নেই, যেটি পুরোপুরি সমস্যা এবং যার মাধ্যমে কোনো না কোনো মানুষ কিছু না কিছু উপকার লাভ না করেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি সমস্যার ব্যাপারটি নির্ধারণ করতে যায়, তা আপেক্ষিক বিষয় হয়ে পড়বে। যেমন যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। কিন্তু যৌতুক গ্রহণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে যৌতুক কোনো সমস্যা নয়। বরং এটা হলো তার আয়-রোজগারের বা স্বামী-স্ত্রীর সংসার চালানোর সহায়ক। এখন যৌতুক গ্রহণকারীর সংখ্যা যদি বেশি হয় অথবা সমাজিক নীতি

১৪১. হুমায়ূন আহমেদ, হোটেল গ্রেভার ইন ও মে ফ্লাওয়ার, (ঢাকা: কাকলি প্রকাশনা, ২০০৬ খৃ.), পৃ. ৩৪

নির্ধারকদের মধ্যে যদি যৌতুক গ্রহণকারী থাকেন, তাহলে তিনি কিন্তু যৌতুক গ্রহণকে সমাজিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করবেন না। সমাজে ঘুষ গ্রহণেরও একই অবস্থা। এভাবে মানুষ যখন সমস্যা নির্ধারণ করে তখন তার পক্ষে পুরোপুরি নিরপেক্ষ, উদার ও সর্বজনীন কল্যাণ চিন্তা করা সম্ভব হয় না।

ইসলামে কোন আচরণটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য হবে এবং কোনটি হবে না তা আল্লাহই ঠিক করে দিয়েছেন। ফলে পৃথিবীর সকল মানুষও যদি কোনো আচরণ সমর্থন করে এবং সেটিকে সমস্যা মনে না করে কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি সেটিকে সমস্যা ঘোষণা করে থাকেন, তাহলে সেটা সমস্যা। যেমন এর আগে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের লোকদের সামাজিকভাবে মাদক দ্রব্য গ্রহণ ও সেবনের কথা বলেছি। তারা একে সমস্যা মনে করুক অথবা না করুক ইসলামে এটি অবশ্যই একটি ভয়ানক পাপ এবং ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা। কেননা এটাকে সমস্যা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর অবশ্যই শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভূক্ত। তাই তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে কল্যাণ লাভ করবে। শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দিতে চায়। তাও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত হবে না?"[১৪২]

তাই মহান আল্লাহই যে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যে সকল সমস্যার সমাধান মহানবি (স.) সামাজিকভাবে সম্পন্ন করেছেন সেগুলোকে সমাজিক সমস্যা বলা যায়। অন্যদিকে তিনি যেগুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি, সেগুলো কখনোই কোন সমস্যাই নয়। এ ক্ষেত্রে মুমিনদের সুদৃঢ় প্রত্যয় থাকা আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ মানুষের জন্য অসুবিধার কারণজনিত কোনো বিষয়কে যেমন পালনীয় করেননি তেমনি মানুষের জন্য কল্যাণকর কোনো বিষয় থেকে তাদেরকে বঞ্চিতও করেননি। তিনি যে নিষিদ্ধতা দিয়েছেন, মানুষ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা না হোক, তাতে যে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অকল্যাণ আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার তিনি যেগুলোর বৈধতা দিয়েছেন তাতে মানুষের কল্যাণ থাকার বিষয়টি অবিসংবাদিত। এ বিশ্বাস ও আস্থা ছাড়া মুমিনের ঈমান পূর্ণতা পায় না। সামাজিক সমস্যা নিরূপণের ক্ষেত্রেও এর পরিপূর্ণ প্রকাশ অনিবার্য। এ প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা ও বাংলাদেশ

সমাজ ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; কেননা এমন কোন সমাজ নেই যেখানে সামাজিক সমস্যা নেই। সমাজের জটিল প্রকৃতিই অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। সামাজিক সমস্যা তাই প্রকৃতিগতভাবেই সামাজিক এবং এর সাথে নৈতিক, ধর্মীয়,

১৪২. আল-কুরআন, সূরা মায়েদা (৫) : ৯০-৯১

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক, মনোস্তাত্বিক প্রভৃতি বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান। সামাজিক সমস্যা সার্বজনীন। স্থান-কাল ভেদে সামাজিক সমস্যার ভিন্নতা থাকলেও পৃথিবীর সকল সমাজ এবং সমাজ ইতিহাসের সকল পর্যায়েই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সামাজিক সমস্যার সার্বজনীনতা থাকলেও সামাজিক সমস্যার শ্রেণী বিভাগের বেলায় সার্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায় না।[১৪৩]
সমাজব্যবস্থার গঠন-প্রকৃতি ও কার্যধারা, সামাজিক পরিবর্তন প্রবাহ ও এর বিভিন্ন মাত্রা এবং সমাজবাসী মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ-দৃষ্টিভঙ্গি তারতম্যপূর্ণ হওয়ায় সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ-প্রকৃতি বৈচিত্রধর্মী হয়। এরূপ বৈচিত্রের মধ্যে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দেশে মুখ্যভাবে যে সব অস্বস্তিকর অবস্থা সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অশ্লীলতা, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অনৈতিক সম্পর্ক, যিনা-ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি, দারিদ্র্য, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, বস্তি ও শহুরে সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি, দুঃস্থতা ও নির্ভরশীলতা, যৌতুক প্রথা, , শিশুশ্রম, লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনা, দুর্নীতি ইত্যাদি।

সমাজ বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় সাধারণত উপরে বর্ণিত সমস্যার মধ্যে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, আত্মহত্যা ইত্যাদিকে বিচ্যুত আচরণ হিসাবে আলোচনা করা হয়। বিচ্যুত আচরণ হিসেবে মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, অশ্লীলতা, ইভটিজিং, যৌতুক প্রথা ও নারী নির্যাতন, লিঙ্গ বৈষম্য ও বঞ্চনা এবং পতিতাবৃত্তির ব্যাখ্যা হওয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এর সাথে মনো-সামাজিক, জৈবিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া সামাজিক অস্বস্তির বহুমাত্রিকতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। সেজন্য এগুলো বিচ্যুত আচরণের গণ্ডির বাইরে আলোচিত হতে পারে। অন্যদিকে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বস্তি ও শহুরে সমস্যা এবং শিশু শ্রম মুখ্যত সমাজ কাঠামোগত পরিস্থিতি হিসাবে অনুধ্যানের আবশ্যকতা দাবি করে। সে প্রেক্ষিতে এসব সমস্যাগুলোও বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে পারে। সামাজিক সমস্যা আলোচনার ধারাক্রম যেভাবেই বিন্যস্ত করা হোক না কেনো, সকল ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ বাংলাদেশে মুখ্য সমস্যা হিসেবে বিশ্লেষিত হতে পারে।[১৪৪]

সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি

সমাজ বিজ্ঞানে সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধিরও আলোচনা করা হয়। কিছু বিষয় সামাজিক সমস্যার মত মনে হলেও মূলত সেগুলো সামাজিক ব্যাধি। "সামাজিক ব্যাধি বলতে সমাজের নেতিবাচক ও রুগ্ন অবস্থাকে বুঝায়। সমাজের যেসব উপাদান বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং এজন্য সমাজস্থ মানুষ কষ্টভোগ করে তাকে সামাজিক ব্যাধি বলা হয়।"[১৪৫]
সামাজিক ব্যাধি বলতে মূলত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার এমন একটা রুগ্ন অবস্থাকে নির্দেশ করে, যে অবস্থায় সমাজের ক্রমোন্নতি বন্ধ হয়ে ক্রমেই অধঃপতিত সমাজের দিকে ধাবিত হয়।[১৪৬] সমাজ ব্যবস্থা মূলত: অনেকগুলো সাধারণ উপাদানের সমন্বয়। যেমন- মানুষ পরিবেশ, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত ইত্যাদি। সাধারণ ভাষায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্যমান উপাদানগুলোর মধ্যে যখন সমন্বয়হীনতা বিশৃংখলা ও গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং তার ব্যাপকতা ব্যক্তি

---

১৪৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৪৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: নভেম্বর, ২০০৩ খৃ.), পৃ.১১০

১৪৫. মোঃ শহীদুল্লাহ, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪ খৃ.),পৃ. ১৮

১৪৬. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ব্যবস্থার উপর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তখনই সে সমস্যাটিকে সামাজিক ব্যাধি হিসাবে রূপায়িত করা হয়।

Social Evil is the anything detrimental to a society or its citizens, as alcoholism, organized crime, etc. অর্থাৎ মদ্যপান, সংগঠিত অপরাধ ইত্যাদি সমাজ বা তার নাগরিকদের জন্য ক্ষতিকর যেকোনো জিনিস সামাজিক ব্যাধি।[১৪৭]

সামাজিক ব্যাধিকে বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। কতিপয় সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক ব্যাধিকে মানুষের দেহের সাথে তুলনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মানুষের দেহের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অবস্থা যদি বজায় না থাকে তাহলে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। মানব দেহের স্বাভাবিক অবস্থার সাথে তার কার্যসম্পর্ক জড়িত থাকে সেটা মানবিক বা শারীরিক উভয় দিক থেকে হতে পারে।

মানুষ যখন কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তখন সে কর্মশক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দুর্বলতার জন্য কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। তেমনি সমাজ দেহকে মানব দেহের সাথে তুলনা করা চলে। সমাজের বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো অপরাধ, অত্যাচার ও অবিচার, সৃষ্টি হয় পরস্পরের সাথে পরস্পরের দ্বন্দ্ব; হিংসা ও দ্বেষ। এর ফলে নষ্ট হয় সমাজের সংহতি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঝগড়া-ঝাটি কলহ ইত্যাদি সমাজের অন্যতম দৈনন্দিন বৈশিষ্ট্য হিসেবে ফুটে উঠে।[১৪৮]

কতিপয় সমাজ বিজ্ঞানী সামাজিক ব্যাধিকে সংজ্ঞায়িত করে বলেন, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অসুস্থ প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে সমাজের মধ্যে ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। যেমন- অনাচার, বিশৃংখলা, আত্মকেন্দ্রিকতা, অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি, ব্যভিচার, উন্মত্ততা, চুরি, দুর্নীতি, ঘুষ ইত্যাদি। এসব ব্যাধির ফলে সমাজের নানা রকম অপরাধের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সামাজিক সমস্যা মূলত সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে সৃষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বস্তি সমস্যা, সন্ত্রাস, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, শিশুশ্রম প্রভৃতি। অন্যদিকে মানসিক সমস্যাগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। এই মানসিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে- হতাশা, আত্মহত্যা প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যহীনতা প্রভৃতি।

সমাজে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যাদি বহুবিধ। Harold A. Phelps সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদকে ব্যক্তিগত ও দলীয় অপর্যাপ্ততার (Personal and group deficieney) কারণের ভিত্তিতে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন;[১৪৯] তাই আমরা সামাজিক সমস্যার ব্যাপকতাকে চারটি প্রধান উপাদানে বিভক্ত করতে পারি,

ক. অর্থনৈতিক উপাদান : অর্থনৈতিক উপাদানের আওতায় যে সব সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয় তা হলো- দারিদ্র, বেকারত্ব, পরনির্ভশীলতা, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক, অর্থ পাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাচালানী, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারী, শিশু শ্রম, মজুরি বৈষম্য, ছিনতাই, মানব পাচার প্রভৃতি।

খ. জৈবিক উপাদান : জৈবিক উপাদানের আওতায় যে সব সামাজিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয় তা হলো- সংক্রামক রোগ, অসুস্থতা, প্রাণঘাতি রোগ, বিকলাঙ্গতা, শারিরীক রোগ, দৈহিক ভারসাম্যহীনতা, এইডস/এসটিডি প্রভৃতি।

---

১৪৭. *Collins English Dictionary(online)*, (Penguin Random House LLC and Harper Collins Publishers Ltd. 2019), P. 105

১৪৮. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৫

১৪৯. Harold A. Phelps, *Contemporary Social Problems*, (New York: Prentice Hall, Inc., 1947), P. 47

গ. মনস্তাত্ত্বিক উপাদান : এর মধ্যে রয়েছে- মানসিক সমস্যা, মাসসিক ব্যাধি, বিষণ্নতা, হঠাৎ রেগে যাওয়ার প্রবণতা, অপরাধ প্রবণতা, হতাশা, আত্নহত্যা প্রবণতা, মানসিক বিকৃতি, ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যহীনতা ইত্যাদি।

ঘ. সাংস্কৃতিক উপাদান : বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা ও বৃদ্ধের সমস্যা, কুমারী ও অবৈধ মাতৃত্ব, সাম্পদায়িক দাঙ্গা, নারীর প্রতি সহিংসতা, লিঙ্গ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাগত বৈষম্য, কিশোর অপরাধ, ধর্ষণ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনে আসক্তি, যৌন নির্যাতন, পতিতাবৃত্তি, নৈতিকতাহীনতা, অসুস্থ রাজনীতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যার উদাহরণ।[১৫০]

সামাজিক সমস্যাকে শ্রেণী বিভাগ করার আরও এক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন সমাজ বিজ্ঞানী R.K. Marton। তিনি সামজিক সমস্যাকে বৃহৎ দুটি অংশে ভাগ করেন; ভাগ দুটি হলো (১) সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং (২) বিচ্যুত আচরণ।[১৫১]

১.সামাজিক বিশৃঙ্খলা

সাধারণত সামাজিক বিশৃঙ্খলা বলতে একটি সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ভিতরকার সমন্বয়হীন এক অবস্থাকে বোঝায়। সামাজিক বিশৃঙ্খলাজনিত সামাজিক সমস্যার আওতায় যে বিষয়গুলো রয়েছে তা হল- সন্ত্রাস, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ, শ্রম অসন্তোষ, আবাসন সংকট প্রভৃতি।

২. বিচ্যুত আচরণ

ব্যক্তির যে আচরণটি স্বাভাবিক আচরণ বা অধিকাংশের আচরণ হতে ভিন্নতর তাই হলো বিচ্যুত আচরণ। সামাজিক ও মানসিক চাপ এবং সমাজ জীবনের অতিমাত্রার গতিশীলতা ও প্রতিযোগিতার কারণেই মানুষের মাঝে বিচ্যুত আচরণ প্রকাশ পায় যা থেকে আবার সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্নহত্যা, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, দূর্নীতি, যৌতুক প্রভৃতি বিচ্যুত আচরণের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যার উদাহরণ।

সামাজিক সমস্যা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এ দেশের মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন পরিপূর্ণভাবে না মানার কারণে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়। তেমনি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল[১৫২] দেশ হিসেবেও নানাবিধ সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত। বাংলাদেশের অর্থনীতি পরীক্ষা করে যে কেউ বাড়তি জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করবে। এটিকে এমন একটি সমস্যা হিসেবে মনে করা হয় যা আমাদের সকল উন্নয়নের পথে হুমকিস্বরূপ। এখানে খাদ্য ঘাটতি, আবাসনের ঘাটতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। এখানে ক্ষুধার্ত এবং দুঃস্থ শিশুরা মানব সম্পদে পরিণত হতে এসব কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা সমাজের জন্য সমস্যা হিসেবে পরিণত হচ্ছে।[১৫৩]

বাংলাদেশের সমস্যাসমূহ বহুমাত্রিক। এদেশের বেশিরভাগ সমস্যা মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা হতে সৃষ্ট। সেজন্য বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যগুলো প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক। মাথাপিছু নিম্ন আয় এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে প্রতিকূল

---

১৫০. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬-৯; ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

১৫১. সৈয়দা ফিরোজা বেগম ও অন্যান্য, *সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও বিশ্লেষণ*, (ঢাকা: প্রফেসর'স প্রকাশন, ১৯৯৯),পৃ. ২৮

১৫২. সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে সমস্ত দেশ একসময় কোনো না কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিলো এবং এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে অনুন্নত, সে-সমস্ত দেশকেই উন্নত বিশ্বেও রাজনীতিবিদ-অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নশীল দেশ (Developing Countries) বলে অভিহিত করেন। এই দেশসমূহকে কেউ কেউ বলেন স্বল্পোন্নত দেশসমূহ (Less Developing Countries-LDC) আবার কেউ কেউ বলেন অনুন্নত দেশসমূহ (Undeveloping Countries)। হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, পৃ.৯৫-৯৬

১৫৩. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

অবস্থার শিকার হচ্ছে। ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থানের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার স্থায়ী কারণরূপে বিরাজ করছে।[১৫৪]

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা প্রকৃতিগতভাবে অর্থকেন্দ্রিক হলেও শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকটতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়ন ও শিল্পায়নজনিত সামাজিক পরিবর্তন ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতার ফলে হাতাশা, ব্যর্থতা, ভূমিকার দ্বন্দ, মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রভৃতি সমস্যার প্রকটতা বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে সামাজিক শ্রেণী এবং স্তর বিন্যাসের প্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের । যেমন উচ্চ শ্রেণীতে সাংস্কৃতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার প্রকটতা অধিক। কিন্তু নিম্ন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাগুলো প্রধানত মৌল চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাজনিত কারণে সৃষ্ট। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দারিদ্র্য ও জনসংখ্যাস্ফীতিকে বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে দারিদ্র্য হলো এ দেশের প্রধান সমস্যা।[১৫৫]

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পর্যবেক্ষণ এবং নানা গবেষণার ফল হিসেবে বাংলাদেশের সমাজে যে সমস্যাগুলো প্রায় অবিসংবাদিতভাবে সনাক্ত করা হয় সেগুলো হলো: অজ্ঞতা, অপরাধ, অবিচার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে পাচার, অলসতা, আত্মসাৎ, আত্মহত্যা, আরামপ্রিয়তা, এইচ.আই.ভি. ও এইড্স, কর্মবিমুখতা, কিশোর অপরাধ, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চুরি, ছিনতাই, জনসংখ্যার আধিক্য, জুয়া, ডাকাতি, দলবাজি, দারিদ্র্য, দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি, দুঃস্থতা ও নির্ভরশীলতা, ধূমপান, নারী নির্যাতন, নিরক্ষরতা, নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, ইভটিজিং, মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা স্বাক্ষ্য, পতিতাবৃত্তি, পুষ্টিহীনতা, প্রবীণ সমস্যা, বস্তি, বাসস্থান সমস্যা, বিশৃঙ্খলা, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, ভূমিকা ও মর্যাদার অসঙ্গতি, মাদকাসক্তি, যুব অসন্তোষ, যৌতুক প্রথা, শহুরে সমস্যা, শিশু শ্রম, শ্রমিক অসন্তোষ, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থান্ধতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সুদ এবং হত্যা।[১৫৬]

যেকোনো সমাজকে সমস্যামুক্ত করার সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রচেষ্টা সবসময়ই আমাদের চোখে পড়ে। বড় বড় সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম হয়, দেশে-বিদেশের অসংখ্য প্রজ্ঞাবান মানুষ সে সকল সমাবেশে সমস্যা নিরসনের মোক্ষম নানা উপায় বাতলে দেন। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় সমস্যার জায়গাতেই। এর কারণ হলো, সমাজের মানুষের নিকট সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে অব্যর্থ ব্যবস্থা ও মাধ্যম রয়েছে কোনো পক্ষই সে মাধ্যমটি ব্যবহারে আগ্রহী নন। সেই ব্যবস্থাটির নাম ইসলাম।

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমস্যা নির্ধারণে গৃহীত নীতির সাথে অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের নীতি হয়তো মিলবে না কিন্তু মানুষের সমস্যা নিরসনে ইসলাম প্রদত্ত সমাধান তাই বলে মিথ্যে হয়ে যাবে না। বরং কেবল এর সমাধান মেনে নিলেই বিশ্বের সকল মানুষ সমস্যামুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে। উপরে সামাজিক সমস্যার যে দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে আলাদাভাবে তার প্রতিটি সমস্যার সমাধানই ইসলাম দিয়েছে। তবে সমস্যাগুলো একটি আরেকটির পরিপূরক এবং একটি অন্যটি থেকে উৎসারিত বলে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধান এবং সমাজে তা কার্যকর করার উপায় অন্বেষণ করা হয়নি বরং মোটামুটি মৌলিক এবং যে সমস্যাগুলোর সমাধান হলে অন্য সমস্যাগুলোর সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে এমন কিছু সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

---

১৫৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯

১৫৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৯-৫০

১৫৬. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, প্রাগুক্ত,পৃ.২০

তৃতীয় অধ্যায়
নারী ও জৈবিক চাহিদা

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন ধর্মের আবর্তে নারী
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাচীন যুগ ও নারী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক যুগ ও নারী
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার নারী
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিভিন্ন ধর্মের আবর্তে নারী

ধর্মের দৃষ্টিতে নারী

গ্রীক, রোম, আরব, আজম (অ-আরব), ইউরোপ, এশিয়া, সর্বত্র নারী ছিল নির্যাতিতা। তার গোটা ইতিহাস নির্যাতন ও ভোগের ইতিহাস। এমনকি আল্লাহর তরফ থেকে বিভিন্ন যুগে নেক কাজ, শরাফত, সদাচারণ, পবিত্রতা ও নিরপরাধিতা সম্পর্কে যেসব শিক্ষা এসেছে ক্রমান্বয়ে তারও অর্থ দাঁড়িয়েছিল এই যে, নারীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। বরং তার নিকট থেকে দূরে সরে থাকার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ, তার সাথে সম্পর্ক মানুষকে অপরাধ ও গোনাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

কালচক্রের সাথে সাথে এ ধারণা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষও ততটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাকে শয়তানের দালাল এবং পাপের দরজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা তাকওয়ার পরিপন্থী এবং দূরে অবস্থানকে আল্লাহভীতির প্রমাণ মনে করা হয়েছে। এসব ধ্যান-ধারণা নিসন্দেহে নারীর সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করেছে। ফলশ্রুতিতে সমাজে পুরুষের যে মর্যাদা ও সম্মান ছিল, নারী তা লাভ করতে পারেনি। পুরুষের যে অধিকার ছিল নারী তাও পায়নি। তার অবস্থান ছিল এমন পাপী ও অপরাধীর মত যাকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চোখে দেখা হয়।

১.ইহুদী ধর্ম ও নারী

পৃথিবীর যে সব ধর্ম শুধুমাত্র কিছু আকীদা এবং তত্ত্ব পেশ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং পেশকৃত আকীদা ও তত্ত্বের ভিত্তিতে জীবনের বাস্তব সমস্যাদি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে, ইহুদী ধর্ম তারই একটি। এ ধরনের একটি ধর্ম নারী জাতি সম্পর্কে বাস্তববাদী ধ্যান-ধারণা পেশ করবে এরূপ আশা করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধর্ম আমাদের সামনে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম এই যে, পুরুষ সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট এবং ভণ্ড।[১৫৭]

ইহুদী ধর্মমতে নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। এই ধর্মমতে নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং তার কারণেই সকলের ধ্বংস অনিবার্য। কারণ, নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইয়াহুদী সমাজে নারীর কোন মর্যাদা ছিল বলে গণ্য করা হত না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপেই পরিগণিত হত।[১৫৮]

ইহুদী ধর্ম মতে, মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন যাপন করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ) তাঁকে প্রথমে আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ান যা খেতে আল্লাহ্ তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। ফলে তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তার ভাগ্যলিপিতে কায়-ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ? আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই আমি উহা ভোজন করিয়াছি।" এরপর আল্লাহ্ হাওয়াকে বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিব। তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে। সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।"

---

১৫৭. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৮ খৃ.), পৃ. ২৩

১৫৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, (ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৯ খৃ.), পৃ. ৭

অন্য কথায়, হাওয়া (আ) আদম (আ)-কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিলেন, আল্লাহর তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার উপর পুরুষের স্থায়ী কর্তত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত নারীর উপর এ কর্তৃত্ব চালাতেই থাকবে।[১৫৯]

এই দর্শনের ফলশ্রুতিতে ইহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এত বেশি যে, কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করবার সময়ে সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে কোন মানত করে অথবা কোন ব্রতবন্ধনে আপনাকে আবদ্ধ করে এবং তার পিতা যদি তার সেই মানত বা ব্রতের কথা শুনে তাকে তা পালন করতে নিষেধাজ্ঞা করে, তবে তার সে মানত বা ব্রতবন্ধন স্থির থাকবে না তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে তার পিতার নিষেধ কার্যকর হবে এবং সদাপ্রভু সেই যুবতীকে ক্ষমা করবেন না। কারণ তার পিতা তাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে তার অধীনা হয় এবং এ অবস্থায় কোন মানত করে অথবা ওষ্ঠ নির্গত কোন চপল বাক্যে ব্রতের দ্বারা আপন প্রাণ আবদ্ধ করে, অতঃপর স্বামী যদি শুনতে পায় এবং শ্রবণের দিন তাকে কিছু বলে, তবে সেই মানত বা ব্রত স্থির থাকবে। আর যদি শ্রবণের দিন স্বামী তাকে নিষেধ করে তবে ঐ মানত বা ব্রত স্থির থাকবে না। কারণ তার স্বামী তা ব্যর্থ করেছে। আর সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও দিব্য তার স্বামী ইচ্ছা করলে স্থির রাখতেও পারে অথবা উহা ব্যর্থও করে দিতে পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং যৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু মোশিকে এই সকল আজ্ঞা করলেন। ইয়াহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও ছিল না। (ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা)[১৬০]

ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত আদম ও হাওয়ার জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাটি এভাবে পেশ করা হয়েছে,

"তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে। তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম। কারণ আমি উলঙ্গ। তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। ঈশ্বর কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ উহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম তুমি কি তার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই খাইয়াছি। তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, তুমি এ কি করলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"

এর অর্থ এই হয় যে, বেহেশত থেকে বহিষ্কৃত হওয়া আদম তথা মানব জাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ এবং এ অভিশাপের মূল কারণ হচ্ছে নারী-আদমের স্ত্রী। এ জন্যে ইয়াহুদী সমাজে স্ত্রীলোক চির লাঞ্ছিতা, জাতীয় অভিশাপ এবং ধ্বংস ও পতনের কারণ। এ জন্যে পুরুষ সব সময়ই নারীর উপর প্রভুত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারী। এ অধিকার আদমকে হাওয়া বিবি কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর শাস্তিবিশেষ। যতদিন নারী বেঁচে থাকবে, ততদিন এ শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।[১৬১]

ইহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে এটি ছিল না। বাস্তবে এটি ছিল একপ্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ইহাতে খুব বেশী ছিল।[১৬২]

---

১৫৯. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০১০ খৃ.), পৃ. ১৭

১৬০. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪-২৫

১৬১. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৬২. আবদুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত পৃ ৮; Report of the Commission, *Marriages, Divorce and the Church*, (London, 1971), P. 9-10.

সন্তান উৎপাদনই ছিল বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই সন্তান জন্মদান ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের দশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেলেও স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত বা সে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারত। বিবিধ প্রকারের বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক প্রকার ব্যতীত সবগুলিরই বিচ্ছেদ হতে পারত।

বিবাহের পূর্বে কৌমার্য ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা ছিল বিবাহের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকিদ ছিল এবং বিবাহের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে বালিকাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হত।[১৬৩]

বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চীৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি। ধর্ষিতা কুমারী হলে ধর্ষণকারীর সাথে বিবাহই ছিল এর বিধান।[১৬৪]

মাতাপিতা কন্যাদেরকে বিবাহে বাধ্য করত না। কিন্তু তাদেরকে বিবাহ দেওয়া বা কারো নিকট বিক্রয় করে ফেলার আইনসঙ্গত অধিকার পিতার ছিল। বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা, উপপত্নী রাখতে পারত। তাছাড়া অবিবাহিতা দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধা বিবাহিতা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হত না।

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইহুদী সমাজ এরূপ বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করত। স্বামী স্ত্রীকে 'গেট' বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ দিলে ধর্মীয় আইনে বিবাহ অটুট থাকে। সংশোধিত ইয়াহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনর্বিবাহ হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং সে বিবাহের সন্তানগণ বংশানুক্রমে 'মামজের' বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইয়াহুদীদের বিশ্বাস এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে দিয়েছিলেন।[১৬৫]

স্বামীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ করলে সে চিরকালের জন্য সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হত। বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে নারী অপর স্বামী গ্রহণ করতে পারত। স্বামী বহুক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করত। পিতা তার ছেলেমেয়েদেরকে বিক্রয় করতে পারত।[১৬৬]

ইহুদী সমাজে নারী পুরুষ হতে অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। ভাই থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রি করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হত স্বামী।

স্বামীকে অপর মহিলার সাথে শায়িত দেখলে ইয়াহূদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করে চুপ থাকতে হত। কারণ, স্বামীর যা ইচ্ছা, তাই করার অধিকার তার ছিল।[১৬৭] মেয়ে কখনও পিতার সম্পত্তি থেকে মীরাস লাভ করত না। করত কেবল তখন, যখন পিতার কোন পুত্র সন্তানই থাকত না। ইয়াহুদী ধর্মে নারীকে 'পুরুষের প্রতারক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইয়াসরিবের (বর্তমান মদীনা শহর) ফিতুম নামক এক ইয়াহুদী

---

১৬৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১৬৪. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; The Jewish Encyclopedia, Vol. XII. P. 556

১৬৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫), পৃ. ১৯; আল মুসতাশার হাসান হাফনাভী, *মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম*, (আল কাহেরা : দারুল বাশীর), পৃ. ১৫।

১৬৬. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯; Lods, Adolphe : Israel, London 1948, P. 191

১৬৭. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ১৩-১৪; আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

বাদশাহ আইন জারী করেছিল যে, মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হবে, স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে তার সাথে এক রাত্রিযাপন করতে হবে।[১৬৮]

ইয়াহুদীরা নিজ ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে এই অধিকার লাভ করে থাকে যে, যখন তারা ইচ্ছা করবে, ক্ষুদ্রতম অপরাধের কারণেও স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারবে। তারা স্ত্রীদেরকে হায়েয ও নেফাসের সময় অপবিত্র বলে মনে করে। এ সময়ে তারা স্ত্রীদের সাথে উঠা-বসা, কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা, এমনকি তাদের হাতের তৈরী খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করাকেও নিজেদের জন্য জঘন্যতম অপমানজনক কাজ বলে মনে করে থাকে।[১৬৯]

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ, নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[১৭০]

২. খৃস্ট ধর্ম ও নারী

খৃস্টধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর ও নিদারুণ নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত 'পবিত্র' রোম-সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে রেখে তাদেরকে আগুনে পুড়ানো হয়েছে। এতেও নারীজাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি।

নারীকে খৃস্ট ধর্ম যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল তা করেছে। নারী সম্পর্কে এ ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় :

"হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই খোদার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছে।"[১৭১]

ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারীজাতির উপর দোষারোপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অভিহিত করেছেন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন, নারী বলেই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিত।

নারীজাতিকে অতীব হীন ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে খৃস্টধর্মের প্রবল ভূমিকা রয়েছে। খৃস্টধর্মে নারীকে পাপের আদি কারণরূপে আখ্যায়িত করেছে। বাইবেলে পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে, নারীর পাপের দরুণই পুরুষকে তার উপর কর্তৃত্ব করিবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে।

I will greatly multiply your pain in Child-bearing; in pain you shall bring forth Children; yet your desire shall be for your husband, and he shall rule over you.[172]

গর্ভধারণে তোমাদের ব্যাথা আমি অত্যন্ত বৃদ্ধি করে দিব। এই ব্যাথায়ই তোমরা সন্তান প্রসব করবে। এরপরও তোমরা তোমাদের স্বামীর সংসর্গ কামনা করবে এবং সে তোমাদের উপর শাসন করবে।

---

১৬৮. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ৬২; ড. আল্লামা জামাল আল বাদাভী, *ইসলামিক টিচিং কোর্স, ৩য় খণ্ড*, অনু. আবু খালদুন আল মাহমুদ, *ইসলামের সামাজিক বিধান*, (ঢাকা: দি পাইওনিয়ার, ১৯৯৯), পৃ. ৪৯-৫৫

১৬৯. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী সা. এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, (ঢাকা: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫), পৃ ৬৫; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, *ইসলাম আওর আওরাত*, (লাহোর: ইদারায়ে ইসলামিয়া), তা. বি, পৃ ২৩।

১৭০. আবদুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ৮; Donald W. Shaner, *A Christian View of Divorce*,(Leiden, 1969), P. 31.

১৭১. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

১৭২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; Cleugh, James, *Love locked out,* (London 1963), P. 264-265

প্রথম যুগের খৃস্ট ধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এসব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতো। তাই খৃস্টীয় ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশী সম্মানিত। তারা ঘোষণা করে দিলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা, নারীর সৌন্দর্য হলো বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।[১৭৩]

সেন্ট তারতুলীয়ান বলেন, "নারী শয়তানের দ্বার। সে আদমকে বিপথগামী করেছে। সে খোদার আইন ভঙ্গাকারিণী এবং পুরুষের ধ্বংসকারিণী।" সেন্ট ক্রাইমস্টম বলেন, "নারী একটি অনিবার্য পাপ এবং জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা। সমস্ত বর্বর পশুর মধ্যে নারীর মত ক্ষতিকর আর কিছু নাই।" সেন্ট টমাস বলেন, "নারী হচ্ছে বিকৃত পুরুষ।" সেন্ট পল বলেন, "ঈশ্বরের প্রতি নারী যেমন অনুগত থাকবে, তেমনি অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি।" লুথার বলেন, "নারী কখনও নিজের প্রভু নয়। ঈশ্বর তার দেহ তৈরী করেছেন পুরুষের জন্য, সন্তান ধারণ এবং পালনের জন্য। নারীকে সন্তান প্রসব করতে করতে মরতে দাও। এ জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১৭৪]

পাশ্চাত্য জগত খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খৃস্টাব্দে (যখন রাসূল (স.) এর বয়স ১৭ বছরের কাছাকাছি) ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি অমানুষ বলে? অবশেষে স্থির করা হয় যে, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষদের সেবা করা। পাশ্চাত্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই ধারা অব্যাহত থাকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। কেননা এ যুগেও তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় থাকতে হয় এবং নিজের সম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া হাত দিতে পারতো না।

ড. এসপ্রিঙ্গ (Dr. Aspiring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারীজাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

১৫০০ খৃস্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। এটি নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এ আইনের বলে খৃস্টানগণ নব্বই লক্ষ জীবন্ত নারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। খৃস্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত।[১৭৫]

পঞ্চম শতাব্দীতে 'মাকোন একাডেমী' এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, নাকি তার আত্মাও আছে? গবেষণা শেষে একাডেমী সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ হতে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।"[১৭৬]

সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ-এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, Woman has no soul-নারীর কোন আত্মা নাই।

---

১৭৩. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৭৪. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৭৫. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

১৭৬. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৪-১৫

'নারী মানুষ কিনা' এ বিষয় আলোচনার জন্য পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের অপর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত হয়, নারী মানুষ বটে, তবে পুরুষের কল্যাণ ও দাসত্বের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে পুরুষ নারীকে দাসীর ন্যায় রাখত এবং স্বামীকে প্রভু বা ঈশ্বর বলে সম্বোধন করতে হত। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করা হলো, তখনও নারীর মর্যাদা সংরক্ষিত হলো না। ফরাসী নাগরিক আইনে নারী অবিবাহিতা হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হল। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী, শিশু ও পাগল-এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়।[১৭৭]

এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী খৃস্টান জগত নারীজাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে এসেছে।

খৃস্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন-যাহা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে। কিন্তু খৃস্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খৃস্টধর্মের রচয়িতা সেন্ট পল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর একে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না।[১৭৮] বরং তিনি Necessary evil (জরুরী পাপ) হিসাবেই বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন,

It is well for a man not to touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not seek marriage. But if you marry, you do not sin and if a girl marries, she does not sin. Yet those who marry will have worldly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the Lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about worldly affairs, how to please his wife. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.

কোন নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভাল। সে যেমন আছে, সেরূপ থাকাই তার জন্য উত্তম। বিবাহ করতে চেয়ো না। কিন্তু তুমি বিবাহ করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোন বালিকা বিবাহ করলে সেও পাপ করে না। তবে যারা বিবাহ করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাক, এটিই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাজে উদ্বিগ্ন, কিভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিভাবে তাঁর স্ত্রীকে সন্তুষ্টি করবে। আমি তোমার নিজ কল্যাণের জন্যই এ উপদেশ দিচ্ছি, তোমার উপর কোন বাধা আরোপের জন্য নয়; বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এটি বলছি।

যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না; সেই উত্তম কাজ করে। খৃস্টান বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতিই নাই। স্ত্রী তার স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না। মার্ক (Mark) বলেন, যিশু তালাকের প্রতি ঘৃণা এইভাবে প্রকাশ করেন,

Whoever divorces his wife and marries another, commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.

---

১৭৭. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

১৭৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; Klansner, *Joseph: From Jesus to Paul*, (London 1964), P. 571-572

যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর যে স্ত্রী নিজ স্বামীকে বর্জন করে অপর স্বামী গ্রহণ করে, সে ব্যভিচার করে।[১৭৯]

কিন্তু মতান্তরে খৃস্টান ধর্মে তালাক ও পুনর্বিবাহ অবৈধ নহে।

খৃস্টান ধর্মমতে নারী পাপের উৎস, এই ধারণাই তার মর্যাদার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। নারীর জীবনের পরম অবদান হল পরিবারের প্রতি দরদ ও সতর্ক দৃষ্টি এবং সহজে স্বামীর প্রতি বশ্যতা স্বীকার। স্বামীর একান্ত অধীন হয়ে থাকা ও নিজকে স্বামী হতে হীন বলে মেনে নেওয়াই ছিল তার পরম সাফল্য। প্রত্যেক পুরুষের অধিকর্তা হলেন যিশু; নারীর অধিকর্তা তার স্বামী। নারী সমাজের বহির্ভূত ছিল এবং তাকে একান্তভাবেই স্বামীর অনুগত হয়ে থাকতে হত।

Let a woman learn in silence with all submissiveness. I permit no woman to teach or to have authority over men; she is to keep silent. For Adam was formed first, then Eve; and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor.

পূর্ণ আনুগত্যের সাথে নীরবে নারী শিক্ষা লাভ করবে। পুরুষকে শিক্ষা দান অথবা তার উপর কর্তৃত্ব করবার অনুমতি আমি কোন নারীকেই দেইনি; সে নির্বাক থাকবে। কারণ, সর্বপ্রথমে আদম সৃষ্ট হয়েছিলেন, তৎপর হাওয়া এবং আদম প্রতারিত হননি; বরং হাওয়াই প্রতারিত হয়েছিলেন ও নির্দেশ ভঙ্গ করেছিলেন।[১৮০]

নির্জনে থেকে নারী সূতা কাটবে,বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন করবে। কিন্তু অপরিহার্য কারণে তাদেরকে বাহির হতে হলে তারা অবশ্যই পর্দা পরিধান করিবে।

Let her wear a veil. For a man ought not cover his head, since he is the image and glory of God; but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. That is why a woman ought to have a veil.

নারী পর্দা পরিধান করবে। যেহেতু পুরুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব। এজন্য তার মস্তক আবৃত করা উচিত নয়। কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব। কারণ, পুরুষ নারী হতে সৃষ্ট হয়নি; বরং নারী পুরুষ হতে সৃষ্ট হয়েছে। আর পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্ট হয়নি; কিন্তু নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। এজন্যই নারীকে পর্দা পরিধান করতে হবে।

সেন্ট পলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান হতে বহির্গত করেছে এবং এজন্যই গীর্জায় গমন তাদের উচিত নয়। সেন্ট পল নারীদেরকে কলরবকারী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন। এজন্যই তিনি তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রদানের অনুমতি প্রদান করেন নি।

The women should keep silence in the Churches. For they are not permitted to speak; should be subordinates as even the law says, If there is anything they desire to know, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in Church.

---

১৭৯. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৮০. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র, অধ্যায়-২, পৃ. ১১-১৪; সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

নারীরা গীর্জায় নীরব থাকবে। কারণ, তাদেরকে কথা বলবার অনুমতি প্রদান করা হয় নি; তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটি আইনেরও নির্দেশ। তারা কোনকিছু জানতে চাইলে বাড়ীতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিবে। কারণ, গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়।[১৮১]

খৃস্টান সেন্টদের চোখে মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা। তারা নারীকে শয়তানের খেলার মাঠ এবং বিষ্ঠার ছালা বলে অভিহিত করেছে। বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলেন, "পুরুষ তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।" নিপ্লাটিনিজমের প্রভাবে নিষ্কাম ভালবাসার উপর জোর দেওয়া হয়। নারী পুরুষের যৌনমিলন এমনকি স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ককেও অশ্লীল ও অপবিত্র জ্ঞান করা হয়। নর-নারীর কৌমার্যই পাদ্রীদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিষয়। তাদের কাছে বিবাহিত জীবন প্রয়োজনীয় পাপাচার।"

খৃস্ট ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীল এর বিশুদ্ধ নির্দেশ এই যে, নারীর একবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর, স্বামী যত বড় অত্যাচারী ও জালিমই হোক না কেন বা যত বড় অপরাধী ও পাষণ্ডই হোক না কেন, ঐ স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য এই নরপশু স্বামীর বিবাহবন্ধন হতে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। হ্যাঁ, যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো হবে। কিন্তু এই বিচ্ছেদের শর্ত এই যে, ঐ পুরুষ ও নারী বাকী জীবনে আর কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। এ বিধানটি অযৌক্তিক বিধায় পরবর্তীকালে নব্যসভ্য খৃস্টানগণ এটা পরিবর্তন করেছে। এ পরিবর্তিত বিধানটির শর্ত এই যে, স্ত্রী যদি অত্যাচারী ও অপদার্থ স্বামী হতে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে প্রকাশ্যভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে হবে। এছাড়া বিচ্ছেদের আর কোন পথ নেই। এই ইঞ্জীল গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে, নারী মৃত্যুর চেয়েও অধিক তিক্ত ও ঘৃণিত। আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা কখনো নারীর গায়ে হাত লাগাবে না।[১৮২]

৩. হিন্দু ধর্ম ও নারী

প্রাচীন হিন্দু মনীষীরা এই মত পোষণ করত যে, মানুষ যাবতীয় সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন না করা পর্যন্ত তার পক্ষে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়।[১৮৩] ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। কারণ এর অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশী প্রভাব বিস্তার করে আছে। এখানেও নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার জীবন থেকে মুক্তি পায় নি। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মনুজার নারী সম্পর্কে বলেছেন,

শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।[১৮৪]

"নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন স্বাধীন যেন না হয়।"[১৮৫]

"কুরবানী এবং ব্রত পালন নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের কথা মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত।"[১৮৬]

"মিথ্যা বলা নারীর আপন বৈশিষ্ট্য।"[১৮৭]

---

১৮১. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১৮২. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী সা. এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, প্রাগুক্ত, পৃ ৬৫; আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, *ইসলাম আওর আওরাত*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২-২৩।

১৮৩. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

১৮৪. মনুস্মৃতি ১৪৫ : ৫

১৮৫. মনুস্মৃতি ১৪৫ : ৫

১৮৬. অধ্যায়-৫, ১৫৫-১৫৭

জনৈক ব্রাহ্মণ যিনি মহারাজ মনুজীর মনু স্মৃতিকে বাচালতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্র প্রশাসনের মূলনীতি হিসেবে কার্যকর ছিল, তিনি নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

"নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখরযুক্ত জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।"[১৮৮]

"মিথ্যা কথা বলা, অগ্র-পশ্চাত না ভেবে কাজ করা, ধোঁকাবাজি, আহমকী, লোভ, অপবিত্রতা এবং নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।"[১৮৯]

"রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের নিকট থেকে মিষ্ট ভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা উচিত।"[১৯০]

"আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ, রাজ পরিবার ও নারী এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সবসময় সাবধান থাকতে হবে।"[১৯১]

"বন্ধু, চাকর এবং নারী দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয়, তখনই তার কাছে ফিরে আসে।"[১৯২]

মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

নারী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদিগকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হতো। রাজবংশের মহিলাগণের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হতো। কোন কারণেই তাদের গৃহের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এই কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হতো। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হতো, যেন সহজে সে কোন লোকের চোখে পতিত না হয়। তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করিত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হতো। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতো অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলতো, তবে তাকে জরিমানা দিতে হতো।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা-প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।[১৯৩]

মনুর বিধানে পিতা, স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার অধিকার নারীর নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে চির বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হয়। জীবনে কোন স্বাদ-আনন্দ-আহলদি-উৎসবে অংশগ্রহণ করা তার জন্য চির নিষিদ্ধ। নেড়ে মাথা, সাদা বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আতপ চালের ভাত ও নিরামিষ খেয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হয়।[১৯৪]

প্রাচীন হিন্দু ভারতীয় শাস্ত্রে বলা হয়েছে : মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প এবং আগুন-এর কোনটিই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।

---

১৮৭. অধ্যায় :৯-১৭

১৮৮. চানক্য নীতি-১ : ১৫

১৮৯. অধ্যায়-২

১৯০. অধ্যায়-১৪ : ১২

১৯১. অধ্যায়-১২ : ১৮

১৯২. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-২৭

১৯৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৯৪. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশ্যে-দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি অথবা ধনদৌলত লাভের জন্য বলিদান করা হত। একটি বিশেষ গাছের সামনে এভাবে নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সহমৃত্যু বরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হত অনেক হিন্দু নারীকে।[১৯৫]

মনু সংহিতায় পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। সারা জীবন তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিলনা। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সতিদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর এই প্রথা বিলোপ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের তা মনোপুত ছিলনা। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে।[১৯৬]

হিন্দু ধর্মে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে নারীদেরকে মানুষের কাতারে গণ্যই করা হয় না। পিতামাতার সম্পত্তি হতে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তালাকের ব্যাপারে তাদেরকে কোন অধিকারই দেয়া হয়নি। স্বামী যত বড় জালিম আর পিশাচই হোক না কেন, তার থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থাই নেই। এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্ত্রীর বয়স যত কমই হোক না কেন তার অন্যত্র বিবাহের কোন ব্যবস্থা নেই। এ কারণেই পূর্বের যুগে কোন হিন্দু মহিলার স্বামী মারা গেলে সাথে সাথেই ঐ মহিলাও আত্মহত্যা করে এরূপ করুণ অবস্থা হতে মুক্তিলাভ করত।[১৯৭]

হিন্দু আইনে নারীর কোন মূল্য নেই। সে একটা অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র। ধর্ম ও শিক্ষায় তার কোন অধিকার নেই। সে বেদ পাঠ করতে পারে না। এমনকি পূজা উৎসর্গ করাও তার জন্য নিষিদ্ধ । ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপের কাজ।[১৯৮]

৪. বৌদ্ধ ধর্ম ও নারী

বৌদ্ধধর্মে শিক্ষা হল নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। এটি হতেই বৌদ্ধধর্মে নারীর মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। বিবাহ ও এর আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্যকলাপ বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী । এর লক্ষ্য হল সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।[১৯৯]

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছুই করে যাননি। কোন কিছু করার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" অন্য এক সময় তিনি আরও বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথাবার্তাও বলো না। কেননা, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস-ধন লুট করে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।"

---

১৯৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

১৯৬. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩

১৯৭. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯৮. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৯৯. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; U. May OUNG : Buddhist Law, part 1, p. 2.

বৌদ্ধ ধর্ম আরো বলে যে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা, জল্লাদের ছুরির নীচে মাথা পেতে দেওয়া উত্তম।" গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি লোকদেরকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের আহবান করে গিয়েছেন।[২০০]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westermark) বলেন,

Women are, of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজ্জনক। নারীর মধ্যে মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[২০১]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বেটনী (Bettany) তাঁহার World's Religions গ্রন্থে বলেন:

Unfathomably deep, like a fish`s course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie.[202]

পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হল তেমনি নিবিড়–যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম।

উল্লিখিত আলোচনা হতে নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, আলোচিত ধর্মগুলোর কোন একটিতেও নারীর কোন মর্যাদা ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে নারী যে একটি প্রাণী, তার যে প্রাণ আছে- এ কথাটিও স্বীকার করা হত না। তাকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের ন্যায় নির্জীব পদার্থ বলে গণ্য করা হত। নারী জাতির অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্বপ্রকার স্বাধিকার হতে তারা চির বঞ্চিত ছিল।

৫. ইসলাম ধর্ম ও নারী

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতা নারীদের সাথে কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে এবং কি নির্দয়ভাবে তাদের অধিকার হরণ করেছে, উহা অতিসংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। এ সব ব্যাপার সম্মুখে থাকলেই ইসলাম নারীর মর্যাদাদানে কি বিরাট অবদান রেখেছে, তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

জগতের বিভিন্ন ধর্ম ও জড়বাদী সভ্যতা নারীজাতির উপর পাপ ও অপবিত্রতার যেই কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম এক প্রচন্ড আঘাতে উহা মোচন করে দিয়াছে।

ইসলাম ঘোষণা করে, নারী ও পুরুষ একই উৎস হতে উদ্ভূত। অতত্রব, নারী পাপী বলে পরিগণিত হলে পুরুষও পাপী বলে গণ্য হওয়া উচিত। আর পুরুষের মধ্যে মহত্বের কোন স্ফুলিঙ্গ থাকলে নারীর মধ্যেও তা থাকা আবশ্যক।

---

২০০. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ২১-২২

২০১. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; Nazhat Afza and Khurshid Ahmaed, *The Position of Women in Islam*, (Kuwait, Islamic Book Publishers, 1982), P.12-13

২০২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭; Encyclopedia Britannica, vol. V, p. 732

খৃস্টানগণ বলেন, নারী হৃদয়হীন জন্তু এবং তাহাকে যৌন অনুভূতিহীনভাবেই সারাজীবন অতিবাহিত করতে হইবে। ইসলাম তাদের এই দাবিও খণ্ডন করেছে।

পবিত্র কুরআন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35)

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী-তাদের সকলের জন্যই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রাখিয়াছেন।"[২০৩]

"নারীই সর্বপ্রথম প্রতারিত হয়েছিল। সুতরাং নারীই হযরত আদম (আ) এর পতনের জন্য দায়ী। "বাইবেলের এই উক্তি ইসলাম খণ্ডন করে। ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে, হযরত আদম (আ) এবং হযরত হাওয়া (আ) উভয়েই যুগপৎভাবে প্রতারিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা উভয়েই পতনের জন্য সমানভাবে দায়ী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন,

وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ . فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

"এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাকো এবং ওখানে যা চাও যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাকো; কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যাথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল।"[২০৪]

"না পুরুষ নারীর জন্য এবং নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে। "ধর্মের এই ঘোষণার প্রতিবাদে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরূপ।"[২০৫]

অর্থাৎ পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না; বরং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও মিলন একেবারে অবিচ্ছেদ্য, তদ্রুপ সম্পর্কই তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন ও তাদের দুজন হতে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন।"[২০৬]

---

২০৩. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৫।

২০৪. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ অনুদিত, *তাফসীরে জিলানী*, (ঢাকা : জিলানী কাফেলা), খ. ১, পৃ. ১১৬

২০৫. আল কুরআন, সূরা বাকারা (২) : ১৮৭

২০৬. *আল-কুরআন*, সূরা নিসা (৪) : ১

হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তাআলা প্রথমে মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। পরে তাঁর দেহ হতে আদি নারী হযরত হাওয়া (আ) কে পয়দা করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদেরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হাদিস শরীফে আরও উক্ত আছে, নারী পুরুষের জমজ জোড়ার অর্ধাংশ।

ইসলাম নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা প্রদান করেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা কেবল দৈহিক ও সৃষ্টিগত কারণে। ইসলাম শ্রম বিভাগের নীতিতে বিশ্বাস করে। কঠোর শ্রমসাধ্য এবং গৃহের বাহিরের রূঢ় ও কর্কশ কর্ম সম্পাদন ও জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছে। ইসলাম গৃহকেই নারীর সর্বপ্রথম কর্মস্থল বলে মনে করে এবং গৃহের ব্যবস্থাপনা, সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও শিশুদের শিক্ষা দান কার্য নারীদের উপর সমর্পণ করেছে। ইসলাম নারীকে বিদ্যার্জনে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে জাতির উন্নতিমূলক ও জাতি গঠন কার্যে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করে। অফিস ও কল-কারখানার কার্যাবলী ইসলাম নারীর রুচি ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে মনে করে এবং নারী ও পুরুষকে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উভয়ের সমন্বয়, সহানুভূতি ও প্রেম-প্রীতির সাথে কার্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে।[২০৭]

পারিবারিক বিষয়াদি পরিচালনার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কার উপর ন্যস্ত থাকবে, এই সমস্যা এড়ানো যায় না। এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, কর্ম-পন্থার ঐক্য না থাকলে সুস্থ পরিচালনা সম্ভব নয় এবং একাধিক ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকলে কর্ম-পন্থায় ঐক্য থাকতে পারে না। এজন্য একজনের উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। মুসলমান পরিবারে মাতাকে পিতা অপেক্ষা অধিক, বোনকে ভাই অপেক্ষা অধিক এবং কন্যাকে পুত্র অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করা হয়েছে। কিন্তু পরিচালনার ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নয়; বরং স্বামীর উপরই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হয়েছে। এতদসঙ্গে স্বামীর উপর স্ত্রীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায় অর্পণ করা হয়েছে এবং স্ত্রীর উপর কোন প্রকার অন্যায় সাধনে স্বামীর প্রতি কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। অন্যায় করলে স্বামীকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আর আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২০৮]

কোন কোন ধর্মে নারীকে 'An organ of Satan' (শয়তানের অঙ্গ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামে নারী শয়তানের অঙ্গ নহে; বরং ইসলাম তাকে মুহসানাহ' (সংরক্ষিত দুর্গ) বলে আখ্যায়িত করেছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهَاتِ

"জান্নাত জননীর পদতলে।"[২০৯]

এতে মায়েরজাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিদ্যা অর্জনের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، »

---

২০৭. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

২০৮. *আল-কুরআন*, সূরা বাকারা (২) : ২২৮

২০৯. শিহাবুদ্দীন কাযাঈ, *আল-মুসনাদ*, (বৈরূত : মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬), খ.১, পৃ. ১০২, হাদিস নং- ১১৯

"নর-নারী সকল মুসলমানের জন্যই ইল্‌মে দীন অর্জন করা ফরয (অবশ্য কর্তব্য)।"[২১০]

নারী-পুরুষের বিবাহ-বন্ধনকে কোন কোন ধর্মে ও সভ্যতায় অগ্রাহ্যের দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়েছে এবং একে ক্ষতিকর ও অপমানজনক মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চিরকালের জন্য ঘোষণা দিয়ে বলেছেন,

«النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، »

"বিবাহ আমার সুন্নত এবং যে ব্যক্তি আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[২১১]

তিনি আরও বলেন,

«مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

"যে ব্যক্তি বিয়ে করল, সে ঈমানের অর্ধেক সম্পন্ন করল। এরপর বাকী অর্ধেকের বেলায় সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"[২১২] এরূপে তিনি বিবাহের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

তিনি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা নারীদের প্রতি সম্মানের সাথে আচরণ করতে আমাদেরকে আদেশ করেছেন। কারণ, তারা আমাদের মা, কন্যা, ফুফু, খালা, মামী ইত্যাদি। তিনি বলেন,

" إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "

"দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর মূল্য আছে। কিন্তু জগতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলো ধার্মিক নারী।"[২১৩]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অপর একটি নিদর্শন এই, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।"[২১৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন:

ক. প্রেম-প্রীতির সাথে তাদের সঙ্গী হয়ে থাক। তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করলে হতে পারে যে, তোমরা যে বস্তু ঘৃণা কর, তাতেই আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন।

খ. তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

গ. মুসলমান অবশ্যই তার স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না। সে যদি তার কোন মন্দ স্বভাবের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে, তবে সে যেন তার মধ্যে যে সৎ স্বভাব রয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

ঘ. যে মুসলমান তার স্ত্রীর সাথে যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।[২১৫]

ঙ. নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর।[২১৬]

চ. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে তাদের গৃহের কর্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১৭] তিনি আরও বলেন:

---

২১০. ইবনে মাজা, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৮১, হাদিস নং- ২২৪

২১১. ইবনে মাজা, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৫৯২, হাদিস নং- ১৮৪৬

২১২. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, (কাহেরা: দারুল হারামাইন,) খ. ৭, পৃ. ৩৩২, হাদিস নং- ৭৬৪৭

২১৩. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১১, পৃ. ১২৭, হাদিস নং- ৬৫৬৭

২১৪. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম (৩০) : ২১

২১৫. তিরমিযী, *আস-সুনান*

২১৬. মুসলিম, *আস-সহিহ*

২১৭. বুখারী, *আস-সহিহ*

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

"যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অবাধ্য হয় না, যে কোন দরজা দিয়া বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য তাহাকে বলে দাও। তাক্ওয়ার পর মুমিনের সর্বোত্তম সম্পদ হইল ধার্মিকা স্ত্রী, যে স্বামীর আদেশ মানিয়া চলে।"[২১৮]

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী পুরুষ হতে স্বতন্ত্র কোন স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিল না। ইসলামেই তার স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হয়েছে সে স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং তার স্বনামে নিজ দায়িত্বে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে পারে। মাতা, স্ত্রী, বোন ও কন্যা হিসাবে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে। ইসলামই তাকে স্বীয় স্বামী গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। ইসলামের পূর্বে কোন ধর্ম, আইন ও সভ্যতাই নারীকে এই সকল অধিকার প্রদান করেনি ।

মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়ার অধিকার ইসলাম অনুসারে মাতাপিতা এবং আত্মীয়–স্বজন কারো নেই। আর ইসলামই স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নারীকে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

''পুরুষরা যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ এবং নারীরা যা অর্জন করে, তা তাদের প্রাপ্য অংশ।"[২১৯]

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মাতাপিতা ও আত্মীয়–স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হউক বা বেশীই হউক, (তাদের জন্য) এক নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)।"[২২০]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র জগতব্যাপী নারীজাতির অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তখনকার কোন ধর্মই মাতাপিতা, আত্মীয়–স্বজন ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার স্বীকার করেনি। নারীকে আপদ, অনভিপ্রেত বোঝা এবং পরিবারের অপমান ও অমর্যাদারূপে গণ্য করা হত। দুনিয়ার সর্বত্র নারী অস্থাবর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত ছিল। বিয়ের ব্যাপারে তাদের সম্মতি গ্রহণ করা হত না। পুরুষের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদেরকে গ্রহণ ও বর্জন করা হত। তাদের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। তারা সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশই তারা পেত না। গোটা দুনিয়ায় যখন নারীজাতি অবহেলিত ও লাঞ্ছিত ছিল, কোন দেশ, জাতি ধর্ম বা আইনই নারীকে কোন প্রকার অধিকারই প্রদান করেনি, সেই যুগে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নারীজাতির সকল অধিকার প্রদান করেন এবং কঠোরভাবে তাদের নিরাপত্তা বিধান করেন। নারীজাতির এই সকল অধিকার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আস্তে আস্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে চাপের মুখে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে।

বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই সর্বপ্রথম স্ত্রীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' রূপে অভিহিত করেছে। সীমাহীন অবাধ বহুবিবাহই ছিল তৎকালীন প্রচলিত রীতি এবং স্বামীগণ যখন তখন নিজেদের খেয়াল-খুশীমত স্ত্রীদেরকে তালাক দিত। ইসলাম এই সকল অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করে। একমাত্র ইসলামই নারীজাতির এমন সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যা এখনও অপরাপর জাতির নিকট অজ্ঞাত রয়েছে। মোটকথা, নারীকে

---

২১৮. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪, হাদিস নং- ৪৫৯৮

২১৯. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ৩২

২২০. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ৭

পুরুষের সমান করে গঠন করার জন্য ইসলাম যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। ইসলাম নারীকে সর্বনিম্ন স্তর হতে পুরুষের সমমর্যাদায় উন্নীত করেছে।

ইসলাম নারীজাতিকে এমন সুমহান মর্যাদা প্রদান করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগত নারী সম্পর্কে ইসলামের প্রতি প্রচণ্ডতম হামলা চালিয়েছে। অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম নারীকে মানবতার ধ্বংসের কারণ বলে তাকে লাঞ্ছনার সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করেছে। তবুও আজ খৃস্টানগণই নারীজাতির উদ্ধারকর্তা বলে মিথ্যাগর্বে স্ফীত!

বহু শতাব্দী যাবত পাশ্চাত্য জগতের নিকট ইসলামকে বিকৃতরূপে উপস্থাপনের সুপরিকল্পিত প্রবল প্রচেষ্টা চলে আসছে। খ্রীষ্টানদের প্রতি ইসলামের প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জই এর বিরুদ্ধে তাদেরকে ভিত্তিহীন ও মনগড়া অভিযোগ উত্থাপনে প্ররোচিত করেছে। নাস্তিক ও জড়বাদী পাশ্চাত্য ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করতে না পেরে এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করবে এবং এর কদর্য করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্যঘেঁষা, পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্বিত বহু মুসলমানও পরিপূর্ণ জীবন-বিধানরূপে ইসলামের পরম সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে একান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে তাদের সাথে তাল মিলাতে শুরু করেছে।

আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, নারী ধর্ম বিনষ্ট করে পারিবারিক জীবন ধ্বংস সাধনের জন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী-মুক্তির আওয়াজ তুলেছে। স্ত্রী ও মা হিসেবে নারীর ভূমিকা অনাকর্ষণীয়, অসন্তোষজনক ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন করে, মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নারীজাতিকে তাদের গৃহের বাহির করেছে। নারীদেহকে পণ্যসামগ্রীরূপে উপস্থাপনের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর ফলেই পাশ্চাত্য জগতে অবিবাহিতা মা, গর্ভধারিণী অবিবাহিতা যুবতী, জারজ সন্তান, গর্ভপাত, তালাক, নারী সংক্রান্ত অপরাধ ও যৌন ব্যাধির সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যভিচারের কোন আইনানুগ শাস্তি প্রদান করা হয় না; বরং সমাজে এই গর্হিত কার্যের প্রতি প্রকারান্তরে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রাচীন যুগ ও নারী

সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে মানব-সভ্যতা, মঙ্গল ও উন্নতি। এই সম্পর্কে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও সভ্যতার ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং মঙ্গল ও উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সর্বত্র এই সম্পর্কের ব্যাপারে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতিই পরিলক্ষিত হয়। কোথাও নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীরূপে জীবনের চলার পথে তাকে সাহায্য করেছে। আবার অপরদিকে এই নারীকেই অধম দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। সকল অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাকে জীব-জন্তুর ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে। তাকে পাপ-পঙ্কিলতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তার অন্তর্নিহিত এ গুণরাজি বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাকে প্রদান করা হয়নি। আবার কোন সময় এই সুবিধা প্রদান করা হলেও সঙ্গে সঙ্গেই উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করে তাকে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে বংশীয়-শৃঙ্খলা ও সভ্যতার ভিত্তি ধ্বসে পড়েছে। আমরা এখন প্রাচীন যুগে নারীর অবস্থার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদান করবো।

১. গ্রীক সভ্যতা ও নারী

প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কিছুটা বিস্তারিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য গ্রীক ও রোমান যুগ থেকে পাই। তারা তাহযীব-তামাদুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় এতদূর উন্নতি করেছিলো যে, তার ওপর ভিত্তি করে অনেক সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এতসব উন্নতি সত্ত্বেও তাদের সমাজে নারীর স্থান ছিল

অনেক নীচে। তারা নারীকে মানবতার জন্য একটা দুর্বহ বোঝা মনে করতো। সেবিকা হিসেবে পরিবারের মানুষের সেবা করা ছাড়া তাদের কাছে নারীর আর কোনো জীবন লক্ষ ছিল না।

গ্রীকরা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নারী সম্পর্কে এমন সব ধ্যান-ধারণা পোষণ করতো যা শুনে হাসি সম্বরণ করা কঠিন। কিন্তু তা দ্বারা তাদের দৃষ্টিতে সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান কি ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। তারা বলতো, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার এবং সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব কিন্তু নারীর কু-প্রভাব ও অকল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়। পেণ্ডোরা নামের এক নারী সম্পর্কে তাদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, সে-ই সবরকম পার্থিব বিপদ আপদের উৎস। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দুটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ। এক. বিয়ের দিন এবং দুই. তার মৃত্যুর দিন।[২২১]

লেকী তার 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সামগ্রিকভাবে সতীসাধ্বী গ্রীক ললনাদের মর্যাদা ছিল চরম অধঃপতিত। তাদের গোটা জীবন অতিবাহিত হতো দাসত্বের শৃঙ্খলে। অর্থাৎ শৈশবে পিতামাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বিধবা হলে ছেলেদের তত্ত্বাবধানে শৃঙখলিত থেকে। তার তুলনায় তার পুরুষ আত্মীয়দের অধিকার সর্বাবস্থায় অগ্রগণ্য মনে করা হতো। আইনগতভাবে তার তালাকের অধিকার ছিল বটে কিন্তু সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারতো না। কারণ আদালতে এ ধরনের কথা প্রকাশ করা গ্রীকদের লজ্জা-শরমবোধের পরিপন্থী ছিল...।" প্লেটো অবশ্য নারী পুরুষের সমতার দাবী করেছিলেন কিন্তু তা মৌখিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রভাব ছিল না।

সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল নিরেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার কাজে আসবে। স্মার্টার আইনে একথা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল যে, অল্প বয়স্ক এবং দুর্বল স্বামীর উচিত তার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে কোনো যুবকের সাথে বিয়ে দেয়া যাতে সেনাবাহিনীতে শক্তিশালী সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[২২২]

গ্রীক সভ্যতায় নারী কি মর্যাদার অধিকারী ছিল তা সক্রেটিসের ভাষায় বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন :

Woman is the greate source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail.

নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের মত। যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি এটি খেলে তাদের মৃত্যু অনিবার্য।

গ্রীক সভ্যতায় নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে এন্ডারস্কি (Anderosky) বলেন :

Cure is possible for fireburns and Snake bite; bu it is impossible to arrest woman`s charms.

অগ্নিতে দগ্ধ রোগী ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে।[২২৩]

প্রাচীন গ্রীসে বিবাহে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হতো না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিবাহে বাধ্য হতে হতো। বরং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতাপিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভুরূপে

---

২২১. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

২২২. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭

২২৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; Nazhat Afza and Khurshid Ahmaed, *The Position of Women in Islam*, (Kuwait, Islamic Book Publishers, 1982), P.9-10

বরণ করে নিয়ে নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হতো এবং সর্বদা তাদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়–স্বজন-পিতা, ভ্রাতা এবং চাচা, মামা ও খালুকে মেনে চলতে হতো।

গ্রীক সভ্যতার গৌরবোজ্জ্বল যুগে সতী-সাধ্বী নারী মহামূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত ছিল। সেকালে তারা পর্দা-প্রথা মেনে চলতো। পরবর্তীযুগে বারবনিতালয় গ্রীসের সর্বস্তরের লোকদেরকে আকর্ষণ করে এবং তখন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণেও পতিতাদের প্রভাব প্রতিফলিত হতো। পতিতালয় যেন তখন এক প্রকার উপাসনালয়ে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, তাদের মতে পতিতা ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এফ্রোডাইটের প্রতিনিধি। সে তার স্বামীদেরকে পরিত্যাগ করে অপর তিন দেবতার সাথে অবৈধ প্রেমে নিমজ্জিত হয়েছিল।[২২৪]

প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বেরুত না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ির ভেতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল, ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলণ ছিল। তবে আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলতো। যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তার কোনই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তারা পুরুষের দাসীবাদীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো। পুরুষরাই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারতো না। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেওয়া হতো না; বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন কোন নারী যখন তালাক নেওয়ার জন্য আদালতে যেত, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওঁত পেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়ামাত্র পাকড়াও করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেত।[২২৫]

অবশ্য স্পার্টাবাসী কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। তাকে উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনদেনের এখতিয়ার দিয়েছিল। এ কারণে স্পার্টার মহিলারা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর মহিলাদের চেয়ে বেশী রাস্তায় বেরুতো এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো। তথাপি এরিস্টটল নারীকে এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীর নিন্দা করতেন এবং এই অধিকার প্রদানকেই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী করতেন।

অত:পর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করলো, তখন নারীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভা-সমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো যে, ব্যভিচার আর দূষণীয় মনে হতো না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলঙ্গ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্মতত্ত্ব নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী 'আফ্রোডাইটি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারণ মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে সে 'কিওপিড'

---

২২৪. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam*, (Lahore, Islamic Publication Ltd., Oct. 1979), P.2-3

২২৫. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

নামক যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শনস্বরূপ "হারমোডিস ও আরাসতোজেন" নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এ পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।[২২৬]

২. রোমান সভ্যতা ও নারী

প্রাচীন রোমান সমাজে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকতো না। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হতো। পিতা যখন তাকে ধরে ওপরে তুলতো, তখন প্রমাণিত হতো যে, সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে; অন্যথায় ধরে নেয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপাসনালয়ের বেদীতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো, নচেত শিশু ক্ষুধায়, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুকে ধুকে মরতো।

পরিবার প্রধান ইচ্ছা করলে যে কোন বহিরাগতকে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করতে পারতো এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো, দাসদাসীর মত বিক্রি করে পরিবার থেকে বের করে দিতে পারতো। অতঃপর এক সময় বিক্রির অধিকার তিনবার নাগাদ সীমিত করে দেয়া হয় নয়া আইন জারীর মাধ্যমে। পিতা কর্তৃক নিজ পুত্রকে বিক্রি করা দুইবারের বেশী হলে ঐ পুত্রের ওপর আর পিতার আনুগত্য করার বাধ্যবাধকতা থাকত না। তবে সন্তান যদি মেয়ে হতো, তাহলে তাকে আজীবন পিতার অনুগত থাকতে হতো।

ছেলে-মেয়ের বয়স যতই হোক, তাদের ওপর পিতার কর্তৃত্ব পিতার মৃত্যু পর্যন্তই বহাল থাকতো। সন্তানের ন্যায় নিজের স্ত্রীর ওপর, নিজের পুত্রদের স্ত্রীদের ওপর এবং পৌত্রদের স্ত্রীদের ওপরও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব বজায় থাকতো। এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাতো বিক্রি করার অধিকার, বহিষ্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। অন্য কথায় বলা যায়, পরিবারের ওপর পরিবারপ্রধানের কর্তৃত্ব ছিল মালিকানামূলক, সংরক্ষণমূলক নয়। পরিবারপ্রধানের এই কর্তৃত্ব ৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনানের সময় খর্ব করা হয় এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু মারপিট করার চেয়ে বেশী কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।[২২৭]

রোমানগণ স্ত্রীকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলে গণ্য করত। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। বিবাহিতা স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে এর বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত। রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতই থাকতে হতো। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না।

সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারত না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার সৃষ্টি হতো। [২২৮]

অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যাশিশুর আদৌ কোন মালিকানা অধিকার থাকতো না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিণত হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে। এমনকি মেয়ের

---

২২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২২৭. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

২২৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫; Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam*, ibid, P. 3-4

বয়োঃপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসাবে পাবে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবেনা, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে।

পরিবারপ্রধান মারা গেলে বয়োঃপ্রাপ্ত পুত্রসন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হতোনা। কন্যা যতদিন বেঁচে থাকতো, ততদিন অন্য একজন অভিভাবক তার মনিব হতো। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধিত হয়। আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরূপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনোপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হবে যে, এই আত্মবিক্রির উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এই চুক্তির কারণে নতুন মনিব তাকে তার পছন্দমত যে কোন কাজে বাধা দিতনা। আর যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে "সার্বভৌমত্ব চুক্তি" নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে হতো। অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব দিতে হতো। এই চুক্তি সম্পাদিত হতো তিনটি উপায়ে:

১. পুরোহিতের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

২. প্রতীকি ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যথারীতি মূল্য দিয়ে কিনে নিত।

৩. বিয়ের পর পুরো এক বছর স্বামীর সাথে বসবাসের মাধ্যমে।

এভাবে পরিবারপ্রধান নিজের কন্যার ওপর থেকে পিতৃত্বের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতো এবং এ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হতো স্বামীর নিকট।[২২৯]

লেকী তার 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থে রোমান নারী সম্পর্কে লিখেছেন,

"রোমান আইন অনুসারে দীর্ঘদিন যাবত নারীর মর্যাদা ছিল যার পর নাই অধঃপতিত। বাপ বা স্বামী যিনিই পরিবারের প্রধান হতেন স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর থাকতো তার সীমাহীন কর্তৃত্ব। তিনি ইচ্ছা করলেই নারীকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার করতে পারতেন। কন্যার পিতার কাছে উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর কোনো রীতি প্রচলিত ছিল না। অধিকন্তু বাপের এতটা কর্তৃত্ব ছিল যে, কন্যাকে যেখানে ইচ্ছা বিয়ে দিয়ে দিতো। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতেও পারতো। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ইতিহাসের যুগে এসব অধিকার বাপের নিকট থেকে স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হয়েছিল। এরপর স্বামীর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, সে চাইলে স্ত্রীকে হত্যাও করতে পারতো। ৫২০ বছর পর্যন্ত কেউ তালাকের নাম পর্যন্ত শোনেনি। দাসদের মতো নারীর জীবনলক্ষ্য সেবা ও চাকরানীর কাজ বলে মনে করা হতো। পুরুষ বিয়ে করতো শুধু এ লক্ষ্য নিয়ে যে, সে স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। তাকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত মনে করা হতো না। এমনকি কোনো ব্যাপারে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যে আইনগতভাবে তার কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। অবশ্য দৈহিক দুর্বলতার কারণে তাকে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। এতে কারো সন্দেহ নেই যে, পরবর্তী সময়ে রোমানরা নারীদের কিছু অধিকার দিয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বাস্তব সত্য যে, সে পুরুষের সমমর্যাদা কখনো পায়নি।"[২৩০]

মোটকথা পরবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব খানিকটা শিথিল হয় এবং তা প্রভুত্ব থেকে একধাপ নেমে তত্ত্বধায়কসুলভ কর্তৃত্বের রূপ ধারণ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নারীর অধিকার পুরোপুরি বহাল হয়নি।

---

২২৯. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৩০. বিভিন্ন যুগে রোমান সাম্রাজ্যের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল এবং ক্রমান্বয়ে কিভাবে তার সংস্কার সাধিত হয়েছিল তা বিস্তারিত জানতে হলে ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা দেখুন।-সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮

৩. ভারতীয় সভ্যতা ও নারী

ভারতীয় উপমহাদেশেও ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নারী পাপ এবং নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং তাকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি।

মনু'র মতে তাকে দিবা-রাত্র অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ, নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। অতএব, তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথগামী হবে।

নারী সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চশ্রেণী ও রাজবংশের মহিলাদিগকে অধিকতর সাবধানতার সাথে ভিন্ন পুরুষের নিকট হতে দূরে রাখা হতো। রাজবংশের মহিলাগণের আবাসস্থল কড়া প্রহরাধীনে রাখা হতো। কোন কারণেই তাদের গৃহের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয় বা অপরিহার্য কারণে উচ্চবংশের কোন মহিলা জীবিকা অর্জনে বাধ্য হলে এ কাজে যাতে তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, সেজন্য অতি কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা হতো। বস্ত্রশিল্প কারখানায় তাকে যেতে হলে অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে তাকে যেতে হতো, যেন সহজে সে কোন লোকের চোখে পতিত না হয়। তার বয়নকৃত বস্ত্র যে কর্মচারী গ্রহণ করত, তাকে অন্ধকারেই বাতির সাহায্যে তা পরীক্ষা করে নিতে হতো। সে যদি মহিলার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাতো অথবা তার সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোন কথা তার সাথে বলতো, তবে তাকে জরিমানা দিতে হতো।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, প্রাচীন ভারতে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কিছুটা পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল; যদিও পূর্ণ পর্দা-প্রথা ইসলামের আবির্ভাবের পরই প্রবর্তিত হয়।[২৩১]

সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হতো। এখনও এই বর্বর প্রথা ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও ভারতকে এই প্রথা রহিত করে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে।

হিন্দুসমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণীবিশেষ। এইজন্যই সতীদাহ প্রথা অনুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত।

There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body.

নারীর মত এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত আগুনস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।

পুত্র সন্তান জন্ম নিলে পরিবারে আনন্দ ধরত না। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্ম নিলে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত।

The birth of a girl grant if else-where, here grant a boy.

'হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদের পুত্র সন্তান দাও।' এখানে গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি করেছেন।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত অসুর বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যা বিক্রয়স্বরূপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। সে যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হতো। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর মত ব্যবহার করতে পারতো। এই বালিকাগণ অবশেষে মন্দিরের

---

২৩১. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; Amer Ali, *The Spirit of Islam*, P. 30

পুরোহিত ও ধর্মকর্তাদের অধীনে চলে যেত এবং পুরোহিত ও মন্দিরের কর্মচারীদের উপরি পাওনারূপে পরিগণিত হতো।[২৩২]

বৈদিক যুগে নারী যুদ্ধলব্ধ লুটের মালের মত ছিল। যুদ্ধ বিজয়ের পর বিজয়ী জোরপূর্বক নারীদেরকে অপহরণ করত এবং লুণ্ঠিত সামগ্রীর মত তাদেরকে জদের মধ্যে বিতরণ করে নিত। স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী স্ত্রী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতো। ব্যভিচার, পতিতাবৃত্তি ও এ জাতীয় কোন অপরাধের কারণে, এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়ার কোন দেশেই নারী আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কোথায়ও নারী সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারী হতে পারত না।[২৩৩]

৪. চীন সভ্যতা ও নারী

দুনিয়াতে চীনদেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে Waters of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে- যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নারী কখনও কোন সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না। এমনকি তার সন্তানদের উপরও কোন অধিকার থাকত না। স্বামী যখন ইচ্ছা, তখনই তাকে তালাক দিতে পারত এবং অপরের উপপত্নীরূপে তাকে বিক্রিও করতে পারত। বিধবা হলে তাকে স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিরূপে জীবন যাপন করতে হতো এবং পুনর্বিবাহ তার জন্য প্রায় অসম্ভব ছিল।

চীনদেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে জনৈকা চীনদেশীয় নারী বলেন: "মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারী হতে নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।"

সে দেশে বালকেরা দরজার সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াত যেন তারা স্বর্গ হতে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হতো না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর পতিত না হয় সেজন্য সে আপন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউ তার জন্য কান্না করত না।

ব্যভিচারের মত অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেয়া হতো।[২৩৪]

অবিবাহিতা নারী পিতার পরিবারের সদস্য থাকত। বিবাহের পর সে স্বামীর পরিবারে চলে যেত এবং স্বামীর মাতাপিতা ও মুরুব্বীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকত। অলংকারাদি ও নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস-পত্র ব্যতীত বধূ যে সম্পত্তিই সঙ্গে আনত, এগুলোর সবই স্বামীর পরিবারের সম্পত্তিতে পরিগণিত হতো। বধূর অবস্থা নিতান্ত অসহায় ছিল এবং কেবল পিতার বংশের বলেই সে স্বামীর পরিবারে টিকে থাকতে পারতো। পুত্রসন্তান প্রসব ও স্বামীর মুরব্বীদের মৃত্যুতে শোক পালনের পর স্ত্রীর অবস্থা কিছুটা সবল হয়ে উঠত। বর ও কনের পরিবার-প্রধানদের আনুষ্ঠানিক সম্মতিতেই বিবাহ-কার্য সম্পাদিত হতো। প্রচলিত রীতি অনুসারে বিবাহের উকিলের মাধ্যমে এই কার্য সম্পন্ন হতো।[২৩৫]

---

২৩২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫

২৩৩. Fida Hussain Malik, *Wives of the Prophet*,(Lahore, Ashraf Publications, 4th Edition,!983), P. 12-13

২৩৪. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam*, ibid, P. 7

২৩৫. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫; Encyclopedia Britanica, Vol. IV,P. 409

৫. ইউরোপীয় সভ্যতা ও নারী

বর্তমানে ইউরোপ নারী ও পুরুষের সাম্যের বড় দাবীদার। কিন্তু এ ইউরোপে এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও নারী পুরুষের যুলুম অত্যাচারের শিকার ছিল। এমন কোনো শক্তিশালী আইন ছিল না যা পুরুষের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করতে পারতো।

ইংল্যাণ্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পরে পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আসে না । কিন্তু বিয়ের পরে নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে উঠেছিল যে, নারীর জিম্মায় বিয়ের পূর্বের কোনো ঋণ থাকলে পুরুষ তা পরিশোধ করবে। কিন্তু তার কোনো ধন-সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি থাকলে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে নারী তার সম্পদের ব্যাপারে কোনো চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে তা ভিন্ন কথা। পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর মামলা দায়ের করার অধিকারও ছিল না। পুরুষ ইচ্ছা করলে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতো। পক্ষান্তরে তাকে স্ত্রীর সম্পদের বৈধ হকদার মনে করা হতো। কোনো কাজ করার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। সে তার নিজের ইচ্ছামত কোনো চুক্তি করতে পারতো না। এমনকি অর্থোপার্জন করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না। মেয়েদেরকে পিতামাতার মালিকানা মনে করা হতো। পিতামাতা যার সাথে ইচ্ছা তাদের বিয়ে দিতো। বিয়ে ছিল একটি ব্যবসায় যার মাধ্যমে পিতামাতা মেয়েদের ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিতো। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা মিল (MILL) তার "পরাধীন নারী" গ্রন্থে লিখেছেন :

"ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন, খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি যখন বাপ তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতো। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোনো তোয়াক্কাই করা হতো না।"

খৃস্টধর্মের প্রসারের পূর্বে পুরুষ ছিল সবকিছুর একমাত্র মালিক। নারীর তুলনায় পুরুষের অপরাধের জন্য কোনো শাস্তি বা আইন কিছুই ছিল না। পুরুষ যখনই চাইতো স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতো। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার ছিল না। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন আইনে পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। তবে কার্যত সে ছিল তার বাদশাহ। এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করার পদক্ষেপকে আইনের পরিভাষায় ছোটখাট বিদ্রোহ বলে হাল্কাভাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু নারী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হলে তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল যা বিদ্রোহের শাস্তি অপেক্ষাও কঠোর। বর্তমান সময়েও ইংরেজ আইনে অনেকগুলো দিক এমন আছে যাতে মনে হবে নারী পুরুষের খরিদ করা দাসী। এখনো গির্জায় বিয়ের সময় সারা জীবন স্বামীর আনুগত্য করার জন্য নারীর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয় এবং সারা জীবন এ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য সে আইনগতভাবে বাধ্য থাকে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কিছু করতে আপনা হতেই তা স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হয়। এ ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের আইন নারীর এতটুকু মর্যাদাও স্বীকার করতো না যা অন্য সব দেশে দাসেরাও ভোগ করতো। [২৩৬]

৬. ইসলাম পূর্ব আরব সভ্যতা ও নারী

সভ্যতা ও তামাদ্দুনের এসব কেন্দ্রভূমিতেই যখন দুর্বল নারী জাতির অসহায়ত্ব এবং তাদের ওপর জুলুম-অত্যাচারের চিত্র ছিল এই, তখন সভ্যতা ও তামাদ্দুন বিবর্জিত আরব সমাজে তারা কতটা অসহায় ও নিরাশ্রয় ছিল তা অনুধাবন করা মোটেই কষ্টকর নয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। তারা মানব হিসেবে গণ্য ছিল না। পুরুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যস্থলে ছিল তাদের অবস্থান। কন্যা-সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হতো।

আল-ইসলাম রুহুল-মাদানিয়্যাহ গ্রন্থে শায়খ মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়–সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর মত ব্যবহার করা হতো। নারীর মর্যাদা এত

---

২৩৬. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

নীচ ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হতো। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবদেও মত নারীদেরকে এত অধিক অপমানিত ও নির্যাতিত করত না। কন্যা-সন্তান জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক বলে মনে করত। নবজাত কন্যা-সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তাকে জীবন্ত কবর দিয়ে হত্যা করা হতো। পণ্যদ্রব্যের মত তাদেরকে বিক্রিও করা হতো এবং পশুর বদলে তাদেরকে বিনিময় করা হতো। আরবদের ধারণা অনুসারে কন্যা-সন্তান অপমান ও অমর্যাদার কারণ ছিল বলে তারা এই সকল কাজ করত।[২৩৭]

পবিত্র কুরআন তাদের এ অনুভূতি ও মনোবৃত্তির অতি সুন্দর চিত্র অংকন করেছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

"তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং মনোকষ্টে তার হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। লোক চক্ষু থেকে সে নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকে। কারণ এ দুঃসংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে তখন ভাবতে থাকে, লাঞ্ছনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবে না মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে ?"[২৩৮]

হযরত উমর রা. বলেন :

وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ،

"আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোনো মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন, তাদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন এবং যা কিছু অংশ নির্ধারণ করা দরকার ছিল তা করলেন।"[২৩৯]

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এত চরমে পৌঁছেছিল যে, কোনো ব্যক্তির ঘরে কন্যাসন্তান জন্ম নিলে সে সেটিকে অলক্ষুণে ঘর মনে করে পরিত্যাগ করতো। এর চেয়েও বড় কথা, মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়ামায়া ও ভালোবাসার অনুভূতি ছিল না। তাই তারা কন্যাসন্তানদের জীবিত দাফন করতো। এ নিষ্ঠুরতার প্রকাশ এমন সব মানুষের তরফ থেকে হতে যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালোবাসার উৎস মনে করা হয়। এ প্রসংগে এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যা শোনামাত্রই হৃদয় কেঁপে ওঠে।[২৪০]

এক ব্যক্তি নবী (স.)-কে তার জাহেলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বললো, "আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল। আমি যখনই তাকে আহ্বান করতাম সে বড় আনন্দচিত্তে আমার কাছে দৌড়ে আসতো। এভাবে একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো। আমি তাকে সাথে করে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিলো।" ঘটনাটি শুনে নবী (স.)-এর দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। এমনকি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিঁজে গেল।"এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত দু'টি সন্তানের জন্য হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো।[২৪১] কায়েস ইবনে আসেম জাহেলী যুগে আট দশটি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করেছিল।

এমনিভাবে নারী পুরুষের নিকট হস্তচালিত যন্ত্রের মত ছিল, যা সে নিজ খেয়াল-খুশিমত ব্যবহার করে থাকে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পয়গাম ও পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী নিয়ে

---

২৩৭. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬

২৩৮. কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, (ইউ কে, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০১৪), সূরা আন নাহল (১৬) : ৫৮-৫৯

২৩৯. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১০৮, হা.নং- ১৪৮৯

২৪০. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬.

২৪১. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮; আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, *সুনানুদ্ দারেমী*, (করাচী: কাদীমী কুতুবখানা), ১ম খণ্ড, পৃ ১৪

আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নারীদের উপর এমন অমানষিক নির্যাতন চলছিল। এর পূর্বে কোন পুরুষ তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার কোন পুরুষ আত্মীয় তাকে আপন চাদর দ্বারা ঢেকে ফেলত যেন লোকে তাকে দেখতে না পায়। বিধবাটি সুন্দরী হলে সে আত্মীয় তাকে বিবাহ করত। আর সুন্দরী না হলে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা হতো এবং কারাগারে মৃত্যুর পর সে তার সম্পত্তি দাবি করত।

কোন পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ইচ্ছা করলে প্রথমা স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাত। ফলে তাকে প্রদত্ত সকল সম্পদ স্বামীকে দিয়ে সে তার নিকট হতে নিস্তার লাভ করত। এই সম্পদ সে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণে ব্যবহার করত।

মদিনা শরিফে মৃত ব্যক্তি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তার বিধবা স্ত্রীরও অধিকারী হত। বিধবা তার নিকট আমানতস্বরূপ গচ্ছিত থাকত এবং মুক্তিপণ না দেয়া পর্যন্ত সে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা প্রদান করত।[২৪২]

সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না। তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হয়ে যাযাবররূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদেরকে ধরে নিয়ে বিয়ে করত। এজন্যই আরবরা কন্যা সন্তানদের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পসন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হতো। এ কারণেই আরবরা কন্যাদেরকে জীবিত কবর দিয়ে হত্যা করত।

This revolting custom prevailed extensively until it was suppressed by Muhammad peace be on him. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দমন না করা পর্যন্ত এই নিদারুণ ঘৃণ্য প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

অজ্ঞতার যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার পুত্র মাতার উত্তরাধিকারী হতো। সে নিজেই তাকে বিবাহ করতে পারত। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন লোকের নিকট বিবাহ দিতে পারত আর সে তার বিবাহ বন্ধও করতে পারত। মাতা অন্য স্বামী গ্রহণ করতে চাহলে, পুত্রকে মুক্তিপণ দিতে হতো।[২৪৩]

নিপীড়িত এ নারী শ্রেণীকে যখন তারা বেঁচে থাকার অধিকার দিতো তখন তার জীবনের সব অধিকার ছিনিয়ে নিতো। বিয়ের কোনো সীমা সংখ্যা ছিল না। যতো সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করতো। ইসলাম কবুল করার সময়ে ওয়াহাব আসাদী রা.-এর দশজন স্ত্রী ছিল। গাইলান সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তার দশজন স্ত্রী ছিল।[২৪৪]

একই ভাবে তালাকের ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই চাইতো এবং যতবার চাইতো স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই রুজু বা প্রত্যাহার করতো। এভাবে পুরুষ তার স্ত্রীকে সারা জীবনভর উৎপীড়ন করতে পারতো। এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সে তার স্ত্রীকে নাজেহাল করার জন্য বললো : "আমি তোমাকে সাথেও রাখবো না আবার পরিত্যাগও করবো না। স্ত্রী জানতে চাইলো, তা সে কিভাবে করবে ? সে বললো: আমি তোমাকে তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার প্রাক্কালে রুজু করবো। এরপর আবার তালাক দেব এবং ইদ্দত শেষ না হতেই রুজু করবো।"[২৪৫]

---

২৪২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭;Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Aziah Al-Hibri: *Women and Islam*, (Oxford, England, Pergamon press), p. 222

২৪৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam*, ibid, P. 15

২৪৪. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২০; আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক,

২৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.২০; তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ,

স্বামীর জীবদ্দশায় সে স্বামীর অধীন থাকতো। স্বামীর মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারীরা তার পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব লাভ করতো। তারা নিজেরা কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো অথবা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতো। তাকে আদৌ বিয়ে না দেয়ার ব্যাপারেও তাদের এখতিয়ার ছিল।

বিধবার সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য তাকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বঞ্চিত করতো। অনেক সময় কোনো অল্পবয়স্ক শিশুর বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত তার পুনর্বিবাহ ঠেকিয়ে রাখা হতো, যাতে উক্ত শিশু বয়োপ্রাপ্ত হয়ে তাকে বিয়ে করতে পারে।[২৪৬]

এমন কি সৎমাকে বিয়ে করাও তাদের কাছে কোনো দূষণীয় ব্যাপার ছিল না। আবু বকর জাস্‌সাস লিখেছেন,

"জাহেলী যুগে সৎমাকে বিয়ে করা বহুল প্রচলিত ছিল।"

ঘটনাক্রমে কোনো সুন্দরী রূপসী এবং সম্পদশালী ইয়াতীম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেতো তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করতো, কিন্তু ঠিকমতো মোহরানা আদায় করতো না।

ওহুদ যুদ্ধের পরের একটি ঘটনা। সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী (স.)-এর কাছে এসে এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, ওহুদ যুদ্ধে সাবেত শহীদ হয়েছেন। তার দুটি মেয়ে আছে। কিন্তু সাবেতের ভাই তার পুরো সম্পদ হস্তগত করেছে। তার দুই মেয়ের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি। এখন বলুন, তাদের বিয়ে হবে কিভাবে ?

ইসলাম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অংশ নির্দিষ্ট করে দিলে আরবরা অত্যন্ত বিস্মিত হলো। তারা নবি (স.)-কে জিজ্ঞেস করলো: হে আল্লাহর রাসূল ! নারী কি অর্ধেকের হকদার ? অথচ সে না জানে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতে, না পারে আত্মরক্ষা করতে।[২৪৭]

আরব রমণীর স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার ছিল না। পিতা বা তার কোন পুরুষ আত্মীয়ের তার স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। মুতআ-বিবাহ (নারী পুরুষের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত সময়ের জন্য বিবাহ) এবং বহুপতি গ্রহণের প্রথাও তৎকালে আরবে প্রচলিত ছিল। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা, এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকেও বিবাহ করতে পারত। ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভাইবউকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারত। এটি বস্তুত স্ত্রীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব নারীর মর্যাদা একেবারে হীন করে দিয়াছিল এবং নারী ভূ-সম্পত্তি ও লাখেরাজ সম্পদরূপেই পরিগণিত হতো।

জগতের তৎকালীন সভ্যতায় যেমন বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তদ্রুপ আরবেও বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি নীতি ও ধর্মের বিধানে তার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না; বরং সামর্থ্য থাকলে যে যত খুশি, বিবাহ করতে পারত।[২৪৮]

তখনকার আরবে প্রতিষ্ঠিত পতিতালয় না থাকলেও নারী-পুরুষের মধ্যে শর্তাধীনে ও অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য পতি-পত্নী সম্পর্ক অবাধেই স্থাপিত হতে পারত। এতদ্ব্যতীত সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে পেশাধারী নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তারা অবাধে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করত এবং তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত আছে বলিয়া জনগণ মনে করত।

---

২৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২০

২৪৭. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১

২৪৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
আধুনিক যুগ ও নারী

আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবাত্মক যে আন্দোলন শুরু হয়, তা হল "নারী মুক্তি আন্দোলন"। এর প্রকৃতি অসাধারণভাবে গতিশীল। এ মহাপ্লাবণ উত্থিত হয়ে মানব সমাজে যে বিপর্যয় সাধন করেছে, সমাজ বিজ্ঞানীদের এটা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে দেখা কর্তব্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ বিপ্লব শুরু হয় এবং বিদ্যুৎ গতিতে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মের বিধি-নিষেধ এটা একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে। নারী পুরুষের অবাধ মিলনের পথে যত অন্তরায় ছিল, এতে এটা আগুন ধরিয়ে দেয়।

বর্তমান শতাব্দীতে এ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে এবং এর বিষময় ফলাফল পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে। এর পরিণাম এত বিপদসঙ্কুল, বিভ্রান্তিকর ও আতঙ্কজনক হয়েছে যে, এর বর্ণনা দিতেও শরীর শিউরে ওঠে। এর কুফল দর্শনে এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও আজ শঙ্কিত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন এবং প্রমাদ গুণছেন।[২৪৯]

কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, যে আপদ হতে রক্ষার জন্য আজ পাশ্চাত্য জগত উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, মুসলিম বিশ্ব সেটাই এখন ক্রমশ বরণ করে নিতে উদ্যত হয়েছে। পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে অফিস-আদালতে, কল-কারখানার কাজে টেনে আনা হচ্ছে এবং আনন্দময় গার্হস্থ্য জীবন বর্জনে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পর্দা-প্রথা বিসর্জন দিয়ে নারী পুরুষের অবাধ মিলনের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। সমাজ দরদীদের অনতিবিলম্বে এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া আবশ্যক।[২৫০]

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর স্থান ও মর্যাদা কিরূপ ছিল-আমরা তা জানি। এমতাবস্থায় নারী মুক্তি আন্দোলন অতি স্বাভাবিক বলেই আমরা মনে করি। খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ নারী মুক্তির যে আন্দোলন শুরু করলেন তখন তাদের সম্মুখে সেই ভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং সামাজিক রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল যা মানবাত্মাকে স্বভাববিরুদ্ধ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে উন্নতির সকল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের নারী মুক্তির পদক্ষেপ এমন পথে পরিচালিত হল, যার শেষ পরিণতি বর্তমানে সর্বনাশা পর্যায়ে পৌঁছেছে।

---

২৪৯. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮; ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; কবিতা সুলতানা, *ধন্য আমি নারী*, (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ৩৪

২৫০. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৮; ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এ কথা সত্য। বিশেষ করে একটি জাতির উন্নতির গোড়াতেই হলো নারী। মায়েরা সন্তানদেরকে যেভাবে গড়ে তোলেন, একটা জাতি সেভাবে গড়ে উঠে।

কিন্তু নারীর এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি পুরুষরা অনেক সময় দেয় নি। ইতিহাসে নারীর সামাজিক মর্যাদায় প্রচুর উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে গত পাঁচশত বছরের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এ সংক্রান্ত চারটি পর্যায়ে রূপ বদলাতে দেখা যায়।[২৫১]

প্রথম পর্যায়ে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। এ সময় নারীর উপর চলে অবিচার ও অত্যাচার। অত্যাচার এত লোমহর্ষক ছিল যে, নারীকে মানুষ আত্মাধারী প্রাণী বলে মনে করলে এমন অত্যাচার করা সম্ভব হতো না। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম নগরীতে নর সমাজ তাদের Council of the wise সভার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, "Women has no soul" অর্থাৎ "নারীর কোন আত্মা নেই"। তার মানে আত্মাহীন আবর্জনাকে যেমন পুড়িয়ে ফেলা যায়, নারীকেও তা করা যায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে দোষী নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারাকে আইনসঙ্গত করা হয়। এর ফলে খৃস্টান জগত তাদের নব্বই লক্ষ নারীকে আগুনে পুড়িয়ে বিচার করে।

গ্রীক সমাজে নারীর অবস্থা সক্রেটিসের কথায় ফুটে ওঠে। তার ভাষায় নারী হলো জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। চীন সভ্যতায় নারীকে Waters of Woe বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' বলা হতো। নারী ছিল স্বামীর পরিবারের সম্পত্তি। সুতরাং স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে অন্যের উপ-পত্নী হিসেবে বিক্রয় করতে পারতো। ভারতেও নারীর অবস্থা ভাল ছিল না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে পুড়ে মরতে হতো। মোটকথা এই প্রথম পর্যায়ে গোটা বিশ্বেই নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। নারী ছিল কাজের দাসী আর ভোগের বস্তু। প্রয়োজনে কাজ নেওয়া যায়, ভোগ করা যায়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া যায় অথবা আবর্জনার মতো পুড়িয়ে ফেলা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো নারী মুক্তির কাল। প্রথম পর্যায়ের অনিবার্য ফল হিসেবেই নারীর মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। নারীর আত্মা স্বীকৃত হয়। ক্রমান্বয়ে এক পর্যায়ে পাশ্চাত্যে নারীর ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে নারী পায় স্বাধীনতা, বাঁচার অধিকার, মানুষ হিসেবে মর্যাদা।

তৃতীয় পর্যায় হলো নারী প্রগতির কাল। এ পর্যায়ে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ মুক্তির স্বাদ পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মুক্তি মানে সকল নিয়ম শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি নয়। এ কথা তারা ভুলে গেল। ফলে স্বাধীনতার ব্যাপ্তি নরের দাসত্ব ও বিবাহের বন্ধন অতিক্রম করে যৌন স্বাধীনতা পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল। যৌনানন্দ ভোগ করার জন্য স্বামীত্বের গণ্ডিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরুষদেরকে যৌন খেলনা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পাশ্চাত্যের সমাজে তা স্বীকৃত হলো। আর এ প্রগতির হাওয়া বয়ে গেল বিশ্বের সর্বত্র।

এবার এর পরিণতি লক্ষ্য করুন। পূর্বে পুরুষরা নারীকে উপ-পত্নী হিসেবে ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তার একটা সীমা ছিল। কারণ, অনায়াসে মেয়ে পাওয়া যেত না; নারী ছিল ঘরে আবদ্ধ। কিন্তু এখন? পুরুষদের পূর্বের ভোগ প্রবৃত্তি তো এখনো আছেই। অপরদিকে নারীরাও যৌন স্বাধীনতা ও প্রগতির সনদ নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আসছে। ফলে মিলনটি হয়ে পড়েছে অবাধ ও স্বাভাবিক। আর নরকে আকর্ষণ করার প্রতিযোগিতায় নারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে দেহের মহড়া, উলঙ্গপনা, নাইট ক্লাবের জলসা ইত্যাদি।

এর সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির ফলে পাশ্চাত্যের যৌন সম্পর্ক হয়ে পড়ে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি সংসার করতে চায়,

---

২৫১. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা; ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

তখনি শুধু বিয়ের প্রশ্ন ওঠে। এতে করে এক পুরুষ বহু নারীর সঙ্গে এবং এক নারী বহু পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনের অবাধ প্রচলন হয়। এতে সৃষ্টি হয় দুরারোগ্য ব্যাধি। মেয়ে পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ন ও ভাঙন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মস্তিস্কবিকৃতি ও আত্মহত্যা। নারী তার পুরুষ আর পুরুষ তার নারী বদলের পালায় দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে মারামারি ও হত্যা। পাশ্চাত্য জগতে যৌন সংক্রান্ত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা অগণিত। কুমারী মাতৃত্বের হিসেব নেই।[২৫২]

যৌন স্বাধীনতায় পাশ্চাত্যের পারিবারিক জীবন আজ নরকে পরিণত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী কোন মতেই পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল থাকতে পারে না। স্ত্রী জানে, অপর নারীর সাথে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্বামীকে যে কোন সময় হারাতে পারে। আবার স্বামীও জানে অপর পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় সে তার স্ত্রীকে যে কোন মুহূর্তে হারিয়ে বসতে পারে। কারণ, অন্যের সাথে যৌন মিলন যেখানে অবাধ এবং সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ফলে আস্থাশীল অনাবিল পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্যে এখন এক বিরল বস্তু। সুতরাং সেখানে বিবাহ ভাঙন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোন বিয়ে যদি কোনক্রমে পাঁচ কি দশ বছর টিকে যায় তবে তা হয় এক আশ্চর্য ঘটনা। এ আশ্চর্য ঘটনাকে ঘটা করে উদযাপন করা হয়। মোটকথা, বিয়ে যদি হয়ই, তবে তা ভাঙাই স্বাভাবিক, আর তা টিকে থাকা অস্বাভাবিক। ভঙ্গুর পরিবারের সন্তান প্রতিপালন এখানে পাশ্চাত্যের এক বিরাট সামাজিক সমস্যা।

নারী স্বাধীনতার মাধ্যমে নারী স্বামীত্বের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নারী প্রগতির মাধ্যমে নারী সমাজ এখন সামগ্রিক পুরুষ সমাজের দাসত্বে আবদ্ধ হয়েছে। নারীকে এখন অফিস আদালত, কল-কারখানা এবং মাঠে-ময়দানে পুরুষের মতো কাজ করতে হয়। সন্তান ধারণ নারীকেই করতে হয়। অফিস থেকে ফিরে ঘরে সন্তানদের দেখতে হয় নারীকেই, রান্নাঘর সামলাতে হয়, পুরুষের আনন্দের জন্য বিছানা ও ঘর নারীকেই সাজাতে হয়, স্বামীকে আনন্দ দিতে হয়, সকালে আবার স্বামীর মতোই কাজ করতে অফিসে যেতে হয়, অফিসে গিয়ে সহকর্মী ও অফিসকর্তা (বস্)-এর হুকুম পালন করতে হয়।[২৫৩]

পাশ্চাত্যের নারীদেহ আজ পুরুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী। ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত পোশাক ও দৈহিক লাবণ্য দ্বারা পুরুষকে আনন্দ দিতে হয়। পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনে নারীদেহ আজ বিজ্ঞাপনের বস্তু। নারী প্রগতি পুরুষের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুযোগ করে দিয়েছে। ইচ্ছা করলেই একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে নেওয়া যায়। পরিত্যক্ত নারীকে আরেক পুরুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। কিন্তু এ পালা ততক্ষণ চলতে পারে, যতক্ষণ নারীর লাবণ্য থাকে। লাবণ্য যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সমাজে সে অবহেলিত আবর্জনার মতো পড়ে থাকে। শুকনো ফুলের দিকে কোন ভ্রমর আর ফিরে তাকায় না? কি যে নিঃসঙ্গ অভিশপ্ত এ জীবন, তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

এরপর হলো চতুর্থ পর্যায়। এ পর্যায়ে নারী প্রসঙ্গে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায় । একটি দল আরো বেশী নারী প্রগতির প্রবক্তা। নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি, নারী প্রগতি ইত্যাদির নামে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে অনেকেই নারী প্রগতির কুফল লক্ষ্য করে নৈতিক মূল্যবোধ এবং সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। এমনকি পাশ্চাত্যের অনেক বুদ্ধিজীবীও নারী প্রগতির করুণ পরিণামের কথা তুলে ধরছেন। এ হলো সমকালীন নারী ইতিহাসের চারটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আজ যখন নারী ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়ে দাঁড়িয়ে তখন একদিকে অতি প্রগতিবাদিরা অদূরদর্শীর মতো আরো বল্গাহীন নারী স্বাধীনতার কথা বলছেন এবং অপরদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তাশীলরাই নারী প্রগতির ভয়াবহ পরিণামের পর্যালোচনা করছেন।

---

২৫২. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৫৩. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

এরূপে ওহীর জ্ঞান বিবর্জিত মেঘাচ্ছন্ন দুনিয়া পরম সম্মানিত বনী আদমকে হেয় ও লাঞ্ছিত করল। অসঙ্গত সীমালঙ্ঘন ও চরম ন্যূনতার মধ্যে সে বিবর্তিত হতেই রইল এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনের যোগ্যতাই তার রইল না। সুতরাং নারী মুক্তি ও স্বাধীনতার যে প্রবল আন্দোলন পাশ্চাত্যে জন্মলাভ করে, এ হতে প্রাচ্য রেহাই পেল না। ফলে অধিকাংশ মুসলিম দেশসহ বিশ্বময় নারী জাতির চরম পরিণতির কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো-

নৈতিক অনুভূতির বিলুপ্তি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে Henry Bataille, Pierre Louis, Paul Adam প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যুবক-যুবতীদের স্বেচ্ছাচারিতায় সাহস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এর ফলে নৈতিকতাবোধের লেশমাত্র যা মানব মনে অবশিষ্ট ছিল এবং যা তার হৃদয়ের গভীর কোণে কখনও কখনও কিছুটা দ্বিধা সংকোচের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতো, তাও একেবারে তিরোহিত হয়ে যায়।

পল এ্যাডাম তার La-Morale-De-L'a Amour গ্রন্থে বলেন-[২৫৪]

দেহ সম্ভোগের বাসনাকে প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী দূষণীয় মনে করা হয়। অথচ প্রকৃতিগতভাবে এটা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রয়েছে এবং এতে পাপ নেই। ল্যাটিন জাতির মারাত্মক দুর্বলতা হল, তাদের প্রেমিক-প্রেমিকারা স্পষ্ট করে বলতে সংকোচবোধ করে যে, তাদের মিলনের উদ্দেশ্য নিছক দৈহিক বাসনা চরিতার্থ করে সুখ-সম্ভোগ ও চরম আনন্দ লাভ করা।

তরুণ-তরুণীরা যা কিছুই করুক না-কেন এটা যেন মন ও বিবেকের পরিপূর্ণ পরিতুষ্টির সাথে তারা করতে পারে এবং সমাজও যেন তাদের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায় রুষ্ট না হয়ে এটাকে নৈতিকতার দিক দিয়ে সঙ্গত ও সমীচীন মনে করে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তৎকালের সাহিত্যিকগণ ব্যক্তিগত ঔদ্ধত্য, লাম্পট্য ও বলগাহীন স্বাধীনতাকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

এ যুগে শিল্প বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি সকল প্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সম্পদ অর্জনের সীমাহীন নিরংকুশ অধিকার লাভ করে এবং সমষ্টির ক্ষতিসাধন করেও ব্যক্তির ধনোপার্জনের স্পৃহাকে বৈধ ও পবিত্র বলে মনে করা হয়। এতে ব্যক্তির স্বার্থের বিপক্ষে সমষ্টির অধিকার রক্ষার কোন উপায়ই রইল না। এই সুযোগে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রঙ্গমঞ্চ, নৃত্যশালা ও চলচ্চিত্রের যাবতীয় কার্যকলাপ সুন্দরী নারীকে কেন্দ্র করেই চলতে থাকে। নারীকে কামোদ্দীপক মূর্তিতে ও উলঙ্গ আকারে লোকদের নিকট উপস্থাপনা একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়।

আবার কতেক লোক নারীকে ভাড়ায় খাটাতে আরম্ভ করে, এতে পতিতাবৃত্তি একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অপরদিকে যুবতীর দল নব আবিষ্কৃত যৌন উত্তেজক নতুন নতুন বেশ-ভূষা ও প্রসাধনে সুসজ্জিত হয়ে মন ভোলানো ঠমকে সমাজে বিচরণ করতে শুরু করে। অপরিণামদর্শী যুবকদল সতৃষ্ণ নয়ন ও মন নিয়ে তাদের পেছনে ছুটতে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন বিভাগই যৌন উন্মাদনার উপায়-উপকরণ হতে মুক্ত থাকেনি। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপনাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়, নারীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি-এর এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হোটেল, রেস্তোরা, দোকানের শো-রুম প্রভৃতিতে নারী মূর্তি এমনভাবেই রাখা হয়েছে যেন পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

স্বাধীনতার এই ধারণা আবার এই যুগে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্ম দেয়; মানবীয় দুর্বলতামুক্ত কোন ঊর্ধ্বতন শক্তি ও কর্তৃত্ব এই শাসন ব্যবস্থা মানে না। এর মতে কোন প্রস্তাব যতই মন্দ ও অসঙ্গত হোক না-কেন, শতকরা উনপঞ্চাশজন পণ্ডিত বিরোধীতা করলেও একান্নটি গাধার সমর্থনে এটা আইনে পরিণত

---

২৫৪. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৭৯

হয়। এমতাবস্থায় সমাজ বিরোধী নৈতিকতা ধ্বংসকারী আইন প্রণয়নে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদেরকে বাধা দেবার কেউ থাকে না।[২৫৫]

সমাজে যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ব্যাপক প্রসারের অপর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও অপরাপর ক্ষেত্রে চাকুরী গ্রহণ করছে। এই সকল স্থানে পুরুষের সাথে তাদের দিবারাত্র মেলামেশার সুযোগ হচ্ছে।

এটা নারী-পুরুষের নৈতিক মানকে অতি নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পুরুষ অগ্রবর্তী হয়ে কিছু করতে চাইলে এটা রোধ করার ক্ষমতা নারীর থাকে না। ফলে উভয়ের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং এটা নৈতিকতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে।

অশ্লীলতার আধিক্য

নারী-প্রগতির করুণ কাহিনী এখানেই শেষ নয়। আরও একটু অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করুন। পেশাহীন পতিতাবৃত্তি দৈনন্দিন বৃদ্ধিই পেয়ে চলছে। এইজন্য পেশাধারী পতিতাবৃত্তি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। কারণ আজকাল যুবকগণ পেশাধারী পতিতাদের অপেক্ষা তথাকথিত ভদ্র যুবতীদের সাথে যৌন সম্ভোগে অধিক আনন্দ পায় বলে মনে করে এবং এজন্য পেশাদারী পতিতাদের গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ভিয়েনায় পেশাধারী পতিতাবৃত্তির পড়ন্ত অবস্থার প্রধান কারণ বর্ণনা করে এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়-

"That owing to the change in the sex morals now in vogue, the young man no longer has the need which once existed for the use of prostitutes."[২৫৬]

বর্তমানে যৌন নীতির পরিবর্তনের ফলে পতিতাদেরকে ব্যবহার করার যে আবশ্যকতা যুবকদের এক সময়ে ছিল, তা এখন আর নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সের এটর্নি জেনারেল মশিয়ে বুলো (M, Bulot) এক রিপোর্টে বলেন,

"যে সকল নারী তাদের দেহ খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে, তাদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। কিন্তু এখানকার দেহ-ব্যবসায়ী নারীদের সাথে ভারত-উপমহাদেশের বার নারীদের তুলনা করলে চলবে না। ফ্রান্স একটি সুসভ্য ও উন্নত দেশ। এখানকার যাবতীয় কার্য ভদ্রতা ও সুব্যবস্থার সাথে ব্যাপক আকারে করা হয়ে থাকে। এখানে এ দেহ-ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেওয়া হয়। সংবাদপত্র, চিত্র, কার্ড, টেলিফোন, ব্যক্তিগত আমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি সর্বপ্রকার শিষ্টাচারসুলভ পন্থায় গ্রাহকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। মানুষের বিবেক কখনও এ সমস্ত কার্যের জন্য তিরস্কার করে না; বরং যে সকল নারী এ ব্যবসায়ে অধিকতর ভাগ্য গড়ার সুযোগ পায়, তারাই অধিকাংশ সময়ে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করতে পারে। গ্রীক সভ্যতার যুগে এ প্রকার নারীর যেরূপ উন্নতি হয়েছিল, তাদেরও তদ্রূপ হয়েছে।"

একবার চিন্তা করুন, মানবতার দুর্গতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে?

ফরাসী সিনেটের অন্যতম সদস্য মশিয়েঁ ফার্ডিনান্ড ড্রিফু (M. Ferdinand Dreyfus) বলেন,

"পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এটির এজেন্সি দ্বারা যে আর্থিক লাভ হয়, তাতে এটি একটি ব্যবসায় এবং সুসংগঠিত শিল্পে পরিণত হয়েছে। এর কাঁচামাল সরবরাহ করার এজেন্ট স্বতন্ত্র, ভ্রাম্যমান এজেন্ট স্বতন্ত্র। এগুলোর জন্য যথারীতি বাজার আছে। তরুণী ও অল্প বয়স্কা বালিকাদেরকে এ

---

২৫৫. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩

২৫৬. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৮-৮৯; Reutter-Dawn, Jan-7, 1952.

ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যরূপে আমদানী-রপ্তানী করা হয়ে থাকে। এখানে দশ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের চাহিদা অত্যন্ত বেশী।"

পল ব্যুরো বলেন,

এটা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সুসংগঠিত উপায়ে বেতনভোগী উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মচারী দ্বারা এটা পরিচালিত হচ্ছে। প্রচারক, লেখক, বক্তা, চিকিৎসক, ধাত্রী ব্যবসায়ী এবং পর্যটক এখানে চাকুরী করে। এতে বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়া হয় এবং প্রদর্শনীর নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।[২৫৭]

এতদ্ব্যতীত রাস্তা-ঘাট, চায়ের দোকান, হোটেল, নৃত্যশালা ইত্যাদিতে প্রকাশ্যভাবে যৌন সম্ভোগ চলে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যে সমস্ত দেশপ্রেমিকা নারী ফরাসী দেশের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বীরগণের মহান সেবা করে পিতৃহীন জারজ সন্তান লাভ করেছিল, তারা War God Mothers (যুদ্ধমাতা দেবী)-এর সম্মান সূচক উপাধিতে ভূষিত হয়।

পল ব্যুরো আরও বলেন,

অধিকাংশ সময়ে রঙ্গমঞ্চে এমন নারীকে আনয়ন করা হয়, যার দেহে বস্ত্রের কোন লেশমাত্রও থাকে না।

আমেরিকায় যে সমস্ত নারী পতিতাবৃত্তিকে তাদের স্থায়ী জীবিকা অর্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা চার হতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে। কিন্তু আমেরিকার পতিতাদেরকে এদেশের পতিতাদের অনুরূপ মনে করা চলবে না। কারণ তারা বংশানুক্রমে পতিতা নয়। এমনও নারী আমেরিকার পতিতা, যে গতকাল পর্যন্ত কোন স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করেছিল। অসৎ সঙ্গে পরে চরিত্র নষ্ট হয়েছে এবং পতিতলয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে সে কিছুকাল কাটাবে। তারপর পতিতাবৃত্তি ছেড়ে কোন অফিস বা কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করবে। জরীপে জানা গেছে, আমেরিকার পতিতাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহ-চাকরাণীদের মধ্য হতে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করে । বাকী পঞ্চাশজন হাসপাতাল, অফিস ও দোকানের চাকুরী ছেড়ে পতিতালয়ে যায়। সাধারণত পনের বিশ বৎসর বয়সে এই ব্যবসায় শুরু করা হয়ে থাকে এবং পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় পতিতালয় ত্যাগ করে আবার তারা স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করে।[২৫৮]

নারী মুক্তির নামে কি জঘন্য অপকর্ম চলছে! পবিত্র কুরআন-হাদীসে নারী জাতিকে অতীব উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আর জগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সভ্য বলে গর্বিত দেশসমূহে নারী প্রগতির নামে তাদের কি অশেষ দুর্গতি হয়েছে। অথচ তারা তীব্র সমালোচনা করে থাকে যে, ইসলাম নারী জাতিকে কোন মর্যাদা দান করে নি। এ পাশ্চাত্য দেশসমূহে পতিতাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় বরং এটা একটি সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার নিউইয়র্ক, রিউ-ডি জেনিরিও, বুয়েন্স আয়ার্স এ ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। এ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সংস্থা আছে। এর সভাপতি ও সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়ে থাকে। যুবতীদেরকে ফুসলিয়ে আনার জন্য হাজার-হাজার দালাল নিযুক্ত আছে।

পতিতালয় ছাড়াও সেখানে বহু Assignation House এবং Call-House রয়েছে। কোন তথাকথিত ভদ্র পুরুষ ও নারী পরস্পর মিলিত হতে চাইলে এর সুব্যবস্থা করাই এগুলোর উদ্দেশ্য। অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি শহরে এরূপ ৭৮টি গৃহ আছে এবং অপর দুটি শহরে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩টি অনুরূপ গৃহ রয়েছে।"[২৫৯]

---

২৫৭. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮৯-৯০

২৫৮. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১; Prostitution in the U.S.A, p. 64-69.

২৫৯. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১; Prostitution in the United States, p. 38.

এই সমস্ত গৃহে কেবল অবিবাহিত নর-নারীরাই গমন করে না; বরং বহু বিবাহিত নর-নারীও গমন করে থাকে। নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ চারিত্রিক ও দৈহিক দিক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালন করে না। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থায়ও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে শান্তিপূর্ণ ও বিবাহিত জীবন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি বৎসর সাতাত্তর হাজার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে Diocesan Conference -এ উপস্থাপিত রিপোর্টে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয়,

At least in every eight children from England and Wales one is conceived outside wedlock, one hundred thousand women in England and Wales are becoming pregnant outside of marriage every year. Of all the girls who marry under twenty years of age no less than 40 percent are already pregnant on their wedding day.

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, বিবাহ বন্ধনের পূর্বে তাদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের গর্ভবাস হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের এক লক্ষ নারী বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়। বিশ বছরের কম বয়সে যে সব বালিকার বিয়ে হয়, তন্মধ্যে বিয়ের দিন যারা গর্ভবতী থাকে, তাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিচে নয়।[২৬০]

যৌন ব্যাধি

সিফিলিস-প্রমেহ : সৃষ্টিগতভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি উভয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। নারীর দৈহিক গঠন, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, লাবণ্য, কণ্ঠস্বর, চলনভঙ্গি যুবকদের আকর্ষণ না করে পারে না। তদুপরি সমাজে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার পত্রের প্রসার, নারীদের উলঙ্গ ছবি, চলচ্চিত্র, নৃত্য-গীতি ইত্যাদি যুবক-যুবতীদের যৌন উন্মাদনা সীমা অতিক্রান্ত করে দেয়। মানবীয় ইন্দ্রীয়সমূহে প্রবল উত্তেজনা ও পরম তৃষ্ণার সঞ্চার করে। এতে যুবক-যুবতীরা সহজেই অতিরিক্ত যৌন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং নানাবিধ রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে নৈতিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে বহু যুবক-যুবতী অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আমেরিকার শতকরা নব্বইজন অধিবাসী রতিজ ব্যাধিতে আক্রান্ত। সেখানকার সরকারী হাসপাতালগুলোতে প্রতি বছর গড়ে দু'লক্ষ সিফিলিস এবং এক লক্ষ ষাট হাজার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। পঁয়ষট্টিটি চিকিৎসালয় কেবল এই রোগসমূহের চিকিৎসার জন্যই নির্ধারিত আছে। কিন্তু সরকারী চিকিৎসালয় অপেক্ষা বেসরকারী চিকিৎসকের নিকট রোগীর ভীড় আরও অনেক বেশী হয়ে থাকে। এ সকল চিকিৎসালয়ে শতকরা ৬১ জন সিফিলিস ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হয়ে থাকে।[২৬১]

আমেরিকায় প্রতি বৎসর ত্রিশ-চল্লিশ হাজার শিশু জন্মগত সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। কঠিন জ্বর ছাড়া অন্যবিধ রোগে যত মৃত্যু ঘটে, তন্মধ্যে সিফিলিস রোগজনিত মৃত্যুর হারই অত্যধিক।

প্রমেহ রোগে যুবকদের শতকরা ৬০ জনই আক্রান্ত হয় বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এতে বিবাহিত অবিবাহিত উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে সমস্ত বিবাহিতা নারীদের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিস জীবাণু পাওয়া যায়।[২৬২]

ফ্রান্সের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ল্যারেড (Dr. Laredde) বলেন,

---

২৬০. ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

২৬১. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৬; Encyclopedia of Britannica, part-23, p 45.

২৬২. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬; Dr. Lowry, Herself, P. 204

ফ্রান্সে প্রতি বছর কেবল সিফিলিস ও তজ্জনিত রোগে ত্রিশ হাজার লোক মারা যায়। জ্বরের পর এটাই হচ্ছে মৃত্যুর সর্ববৃহৎ কারণ। একটি মাত্র রতিজ রোগেরই এই অবস্থা। এতদ্ব্যতীত এই ধরনের আরও অনেক ব্যাধি আছে।

এইড্‌স : অবাধ যৌন মিলনের ফলে 'এইড্‌স' নামক একটি রতিজ রোগ সাম্প্রতিকালে দেখা দিয়েছে। এটা এত মারাত্মক যে, এই রোগে আক্রান্ত রোগীর কোন আরোগ্য নেই।

Eight years have passed and the U.S.A. has found no cure for AIDS.

আট বছর অতিবাহিত হয়েছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইডস-এর কোন ঔষধ আবিষ্কার করতে পারে নি।

আমেরিকাতে সমকামে অভ্যস্ত লোকদের মধ্যে এটা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় বলে সমকাম হতেই এর উৎপত্তি বলে ধারণা করা হত। কিন্তু এ ধারণা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। সমকাম ছাড়াও নারী-পুরুষের অবাধ যৌন মিলনেই এর উৎপত্তি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এ রোগের জীবাণু একবার দেহে সংক্রমিত হলে দেহ একেবারে বিকল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য রোগে অতি সহজেই আক্রান্ত হয়। এর জীবাণু অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়ে পড়ে।

There is no cure. AIDS is a dead-end street এটা AIDS Kill. এইড্‌সের কোন প্রতিষেধক নেই। এটা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ; এইড্‌স মেরে ফেলে।

গবেষকগণ এইড্‌স রোগকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ এটা তাদের সম্মুখেই সৃষ্টি হয়েছে। অপরাপর ব্যাধি দু'হাজার বৎসর পূর্ব হতেই চলে আসছে এবং অনেক প্রাণহানি ঘটিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু করার নেই। কিন্তু এইড্‌সের বেলায় Indian Council for Medical Research-এর অন্যতম প্রধান ডাক্তার প্রেম রামচন্দ্রন বলেন,

"Here we are in a absolutely advantageous position, we know we can prevent it by sexual behavior change. The idea being that before this becomes an unmanageable epidemic, it's for Caution."

এইড্‌সের বেলায় আমরা নিতান্ত সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছি। আমরা জানি, যৌন মিলনের রীতি পরিবর্তন দ্বারাই আমরা এর প্রতিরোধ করতে পারি। এর অর্থ হল, এটা ব্যাপক মহামারীর আকারে বিস্তার লাভ করে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বেই আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

ডাক্তার অবতার সিং পেইন্টাল বিবাহ বন্ধনের বাইরে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের দাবী করেছেন, যেন আইনের অধীনে অপরাধীদের শাস্তি, জেল বা জরিমানা হতে পারে। তিনি বলেন, Ban sex with foreigners and NRIS.[263]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডাক্তার হিরোশি নাকাজিমা বলেন,

The spread of AIDS among the general population could mean the extermination of some community or even the disappearance of mankind?

জনসাধারণের মধ্যে এইড্‌স বিস্তার লাভ করলে জাতি বিশেষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমনকি সমগ্র মানবজাতিরও বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[২৬৪]

২০০৪ সালের ডিসেম্বরে প্রদত্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য (WHO) এবং ইউ এন এইড্‌স (UN AIDS)-এর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে মোট ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ মানুষ এইচ আইভি-তে আক্রান্ত। এদের মধ্যে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ জন হচ্ছে নারী এবং ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু রয়েছে ২২ লক্ষ।

---

২৬৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৮ ;India to day, July 31, 1988, p. 67-68, International ed.

২৬৪. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬;The New Straits Times, Kuala Lumpur, Malaysia, June 23, 1988.

অঞ্চল ভিত্তিক হিসেবে সাব-সাহারান আফ্রিকায় ২ কোটি ৫৪ লক্ষ মানুষ এইচ আইভি-তে আক্রান্ত। এর পরের স্থানটি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া। এখানে প্রায় ৭১ লক্ষ মানুষ এইচ আইভি-তে আক্রান্ত। এ ছাড়া পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় ১৪ লক্ষ, উত্তর আমেরিকায় ১০ লক্ষ এবং ওশেনিয়ায় ৩৫,০০০ হাজার এইচ আইভি-তে আক্রান্ত মানুষ রয়েছে।[২৬৫]

বাংলাদেশে সরকারী হিসেব অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত এইচ আইভি/এইড্স এ আক্রান্ত ৪৬৫ জন মানুষ সনাক্ত করা গেছে।

UN AIDS Report on the global HIV/AIDS epidemic. ২০০২ এর তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালের শেষে বাংলাদেশের ১৩,০০০ জন মানুষ এইচ আইভি-তে আক্রান্ত বলে অনুমান করা হয়েছে।[২৬৬]

যুবক-যুবতীর উপর যৌন প্রভাব

ধর্মহীন পাশ্চাত্য দুনিয়াটাই যৌন প্রবণতা উত্তেজিত করার এক পরিপূর্ণ বারুদ কারখানায় পরিণত হয়েছে এবং এই উত্তেজনা নিঃসংকোচে চরিতার্থ করার যাবতীয় উপায়-উপাদানও এতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে অশ্লীল সাহিত্য ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে নির্লজ্জতার যে ব্যাপক প্রচার কার্য চলেছে, চলচ্চিত্রসমূহ কেবল সকাম প্রেম-প্রবণতাকে উত্তেজিত করেই ক্ষান্ত থাকে নি। বরং এর বাস্তব শিক্ষাও দান করছে এবং নারীদের উলঙ্গ ছবি সর্বত্র প্রদর্শিত হচ্ছে ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা অবাধ গতিতে চলছে। এমতাবস্থায় যে সমস্ত যুবক-যুবতীর মধ্যে কণামাত্র উষ্ণ শোণিতও বিদ্যমান আছে, তাদের আবেগ-অনুভূতি আলোড়িত না হয়ে পারে না। আগুনের সংস্পর্শে মোম গলবে না, এমন ধারণা করাই বাতুলতা। সুতরাং কামরিপু জাগ্রত করার যাবতীয় উপায়-উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশ যে সমাজে বিরাজিত, সেখানে অবাধ গতিতে যৌনলীলা চলতে থাকবে, এতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? আর এরূপ পরিবেশে অপরিণত বয়সেই যৌন ক্ষুধার তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণনা করে জর্জ বেন লিন্ডসে বলেন : নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমেরিকার বালক-বালিকাগণ সাবালক হতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই যৌন প্রবণতার উন্মেষ ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি তিনশত বারজন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করেন। এতে তিনি অবগত হন, এগার হতে তের বছর বয়সেই তাদের দু'শত পঞ্চাশজন সাবালিকা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এত তীব্র যৌনতৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, আঠার বছর বয়স্কা বালিকার মধ্যেও এমন হওয়া সম্ভব নয়।[২৬৭]

ডাক্তার ইডিথ হুকার বলেন,

বিশিষ্ট ভদ্র ও ধনীদের মধ্যে অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বছর বয়সের বালিকা সমবয়সের বালকের সাথে প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময় তারা যৌনকর্মও করে থাকে। সাত বছরের একটি বালিকা তার বড় ভাই ও কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে যৌনকর্ম করে এবং অপর দু'টি বালিকা অপরাপর সমবয়সী বালক-বালিকাদেরকেও যৌনকার্যে উস্কানি দেয়। এই দলের সকলের বড় বালিকাটির বয়স ছিল দশ বৎসর। তথাপি সে বিভিন্ন প্রেমিককে প্রেম-নিবেদনের গৌরব লাভ করে।[২৬৮]

---

২৬৫. ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭; UN AIDS & WHO: AIDS epidemic update, December 2004. p 1-3

২৬৬. ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; UX. UN AIDS : Report on the global HIV/AIDS epidemic, 2002, p. 194; জাতীয় এইডস/এসটিডি কর্মসূচী (NASP) হ্যান্ড আউট, ১ ডিসেম্বর ২০০৪

২৬৭. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৯ ; George Lindsey, Revolt of Modern youth, p. 82-86.

২৬৮. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮ ;Dr. Eddit Hooker, Laws of Sex, p. 328.

পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীদের পরিবেশই তাদের মধ্যে অতি অল্প বয়সের যৌন স্পৃহা জাগ্রত করে দেয়। এর পরিণাম অতি ভয়াবহ ও মারাত্মক না হয়েই পারে না। অল্পবয়স্কা বালিকাগণ বন্ধুদের সাথে গৃহ হতে পলায়ন করে এবং প্রেম খেলায় অকৃতকার্য হয়ে আত্মহত্যা করে।

আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে অশ্লীল সাহিত্যের চাহিদাই সর্বাপেক্ষা অধিক। যুবক-যুবতীরা এসব অধ্যয়ন করে আসল কার্যে অবতীর্ণ হয়। বালকদের বিদ্যালয়সমূহে সমকাম (Homo sexuality) ও হস্ত মৈথুন (Masturbation) অবাধ গতিতে চলে। আর বালক-বালিকাদের সহশিক্ষার বিদ্যালয়গুলোতে কামোদ্দীপনা উত্তেজিত করার উপায়-উপকরণের সাথে তা চরিতার্থ করার সামগ্রীও সঙ্গেই পাওয়া যায়। সুতরাং তারা ভরা যৌবন পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করে।

জর্জ লিন্ডসে বলেন, সোপানসমূহে এর অনুপাত আরও অনেক বেশী। তিনি আরও বলেন, হাই স্কুলের বালকগণ বালিকাদের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়ে বহু পশ্চাতে। বালিকারাই সাধারণত অগ্রবর্তী হয়ে থাকে। আর বালকগণ তাদের ইঙ্গিতে নাচে।[২৬৯]

নারীত্বের বিলোপ সাধন

পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষায় ও চাল-চলনে পুরুষের সমপর্যায়ে উপনীত হওয়ার একান্ত বাসনায় নারী তার আসল নারীত্বেরই বিনাশ সাধন করেছে। ডরথি টমসন বলেন,

Women put on Precisely the same level as man has been dewomanised পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে।[২৭০]

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, তালাক ও বিচ্ছেদ

নারী-পুরুষের সুদৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনে রূপান্তরিত হয়। এই সম্পর্কের কারণেই সে জীবনে স্থৈর্য ও স্থায়িত্ব এবং সম্প্রীতি ও শান্তি লাভ করে। নারী পুরুষের এই সুমধুর সম্পর্কের নাম 'বিবাহ'। এই সম্পর্কের অধীনেই ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সুখময় পরিবেশে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও সুনাগরিকরূপে গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু যে সভ্যতায় বিয়ে দূষণীয় এবং পতিতাবৃত্তি উৎকৃষ্ট রীতিতে পরিণত হয়েছে, সে সমাজে নারী-পুরুষের হৃদয় হতে বিয়ে ও এর সুমহান উদ্দেশ্যের ধারণাই বিলীন হয়েছে। যে সমাজে কামভাব চরিতার্থ করা ছাড়া যৌন মিলনের অপর কোন লক্ষ্যই থাকে না, সেখানে কামাতুর যুবক-যুবতীরা ভ্রমরের ন্যায় এক ফুল হতে অন্য ফুলে কেবল মধু আহরণ করে বেড়ায়, এমন স্থানে পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপনের কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। এমন সমাজের নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে। এতে ভবিষ্যত বংশধরগণ নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতর হতে থাকে এবং অবশেষে স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেয়ে সভ্যতার বন্ধনও ছিন্ন হয়ে পড়ে। আধুনিক সভ্যতায় পাশ্চাত্য জগতে খুব কমসংখ্যক লোকই বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং যে সকল বিয়ে সংঘটিত হয়, সেগুলোর অধিকাংশই ভেঙ্গে হয়ে যায়।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে সাত-আটজন নারী পুরুষের বিয়ে হয়ে থাকে এবং বিয়ে করে পবিত্র ও সদ্ভাবে জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য তাদের অধিকাংশেরই থাকে না। যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসব করেছে, বিয়ে করে স্বামী দ্বারা এই সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করে নেয়ার উদ্দেশ্যেও অনেক নারী বিয়ে করে থাকে এবং এই উদ্দেশ্যে সফল হওয়ার পরই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে। পল ব্যুরো বলেন,

---

২৬৯. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০;George Lindsey, The Revolt of Modern Youth.

২৭০. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০০

ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা রীতি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। বিয়ের পূর্বেই বিয়ে ইচ্ছুক নারী তার ভাবী স্বামী হতে প্রতিশ্রুতি নিত যে, সে তার অবৈধ সন্তানকে নিজের বৈধ সন্তানরূপে গ্রহণ করে নিবে। কেবল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এটা প্রচলিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে পল ব্যুরো এক নারীর কথা উল্লেখ করেন যে, বিয়ের পাঁচ ঘণ্টা পরই বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটায়। তিনি আরও বলেন, ফ্রান্সের নব্য যুবকদের বিয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বীয় গৃহেও একজন রক্ষিতার সেবা গ্রহণ করা। তারাও দশ-বার বছর স্বাধীনভাবে যৌনকার্য করে বেড়ায়। তারপর নিজ গৃহেও তেমন আনন্দ উপভোগের জন্য বিয়ে করে থাকে। আর সে দেশে বিবাহিত লোকের ব্যভিচারও দূষণীয় নয় এবং সমাজও এটাকে মন্দ কাজ বলে মনে করে না।

মোটকথা পাশ্চাত্য জগতে বিয়ে খুব কমই হয়ে থাকে এবং বৈবাহিক বন্ধনও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফ্রান্সে কয়েকবার মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন এক সম্মানিত ব্যক্তি বিয়ের পাঁচ ঘণ্টার পরই বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটান। সীনের আদালতে একবার একই দিনে ২৯৪টি বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ সালে বিয়ের নতুন আইন পাস হওয়ার সময় চার হাজার বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। ১৯০০ খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা সাত হাজারে এবং ১৯১৩ খৃস্টাব্দে একুশ হাজারে পৌঁছে।[২৭১]

তালাকের আধিক্যে আতংকিত হয়ে লিংক বলেন,

The divorce rate, certainly an aspect of social harmony is at an all high, more than one in every five marriages and promises in twenty years to be one in every marriage.

তালাকের হার কোনকালেই এত বৃদ্ধি পায় নি। প্রতি পাঁচটি বিয়েতে একটি তালাক হচ্ছে এবং এতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বিয়ে ও তালাকের অনুপাত ১ঃ১ হবে।[২৭২]

তালাক ও বিচ্ছেদের ব্যাপকতা দূরীকরণের উপায় হিসেবে পরীক্ষামূলক বিয়ের (Companionate Marriage) উদ্ভাবন করা হয়। এর অর্থ হল, নারী পুরুষ সেকেলে ধরনের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে কিছুকাল একত্রে বসবাস করতে থাকবে। এরূপ বসবাসকালে তাদের মনের মিল হয়ে গেলে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অন্যথায় তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণ করতে থাকবে। পরীক্ষামূলক সময়ে তাদেরকে সন্তান উৎপাদনে বিরত থাকতে হবে। কেননা, সন্তান জন্ম নিলে তাদের বিয়ে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। রাশিয়াতে এটা 'স্বাধীন প্রেম' (Free Love) নামে অভিহিত। কিন্তু এই সমাধানও আসল ব্যাধি হতে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত হচ্ছে।

জাতীয় দুর্গতি

কোন জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সর্বপ্রধান সম্বল হল জনশক্তি। কোন জাতিই এটা ছাড়া দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারে না-আজ হোক, কাল হোক, জগতের ইতিহাস হতে এটা মুছে যাবে। সন্তান ধারণ ও প্রতিপালন নারী জাতির স্বাভাবিক নৈতিক দায়িত্ব এবং এটা ব্যতীত মানব-বংশও রক্ষা পায় না। কিন্তু আধুনিক নারী-সমাজ এই মহান দায়িত্ব পালনে নারাজ। এতে জাতি বিশেষ এবং পরিশেষে সমগ্র মানবতার দুর্গতি নেমে আসতে বাধ্য।

পাশ্চাত্যের যৌন উশৃঙ্খলতা মাতৃ প্রকৃতিকে বিকৃত করে দিয়েছে। আধুনিককালে মাতা নিজ সন্তানের প্রতি কেবল বিরাগভাজনই হয়ে ওঠে নি; বরং তার পরম শত্রু হয়ে পড়েছে। গর্ভনিরোধ গর্ভপাতের প্রবল

---

২৭১. আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০২

২৭২. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮; Dr. Henri C. Link, The Discovery of Morals, p.17.

প্রচেষ্টার পরও যে সকল হতভাগা (?) সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতার ব্যবহার বর্ণনা করে পল ব্যুরো বলেন,

যে সকল সন্তানের প্রতি তাদের মাতা-পিতা নির্মম ও অমানুষিক আচরণ করে, তাদের করুণ কাহিনী রোজই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে কেবল অসাধারণ ঘটনাবলীরই উল্লেখ থাকে। এই হতভাগ্য ও অনভিপ্রেত অতিথিদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা কিরূপ নির্মম ব্যবহার করে তা লোকে ভালরূপেই অবগত আছে। এই হতভাগার দল তাদের মাতা-পিতার জীবনের সুখ-সম্ভোগ একেবারে বিনষ্ট করে দিয়েছে। এজন্যেই তারা তাদের প্রতি বিষণ্ন ও উদাসীন। সাহসের কমতির দরুনই গর্ভধারিণী অনেক সময় গর্ভপাত করতে পারে না। আর এই সুযোগে নিরপরাধ শিশু জগতে এসে পদার্পণ করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই তাকে পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ করতে হয়।[২৭৩]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারী-মুক্তির নামে যে আন্দোলন শুরু হয়, এটিই তার বেদনাদায়ক পরিণতি। স্বীয় বংশধরের নিধনে যে জাতি এমন চরমে উপনীত হতে পারে, ধ্বংসের কবল হতে সে কিরূপে রক্ষা পাবে? কারণ নতুন বংশধরের আবির্ভাব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক। কোন বহিঃশত্রু না থাকলেও এমন জাতি নিজে নিজেই ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য।

জড়বাদী মতবাদ, প্রবৃত্তির দাসত্ব, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনে বিতৃষ্ণা ও অস্বীকৃতি, পারিবারিক জীবন যাপনে অনীহা এবং বৈবাহিক স্থিতিহীনতা নারীর সহজাত ও স্বাভাবিক মাতৃসুলভ প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-অনুরাগ বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ এই পবিত্র অনুরাগই নারীকে মহীয়সী করে তোলে এবং কেবল সভ্যতাই নয়; বরং গোটা মানবতার অস্তিত্বও এরই উপর একান্তভাবে নির্ভর করে। আর এই অনুরাগ বিনষ্ট হয়েছে বলেই গর্ভনিরোধ, গর্ভপাত ও শিশু হত্যা প্রসার লাভ করেছে।

আধুনিক যুগে নারীমুক্তি আন্দোলনের লজ্জাকর ও ভয়াবহ পরিণাম অতি সংক্ষেপে উপরে বর্ণিত হল। এর উদ্যোক্তাগণ হয়ত নিজেরাই অবগত ছিল না, এই আন্দোলন তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি কৌশলের অতীব চমৎকার নিদর্শন নারী। তার গোটা দেহ, চলন-ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, কমনীয়তা সকলই নিতান্ত মনোরম, মন-ভোলানো ও আকর্ষণীয়। প্রেম-প্রীতির প্রতিমূর্তি করেই তাকে সৃজন করা হয়েছে। নারী একান্ত আদরের ধন, পুরুষের সহধর্মিণী, বেহেশতে সুখ-সম্ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ওহীর জ্ঞানবিবর্জিত বিভ্রান্ত মানুষ তার সঠিক মর্যাদা দিতে পারল না। একবার অতি ঊর্ধ্বে তুলে দেবীরূপে তাকে পূজা করেছে। আবার তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা, সে মানুষ কি-না ইত্যকার সন্দেহ পোষণ করে তাকে কামাতুর পুরুষের যৌন সম্ভোগের সামগ্রীরূপে, অতি তুচ্ছ নির্লজ্জ বারবণিতারূপে দাঁড় করিয়েছে। পুরুষ কখনই তার সঠিক মর্যাদাপূর্ণ মধ্য পন্থায় তাকে রাখতে পারল না। একমাত্র ইসলামই এ মধ্যপন্থা প্রদর্শন করে।

যৌন বাসনা চরিতার্থ করতে যেয়ে সীমালঙ্ঘন এবং এটাকে একেবারে ধ্বংস ও দমিত করা, উভয়ই ক্ষতিকর এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সুতরাং যৌন কামনাকে সীমাতিক্রম এবং চরম স্বল্পতা হতে রক্ষা করে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ মধ্যপন্থায় আনয়ন করতে হবে। যাতে সমাজে যৌন উন্মাদনার অনাচার সৃষ্টি না হয় এবং অপরদিকে মানব বংশ ও সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে।[২৭৪]

সুখের বিষয়, অধুনা পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণই স্বদেশের যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন এবং জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে, ইসলামের দিকেই তাঁরা ক্রমশ অগ্রসর হয়ে আসছেন। তাঁদের এই আগমন শুভ হোক।

---

২৭৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১০৫

২৭৪. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

প্রতিক্রিয়া

নারী সর্বনাশের মূল কারণ এই খৃস্টীয় মতবাদ নারী জাতিকে অমর্যাদার অতল তলে ডুবিয়ে দিল। অথচ খ্রিষ্টজগত নির্লজ্জভাবে বড় গলায় প্রচার করে বেড়ায়, তারাই নারী জাতিকে মুক্তি প্রদান করেছে। তবে পাশ্চাত্যে নারীদের বর্তমান দুর্গতির জন্য খৃস্টধর্ম দায়ী নয়। কারণ, খৃস্টধর্ম জগত হতে বহু পূর্বেই বিদায় নিয়েছে। এখন যা কিছু বাকী আছে, তার কেবল নিজেদের ধনতান্ত্রিক স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশসমূহে রপ্তানীর জন্যই রয়ে গিয়েছে।

পাশ্চাত্য নারী ধর্মের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ঘোষণার পর পুরুষকে নিজের হীনতর প্রতিপন্ন না করা পর্যন্ত বিশ্রাম লাভ করে নি। ইতিপূর্বে পুরুষ তার যা কিছু উত্তম ছিল, তাই নারীকে প্রদান করত। এখন তা থেকে সে বিরত রইল। এতে পুরুষ ভাল ব্যবসায়ী হল সত্য; কিন্তু মানুষ হিসেবে তার অধঃপতন ঘটল। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ নিদারুণ বেদনার সাথে এই সত্য স্বীকার করে থাকেন।

পাশ্চাত্যের সুখময় পারিবারিক জীবন বিলুপ্ত হয়ে পারিবারিক স্নেহ ভালবাসা, প্রেম-প্রীতির হৃদয় বিদারক পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। অবহেলিতা স্ত্রী, পরিত্যক্ত সন্তান-উপ পত্নী, প্রণয়িণী ও পথ সহচারিণী এবং অপরিসীম যৌন উন্মাদনা ও অবাধ যৌনসম্ভোগ আজকালকার জীবনের মর্মান্তিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমান দুনিয়ায় পাশ্চাত্য নারী সর্বাপেক্ষা অসুখী প্রাণী। তারা সমাজে অগণিত আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে। এই সকল সমস্যার সমাধান, এমনকি উপশম করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মানব সন্তানের এই চরম দুর্গতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে প্রবল আঘাত হেনেছে। এমনকি পাশ্চাত্যেও এর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় পাশ্চাত্য সমাজদরদী চিন্তাবিদ এহেন নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তারা নিজেদের আদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিতে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন এবং এতকাল যাবত মুসলমানগণ যা বলে আসছেন তদানুরূপ কথা বলতে শুরু করেছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তার The principles of Social Reconstruction গ্রন্থে বলেন,

"Within the classes that are dwindling, it is the best element that is dwindling most rapidly. It seems unquestionable that if our economic system and our moral standard remain unchanged, there will be in the next two or three generations a rapid change for the worse in the character of the population in all civilized countries. The problem is one which applies to the whole western civilization."

"সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যা উত্তম, তা অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে । এটা প্রশ্নাতীত বলেই মনে হয় যদি আমাদের অর্থনৈতিক পদ্ধতি ও আমাদের নৈতিক মান অপরিবর্তিত থাকে। তবে পরবর্তী দুই বা তিন পুরুষের মধ্যে সমস্ত সভ্যদেশের জনগণের চরিত্র দ্রুতগতিতে নিকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এ কথা সকল পাশ্চাত্য সভ্যদেশের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।"[২৭৫]

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও যৌন সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম উপায় ইসলামের বিবাহ প্রথা। পাশ্চাত্যের যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিরসনের জন্য পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী মিসেস হাডসন শ' (Mrs. Hudson Shaw) পাশ্চাত্যকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

---

২৭৫. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮; Bertrand Russel, The Principles of Social Reconstruction.

In all this argument I have tried to reach those realities of human nature on which human morality must be based. I believe that the fundamental things which we must take into account are, first the spirit to reckon with and who cannot neglect anyone of these without insecurity and secondly, the solidarity of the human race which makes it futile to act as though the 'morals' of any one of us could be his personal affair alone. It is because of this solidarity that marriage has always been regarded as a matter of public interest to be recognized by law, celebrated by some public ceremony and protected by legal contract.[276]

এ দীর্ঘ আলোচনায় আমি মানব প্রকৃতির সেই সকল সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি, যার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি যে, মৌল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক, তা হল প্রথমত মানুষের জটিল প্রকৃতি। তার দেহ, আত্মা ও তেজ-বীর্য রয়েছে এবং এগুলোর কোনটির দাবিই সে সরলতার সাথে অস্বীকার করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানবতার ঐক্য ও সংহতি। এ কারণেই কারো পক্ষে নৈতিকতাবোধকে তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধারণা করা এবং এ ধারণার বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানব জাতির এই সংহতির কারণেই বিয়ে সর্বকালেই সামাজিক ব্যাপারে পরিগণিত। আইন দ্বারা এটা স্বীকৃত হতে হবে, সামাজিকভাবে বিবাহ উৎসব উদযাপন করতে হবে এবং আইনানুগ চুক্তি দ্বারা এর সংরক্ষণ করতেই হবে।

পাশ্চাত্যের লাগামহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণে এই মহিয়সী মহিলার উপদেশ কত চমৎকার ও প্রাকৃতিক বিধানসম্মত। এ উপদেশ মেনে চললে বিবাহপূর্ব যৌন মিলন, পরীক্ষামূলক বিবাহ, গর্ভনিরোধ, ভ্রুণ-হত্যা এবং যাবতীয় যৌন অনাচার বিদূরীত হয় ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। আমাদের বিশ্বাস, পাশ্চাত্যের শুভবুদ্ধি অচিরেই ফিরে আসবে। আল্লাহ্ তাআলার প্রিয়তম ও সুন্দরতম সৃষ্টি আর কতকাল অনাচারে বিনষ্ট থাকবে?

যৌন অনাচারের কারণে প্রিয় স্বদেশের সভ্যতা একেবারে ধ্বংসের মুখে নিপতিত। সুতরাং এই ধ্বংসের কবল হতে রক্ষার সন্ধান প্রদানে গভীর পরিতাপের সাথে তিনি আরও বলেন,

Now when our civilization is indeed on the verge of collapse, we see that in fact the last decades have been marked by a choice of licenses for both sexes rather than discipline, the result has been an enormous waste of creative power, Prostitution and promiscuity, combined with the prevention of conception and not combined with any kind of creative results whatever, homosexuality in both sexes and various forms of abnormality, represent to us the unwholesome swamp into which the water of energy have flowed, Is this a symptom or a cause of our collapse? Both I think.[277]

"বর্তমানে আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের মুখে দোদুল্যমান। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, গত কয়েক দশক ধরে আমাদের নর-নারীর মধ্যে চরম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চলে আসছে এবং এতে কোন বাধা-বিঘ্নই নেই। ফলে প্রচুর সৃজনী শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে। পতিতাবৃত্তি, অবৈধ যৌনকর্ম ও তৎসহ গর্ভনিরোধ, নারীতে-নারীতে এবং পুরুষে-পুরুষে সমকাম যাতে সন্তান উৎপাদনের কোন আশাই থাকে না এবং আরও বহুবিধ অস্বাভাবিক

---

২৭৬. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১২ ;Hudson Shaw, Sex and Commonsense, p. 49.

২৭৭. Hudson Shaw, Sex and Commonsense, p. 49; ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

রতিকর্মে শক্তির নির্যাস অযথা অপচয় হচ্ছে। এই সমস্তই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এটা কি আমাদের ধ্বংসের লক্ষণ বা কারণ নয়? আমার মনে হয়, উভয়ই।"

ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি পাশ্চাত্য নারীর দুঃখজনক জীবন সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মতে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ বসবাসের অনুপযোগী ও ভয়ংকর হয়ে পড়েছে।

নারী প্রগতির ধূয়া তুলে পাশ্চাত্য উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নারীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কামনা করে প্রফেসর ফুলটন-জে-শীন বলেন,

"The disturbance of family-life in America is more desperate than at any other period in our history. The family in the barometer of the nation what the average home is that is America. If the average home is living on credit spending money ravishly, running into debt, then America will be a nation which will pile national debt until the day of the Great collapse, if the average husband and wife are not faithful to their marriage vows, then America will not insist on fidelity to the Atlantic charter and the four freedoms.

If there is a deliberate frustration of the fruits of love, then the nation will develop economic policies of frustration of the fruits of love, then the nation will develop economic policies of flowing undue cotton, throwing coffee into the sea and frustrating nature for the sake of economic prices. If the husband and wife live only for self and not for each other, if they fail to see that their individual happiness is conditioned on mutuality, then we shall have a country where capital and labour fight like husband and wife, both making social life barren and economic peace impossible, if the husband or wife permits outside solicitations to woo one away from the other, then we shall become a nation where alien philosophies will infiltrate as communism sweeps away that basic loyalty which was known as patriotism.

If husband and wife live as if there is no God, then America shall have bureaucrats pleading for atheism as a national policy repudiating the declaration of Independence and denying that all our rights and liberties come to us from God. It is the home, which decides the nation. What happens in the family will happen later in the congress, the Which House and the Supreme Court. Every country gets the kind government it deserves, as we live in the house so shall the nation live."[২৭৮]

"আজকাল আমেরিকায় পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি যেরূপ প্রচণ্ড আকারে দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে আমেরিকার ইতিহাসে কোনকালেই এরূপ পরিলক্ষিত হয় নি। পরিবার জাতির আবহমান মন্ত্রস্বরূপ। সর্বসাধারণ পরিবার যেমন জীবন যাপন করে গোটা আমেরিকাও তদ্রূপই থাকবে। সাধারণ পরিবার যদি ঋণ করে অমিতব্যয়ের জীবন-যাপন করে, তবে আমেরিকাও এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে, কিয়ামত পর্যন্ত এটা কেবল ঋণের পর ঋণের স্তূপ পুঞ্জীভূত করতে থাকবে। স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের

২৭৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১১৬- ১১৭; Prof. Fulton, J. Sheen, Communism and Conscience of the West.

বিবাহ বন্ধনের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকে, তাতে সমগ্র আমেরিকা ও আটলান্টিক চার্টার এবং চার স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বস্ত থাকবে না।

প্রবল প্রেমানুরাগও যদি স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তবে অতিরিক্ত তুলা, কফি সমুদ্রে নিক্ষেপকরণ এবং হতাশাব্যঞ্জক মানব প্রকৃতির ও অর্থনৈতিক মূল্যের প্রয়াসে জাতিকে অর্থনৈতিক কর্ম-পন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরে উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রত্যেকেই কেবল নিজের জন্যই জীবন যাপন করে, তাদের ব্যক্তিগত সুখ যে তাদের একে অন্যের উপরই একান্তভাবে নির্ভর করে, এটা যদি তারা বুঝতে না পারে তাতে আমাদের দেশ এমন এক স্থানে পরিণত হবে যেখানে পুঁজি ও শ্রম স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সংগ্রামে রত হবে। আর এর ফলে তারা উভয়ে সামাজিক জীবন নিষ্ফল করে তুলবে এবং অর্থনৈতিক শান্তি অসম্ভব হয়ে উঠবে।

স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের ছাড়া অন্যত্র প্রেম নিবেদন করে, তবে আমাদের জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যাতে বিদেশী দর্শন অনুপ্রবেশ করে কমিউনিজমের ন্যায় দেশ-প্রেম একেবারে মুছে ফেলবে। কোন আল্লাহ্ নেই এই মনোভাব নিয়ে যদি স্বামী-স্ত্রী জীবন যাপন করে, তবে আমেরিকা ক্ষমতাসীন আমলাদের অধীন হয়ে পড়বে -যারা স্বাধীনতার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতা যে আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত, তা অস্বীকার করে নাস্তিকতাকে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবে। গৃহই জাতিকে নিশ্চিত করে। পরিবারে যা সংঘটিত হয়, তাই পরে জাতীয় কংগ্রেস, হোয়াইট হাউজ ও পরিশেষে সুপ্রীম কোর্টে সংঘটিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক দেশ এর উপযোগী সরকারই লাভ করে। গৃহে আমরা যেরূপ জীবন যাপন করি, বৃহত্তর জাতীয় জীবনেও আমরা তদ্রুপ জীবন-যাপন করব।"

কত সারগর্ভ উপদেশ! যৌন উচ্ছৃঙ্খলা পরিহার করে নারীদেরকে গৃহে প্রত্যাবর্তন এবং স্বামী-স্ত্রীরূপে বিবাহ বন্ধনের বিশ্বস্ততা রক্ষা করে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য কত জোরালো আহ্বান। বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন এবং সকল অধিকার ও স্বাধীনতা একমাত্র তাঁরই অবারিত দানরূপে স্বীকার করে নেয়ার কি চমৎকার পরামর্শ!

ড. সাইরিল গার্বেটও পাশ্চাত্যের যৌন অনাচার অবসানকল্পে ধর্মের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেন। তিনি বলেন,

Only definite moral conviction based upon religious faith will give the necessary self-control.

অর্থাৎ একমাত্র ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত সুনির্দিষ্ট দৃঢ় প্রত্যয়ই মানুষকে অনাচার হতে আত্মসংযমের শক্তি প্রদান করে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীর দুর্গতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন ও ধর্মপথ অবলম্বন এবং পাশ্চাত্যের মন-মানসে নারী স্বাধীনতার প্রতি প্রবল প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে উপরে যা বলা হল, তা-ই যথেষ্ট মনে করি। আফসোস! মানুষের দুর্বুদ্ধি তাকে কখনই সঠিক অবস্থানে টিকতে দিল না। মধ্যপন্থা তার নিকট অজ্ঞাতই রয়ে গেল। এ জন্য বলা হয়ে থাকে,

خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا

"মধ্যপন্থাই উত্তম পথ।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে আধুনিক সভ্যতা নারী মুক্তির নামে প্রাচীন কালের লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে তাকে উদ্ধার করে নারী স্বাধীনতার নামে অপর এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। নারী স্বাধীনতার নামে তাকে লাগামহীন জন্তু-জানোয়ার পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। আজ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পের নামে নারীর লজ্জা-শরম-আবরু ও পবিত্রতার মহামূল্য সম্পদকে প্রকাশ্য বাজারে নগণ্য পণ্যের মত ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে।

পুরুষেরা চিতার আধুনিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও শিল্পে অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনের মোহনীয় নামে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে এবং ক্লাবে, নাচের আসরে বা অভিনয়মঞ্চে পৌঁছিয়ে নিজেদের পাশবিক লালসার ইন্ধন বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুত আধুনিক সভ্যতা নারীর নারীত্বের সমাধির উপর লালসা চরিতার্থতার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। এ সভ্যতা প্রকৃতপক্ষে নারীকে দেয় নি কিছুই, যদিও তার সব অমূল্য সম্পদই সে হরণ করে নিয়েছে নির্মমভাবে।[২৭৯]

"সকল মুসলিম দেশেই নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"-এ প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য কি? এটা আসলে একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র যা আমাদের সংসার, পরিবার এবং এমনকি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। 'নারী অধিকার', 'নারী স্বাধীনতা' ও 'নারী উন্নয়ন' প্রভৃতি সস্তা শ্লোগানগুলো শুধুমাত্র মূল উদ্দেশ্যকে কুহেলিকার আবরণে ঢেকে রাখার জন্যেই।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র ইসলামই নারীর এ স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কাজেই মুসলিম সমাজে নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই ইসলামই তাদেরকে স্বাধীন করেছে। কিন্তু এ সমস্যা পাশ্চাত্যবাসীর। এ সমস্যা তাদের কোন দিনই ঘুচবে না। নারীর কাছে ইসলাম যে লজ্জা, শালীনতা, বিনয় এবং তার বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুবিধার্থে তার যে একাগ্রতা ও গৃহমুখীতার দাবি জানায়, সেটা তার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করা ও দমন করার জন্য নয়; বরং সুশৃঙ্খল ও পরিশীলিত করার জন্য। কোন জিনিসকে সুশৃঙ্খল ও পরিশীলিত করার অর্থ তাকে দমন করা ও ধ্বংস করা নয়; বরং এর অর্থ হলো তাকে তার যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে তার সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা। এ দ্বারা তাকে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করা হয় এবং পরিবার ও সমাজে তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের শিকার নারী

বর্তমান মানব সমাজে সবচাইতে জঘন্যতম অবক্ষয় হচ্ছে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ। দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালে দুই-একটি ধর্ষণের খবর পাওয়া যাবে না এমন দিনের নজির নেই। কোলের শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা পর্যন্ত কোন নারীর ইজ্জত ও জীবন আজ আর নিরাপদ নয়। পাঁচ বৎসরের শিশুও এখন ধর্ষিতা হয়। নিজ গৃহ, শিক্ষাঙ্গন, থানা হাজত, আদালত প্রাঙ্গণ কোথাও আজ নারীদের নিরাপত্তা নেই। এ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী জানোয়ারেরা শত নারী ধর্ষণ করে উদযাপন করে ধর্ষণের সেঞ্চুরী।

ধর্ষণ একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম যৌনাচার। এটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। এটা চরম মানবতাবিরোধী ও নীতিগর্হিত কাজ যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে কলুষিত করে। ধর্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ Rape।

---

২৭৯. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬৫; ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

শাব্দিক অর্থে Sexual intercourse with a woman without her consent.[২৮০] বাংলা ভাষায় বলাৎকার,[২৮১] সতীত্ব নাশ ইত্যাদি ধর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "সাধারণত কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখাইয়া সম্মতি আদায় করিয়া বা অন্যায়ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া যে তার স্ত্রী বা চৌদ্দ বছরের কম বয়স্কা বালিকাকে তাহার সম্মতি লইয়া যৌন সহবাস করিলে উহা ধর্ষণ নামে পরিচিত হয়।"[২৮২]

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "কোন পুরুষ বা নারী বল প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে কোন নারী বা পুরুষের সাথে সঙ্গম করে তা যেনা হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের যেনাকে বল প্রয়োগ যেনা বা ধর্ষণ বলা হয়।[২৮৩]

কেন হচ্ছে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ

বর্তমান সমাজের সর্বত্র ঘরে-বাইরে, রাস্তায়, গাড়িতে, বাজারে, মার্কেটে, শপিংমলে, পার্কে, হোটেল-মোটেলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আস্তে আস্তে এ ঘটনাগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যে সকল কারণে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা অহরহ ঘটছে সেগুলো অবশ্যই খতিয়ে দেখা আবশ্যক। গভীরভাবে বিচার করলে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বৃদ্ধির নিম্ন কারণসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- নারীদের অমার্জিত চালচলন-উচ্ছৃংখল চলাফেরা। পবিত্র কুরআন নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে তাগিদ দেবার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের মতো সাজ-সজ্জা করে নির্লজ্জের মতো রাস্তায় চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসে কুরআনের হুকুমের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেহায়ার মতো চলাফেরা শুরু করেছে। আপত্তিকর পোশাক পরে হরেক রকমের প্রসাধনী মেখে চরম সাজসজ্জা করে রাস্তা-ঘাটে, বাইরে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের মাঝে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেড়াচ্ছে। আর তাদের এহেন সৌন্দর্য প্রদর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশের একশ্রেণীর টগবগে যৌবনের যুবকেরা উন্মাদের মত তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কাম চরিতার্থ করছে।[২৮৪] নারীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো জঘন্য সামাজিক অপরাধ।
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ।[২৮৫] প্রগতির নামে সমাজে দেশে দিন দিন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমান সংখ্যক কোটা বাড়িয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা, পুরুষের সাথে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে বাসে-ট্রেনে চলাফেরা করা। যুবক-যুবতী একসাথে সুইমিং কষ্টিউম পরে সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা, গেঞ্জী হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা, দেহের বিশেষ অংশ দুলিয়ে দুলিয়ে ভলিবল,

---

২৮০. Ashu Tosh Dev, *Students favorite Dictionary,* (English to Bengali and English) (edition June 1990), P. 1059

২৮১. Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Edited by Zillur Rahman Siddiqi,(Dhaka, Bangla Academy, June 2015), P. 590

২৮২. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *দণ্ডবিধি*, (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪), ধারা ৩৭৫,পৃ.৫৫৩

২৮৩. ইসলামি আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন,* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫),খ. ১, পৃ. ৩৩৬

২৮৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪ খৃ.), পৃ. ৫০৯

২৮৫. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩; মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৮

ফুটবল খেলা এসবই নারীদেরকে পুরুষের কাছে সহজলভ্য করে দিচ্ছে। বস্তুত নারী স্বাধীনতা নামে নারী-পুরুষের এহেন অবাধ মেলামেশার সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর সম্ভ্রমহানির পথকেই সুগম করে দেয়া হচ্ছে।

➢ নারীসমাজের জন্য আর এক মহা অভিশাপ হচ্ছে সহশিক্ষা। নারী পুরুষের যৌবনের ভরাবসন্ত অতিবাহিত হয় তাদের শিক্ষাজীবনে। সহশিক্ষার সুবাদে বিভিন্ন সমাজের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছে। এদের এসব প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ নিচ্ছে দৈহিক সম্পর্কে। তরুণ-তরুণীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হাজারো ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আর যেক্ষেত্রে তরুণেরা তরুণীদের সম্মতি আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে সেক্ষেত্রে বেছে নিচ্ছে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের পথ।

➢ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বৃদ্ধি সহশিক্ষারই অনিবার্য প্রতিফল। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা ও সহশিক্ষার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার চরম সীমানায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এক রিপোর্টে দেখা যায় বর্তমানে আমেরিকার একটি শহরের মাধ্যমিক স্কুলে শতকরা ৪৮জন ছাত্রী গর্ভবতী। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১ লক্ষ ১০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে যাদের বয়স বিশ বছরের নিচে। এরা প্রাথমিক স্কুলেই যৌনচর্চা শুরু করে। এগারো ও বারো বৎসরের ৩১২ জন ছাত্রীর উপর এক জরিপ করে দেখা যায় তন্মধ্যে ২২৫ জন যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্থ। [২৮৬] সুতরাং সহশিক্ষা যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এতে কোনই সন্দেহ নেই।

➢ মানব সমাজে বর্তমানে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো নগ্ন দৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও কুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার। এ দেশের সিনেমা হলগুলোতে হরহামেশা চলছে অশ্লীল চলচ্চিত্র। ছবিতে নায়ক-নায়িকাদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় অভিনয় ও নাচ-গান প্রদর্শিত হচ্ছে। কোন কোন সিনেমায় নায়িকাদের জোরপূর্বক অপহরণ করে ধর্ষণের চিত্র দেখানো হচ্ছে। এতে করে আমাদের যুবসমাজ যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের কৌশল জানতে পারছে। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির আশীর্বাদে ডিস এ্যান্টেনা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাশ্চাত্য নগ্ন সংস্কৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে। কম্পিউটারের সিডি ও হার্ডডিস্কের মাধ্যমে নীল ছবি দেখানো হচ্ছে যা যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি অনুষ্ঠানমালায় তরুণ-তরুণীদের একত্রে নাচের ঢলাঢলি, গানের কলাকলি, বিজ্ঞাপনে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। দেশী-বিদেশী সুন্দরী নর্তকী আমদানি করে বিশাল ময়দানে লাখ লাখ দর্শকের সামনে কাত হয়ে চিত হয়ে যুবতী মেয়েদের দৈহিক কসরৎ প্রদর্শন করে এ দেশের তরুণদেরকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আর তখনই যৌবনের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে ঐ সব তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারীদের উপর।

➢ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবেও আমাদের দেশে বহুসংখ্যক যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক নর-নারীর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য একথা সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। একমাত্র ইসলামি শিক্ষা পারে মানুষকে তার পাশবিকতা দূর করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। ইসলামি শিক্ষায় সুশিক্ষিত একজন যুবক সবসময় পরকালের ভয়ে ভীত থাকে। নারী ধর্ষণ তো দূরের কথা নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকে যে তাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে ধর্ষণের ঘটনা

---

২৮৬. সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া-সালামুল আলাম*, (বৈরুত: দারুস সালাম, ১৯৯৩), পৃ.২১

ঘটছে। ঠিক তার পাশাপাশি আমরা দেখছি এ দেশের মাদ্রাসাগুলোতে এমন কোন ঘটনা আদৌ ঘটেছে বলে কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি সেভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ দেশে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। নৈতিক শিক্ষার অভাবেও অসংখ্য যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ সংঘটিত হচ্ছে।

➢ যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বৃদ্ধির আর একটি বড় কারণ যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মত অপরাধের সুষ্ঠু বিচার না হওয়া।[২৮৭] অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাই বিচারের আওতায় আসে না। দু'চারটি ধর্ষণ মামলা আদালতে উত্থাপিত হলেও তার প্রকৃত বিচার হয় না। যে কারণেই যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ সংঘটিত হোক না কেন যদি তার সুষ্ঠু বিচার করে যৌন নিপীড়ণকারী ও ধর্ষণকারীকে উপযুক্ত শাস্তির বিধান করা হতো তবে আর কোন ধর্ষক এ পথে পা বাড়াতে সাহস পেত না।

বাংলাদেশে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের চিত্র

বিভিন্ন মামলা ও দৈনিকে প্রকাশিত খবরের উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইনকিলাব একটি পরিসংখ্যান তৈরি করে যা ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এতে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে ৫ বৎসরে মোট ৩৬৩৫টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৫ জন : ১ জন শিশু।[২৮৮] ঢাকা মহানগরী থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে ১৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা। এর মধ্যে এক জসিম উদ্দীন মানিক একাই ধর্ষণ করেছে ১০১টি মেয়েকে এবং শেষ ধর্ষণের পর শ্লোগান দিয়েছে "এ্যাকশন এ্যাকশন, ডাইরেক্ট ধর্ষণ"। ধর্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্থানে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করেছে। লাইব্রেরী, নাটকের সাজঘর, মিলনায়তন প্রাঙ্গণ, শহীদ মিনার চত্বর, প্রতিটি হলে, সুইমিংপুলেও ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণকারীরা এত ধর্ষণ করেও বিশেষ পরিচয়ে নিজেদেরকে এর শাস্তির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই শেষ নয় এদেশে পুলিশের নিরাপত্তা হেফাজতে পুলিশ কর্তৃক গ্রুপ ধর্ষণের শিকার হয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ হারায় সীমা চৌধুরী। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে ভাসমান পতিতা হিসেবে দাঁড় করাতে কোশেশ করে। হতভাগিনী মুসলমান হলেও পুলিশ তড়িঘড়ি করে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে চেষ্টা করে। এ দেশে গৃহবধু চামেলীকে তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে নরপশুরা। স্বামী যাতে কোন প্রতিবাদ করতে না পারে, সেজন্য তার হাত-পা ঘরের খুটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বিভিন্ন পত্রিকায় প্রাপ্ত ধর্ষণের খবরের ওপর ভিত্তি করে দেখেছে ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের ঘটনা ২৪০টি, ১৯৯৬ তে ২৬২টি, ১৯৯৭ সালে ৭৫৩টি, ১৯৯৮ সালে ১৪২৫টি ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বৎসর বয়সের ধর্ষিত হয়েছে প্রায় ১০০০ জন এবং ১৯৯৯ পূর্ব পাঁচ বছরে ১৯ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত ধর্ষিত হয়েছে ৪০০ জন।[২৮৯] এসব ধর্ষণের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটে শহরে। অথচ শহরে ভদ্রলোকের বাস। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত তিন বছরে রাজধানীতে ৪২৫টি, রাজশাহীতে ৩১৭টি, চট্টগ্রামে ২০৬টি, খুলনায় ২২১টি, বরিশালে ১০৭টি, সিলেটে ৭০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

---

২৮৭. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

২৮৮. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা: বুধবার, ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৯।

২৮৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭; দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

১৯৯৮ সালে ধর্ষিতাদের মধ্যে ১৫০ জন ছিল ছাত্রী, গৃহবধু ৪৩ জন, গার্মেন্টস কর্মী ১৮ জন, স্বামী পরিত্যাক্তা ১৭ জন, বিধবা ১৮ জন, শ্রমিক ৪৭ জন, গৃহ পরিচারিকা ১২ জন, কর্মজীবী ৭ জন, আদিবাসী ৮১৩ জনের পরিচয় জানা যায়নি। একজন শিশুকে সবাই স্নেহ করে, কিন্তু নিষ্পাপ শিশুটিও ধর্ষিত হচ্ছে। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯-এর জুন পর্যন্ত ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ১৪০ জন শিশু ধর্ষিত হয়েছে। ১৯৯৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত তৎপূর্ব পাঁচ বৎসরে ৭ থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৫৩৮ জন ধর্ষিত হয়েছে, যার হার হচ্ছে ৫১.৪১%।

১৯৯৯-এর জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যাও ধর্ষিতা হয়েছে। মৌলভী বাজার, নোয়াখালী, যশোর, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মোট ৪ জন ইউপি সদস্যা ধর্ষিতা হয়েছে।

১৯৯৯ সালে ২জন বি.এস.এফ. সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। একই সালে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা হয়েছে ৯ জন। একই বছর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে ২৭৮টি। ১৯৯৮ সালে আইন- শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি। দলবদ্ধভাবে হয়েছে ৬৩৪টি। ১৯৯৭ সালে আইন- শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ৬টি। দলবদ্ধভাবে ২৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের হাতে ২১টি। দলবদ্ধভাবে ১০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দলবদ্ধভাবে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তাতে ছাত্র, বেকার যুবকদের সংখ্যা বেশি। অনেক সময় বয়স্ক পুরুষ কর্তৃকও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ওয়ার্ড কমিশনাররাও ধর্ষণ করে।[২৯০]

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ শেষে হত্যা

অনেক সময় দেখা গেছে বিকৃত রুচিধারী ধর্ষণকারীরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা কখনও কখনও ধর্ষিতাকে মেরে ফেলেছে। কখনও বা খালে-বিলে ফেলে দিয়েছে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। কখনও বা গলা, হাত-পা, কেটে বনে-বাদারে ফেলে দিচ্ছে হতভাগিনীর লাশ। আবার দলবদ্ধভাবে বা পালাক্রমে ধর্ষণের কারণেও অনেকের মৃত্যু ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনায় প্রায় ৬৭ জন, ১৯৯৮ সালে ১০৫ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৮ জন, ১৯৯৬ সালে ৯ জন, ১৯৯৫ সালে ১০ জন নিহত হয়েছে। এদের কেউ কেউ ধর্ষণের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।[২৯১]

বর্তমানে বাবা-মায়ের সামনে মেয়ে, স্বামীর সামনে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের সামনে মা ধর্ষিতা হচ্ছে। এর চাইতে বর্বরতা আর কি হতে পারে? আর একটি ঘটনা যা আদিম বর্বরতাকেও হার মানিয়েছ। নিজ কন্যাকে কয়েক দফা ধর্ষণ করেছে এক পাষণ্ড পিতা। ষাটোর্ধ্ব এই পিতা কুষ্টিয়া শহরতলীর ছেউরিয়াস্ত নিজ বাড়িতে আটকে রেখে রাতের পর রাত দশম শ্রেণী পড়ুয়া ষোড়শী কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। এক পর্যায়ে পাষণ্ড পিতার হাত থেকে পালিয়ে এসে চাচার সহায়তায় মেয়েটি তার এই নির্মম কাহিনীর কথা কুষ্টিয়া থানায় এসে বর্ণনা করেছে। পুলিশ অবশ্য ওই ইতরকে গ্রেফতার এবং জেল-হাজতে পুরতে সক্ষম হয়েছে।[২৯২]

উপরের আলোচনায় সমাজের বিশেষ করে এ দেশের ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কারণ ধর্ষণের অনেক ঘটনা থানায় বা পত্রিকায় আসে না। অনেকেই লজ্জা-শরমের কারণে এ ঘটনা চেপে রাখেন। কেউ কেউ সাহসী হয়ে অথবা ঘটনাপ্রবাহের কারণে থানা বা পত্রিকার সাংবাদিকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কাজেই থানা ও পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে

---

২৯০. দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

২৯১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮; দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

২৯২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা: ১৮ই জানুয়ারি, ২০০১ ইং।

কেবলমাত্র গোটা সমাজের একটা খণ্ডচিত্র মাত্র ফুটে ওঠে। থানায় গিয়ে ধর্ষণ প্রমাণ করা অনেক কঠিন। সেখানে ধর্ষিতাকে আরও বেশি অপমানিত হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ষণকারী আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কোন শাস্তি ছাড়াই বেরিয়ে যায়। উপরন্তু ধর্ষণকারীরা সাধারণত প্রভাবশালী হয়ে থাকে। আর সে কারণেই সমাজের অপেক্ষাকৃত অসহায় শ্রেণীর মানুষ ধর্ষণের বিচার চেয়ে জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যান।

তাছাড়া একজন ধর্ষিতা প্রথমেই হোচট খান ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার ধর্ষণ প্রমাণের জন্য। ডাক্তার বিভিন্ন অজুহাতে ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষায় বিলম্ব করেন। ফলে আলামত বিনষ্ট হয়। আবার যদিও বা ধর্ষিতা হতভাগিনীকে পরীক্ষা করা হয় তখন বাধে বিপত্তি। তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয় এবং শরীরের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হয়। অনেকে মনে করেন এটাও এক প্রকার ধর্ষণ। তাই আর এ ধরনের নাজেহাল হওয়ার চেয়ে অপমানের গ্লানি কাঁধে নিয়ে সবকিছু চেপে গিয়ে মুখ বুজে বসে থাকেন। ফলে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা

নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরতিশয় জটিল ব্যাপার। যৌন সম্পর্কের সাথে কেবলমাত্র যৌন লালসা ও প্রবৃত্তির চরিতার্থতারই ব্যাপার জড়িত নয়, বংশ-রক্ষার ব্যাপারটিও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কেননা যৌন সম্পর্ক ছাড়া এই দুটি সমস্যার সমাধানের স্বভাবসম্মত পন্থা আর কিছু হতে পারে না। প্রাচীন কালের লোকেরা যৌন কামনা সম্পর্কে নানারূপ ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। অনেকে মনে করত, এই কামনাটা একটা অদৃশ্য শক্তি এবং মানুষের জীবন ও মৃত্যু এর ওপর নির্ভরশীল। অনেক মানুষ নিজেদেরকে এই শক্তির সম্মুখে নিতান্ত অসহায় মনে করত। এক কালের মানুষ যৌনশক্তি ও প্রবৃত্তির তাড়নাকে এক দৈব শক্তির প্রভাব বলে বিশ্বাস করত এবং তার কবল থেকে নিজেদের বংশধরদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে তার সন্তুষ্টি বিধানকে অপরিহার্য বলে মনে করত। এমনকি এ উদ্দেশ্যে তারা এই শক্তির প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে এই শক্তির পূজা-উপাসনায় লিপ্ত হতে শুরু করেছিল। অনেক গোত্র যৌন অঙ্গের আকার-আকৃতি বানিয়ে তারই পূজা করত। কেননা তারা মনে করত, বংশ রক্ষার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে এই অঙ্গ। অতএব যৌনাঙ্গের ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত রয়েছে। অনেক জাতির জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে যৌন অঙ্গের প্রকাশ ঘটানো হত। দুনিয়ার কোন কোন ধর্মে যৌনপ্রবৃত্তির পূজা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপেই গণ্য হত।[২৯৩]

আদিকাল থেকেই বৈধ যৌন সম্পর্কের পাশাপাশি চলে আসছে সামাজিক বিধি বহির্ভূত অবাধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নীতি। এই নীতির সার কথা হল, যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি যখন একটা স্বাভাবিক দাবি, তখন অপরাপর স্বাভাবিক দাবির ন্যায় এই দাবি পুরণেরও অবাধ ও উন্মুক্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা থাকা আবশ্যক। তাতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য বা হালাল-হারামের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। সেরূপ প্রশ্ন উঠলে তা হবে তাদের এই স্বাভাবিক দাবির প্রতিবন্ধক। অতএব যখন, যেখানে এবং যেভাবেই ইচ্ছা ও সম্ভব হবে, তখন সেখানেই সেভাবেই তার পরিপুরণের অধিকার থাকতে হবে।

সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক হচ্ছে মানবতার সঙ্কল্প ও সাহসিকতার পরাজয় এবং দুষ্প্রবৃত্তির মুকাবিলায় সুপ্রবৃত্তির চূড়ান্ত নৈরাশ্যের ঘোষণা। প্রথমটি স্বভাবসিদ্ধ ভাবধারার একদিকের সীমা-লংঘন। আর দ্বিতীয়টি সেই স্বভাবসিদ্ধ ভাবধারার আর এক সীমান্ত অতিক্রমণ। এই দুটিই স্বভাব ও প্রকৃতির

২৯৩. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রথম ভাবধারাটি মা ও বোন প্রভৃতি অতি আপনজনের সংস্পর্শও পরিহার্য করে তোলে। আর দ্বিতীয় ভাবধারাটি কাউকেই নিষ্কৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এটি চায় সর্বপ্রকার লালসা ও ভোগ-উপভোগের অবাধ অধিকার। এ মত অনুযায়ী যে কোন নারী-পুরুষ যেখানে এবং যখনই ইচ্ছা হবে, যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারবে। তাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ও ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। দুনিয়ায় বেশ্যা প্রথা চালু হওয়ার মূলে এই ভাবধারাই কাজ করছে। এ জন্যে বহু সমাজে বেশ্যাবৃত্তিকে বিশেষভাবে উৎসাহদান করা হয়েছে, যেন পূর্ণ স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা সহকারে অবাধে যৌন লালসা মেটানো সম্ভব হয়।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ যৌন স্বাদ-আস্বাদনের প্রাবল্য মানবেতিহাসের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময়ে তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কখনও এই-ব্যবস্থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন বলে প্রচার করা হয়েছে, আবার কখনও এটাকেই প্রকৃতির দাবি বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোথাও তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর পিছনে মানুষের যৌন লালসার অবাধ নিবৃত্তি স্পৃহাই যে প্রধানত কাজ করেছে, তা অবশ্যই স্বীকার্য।

যৌন আকাঙ্ক্ষা মানব জীবনে সর্বাধিক আকর্ষণীয়, মোহময় ও আবেগপূর্ণ এক প্রবৃত্তি। মানুষকে মাতাল, দিশেহারা-এমনকি কাণ্ডজ্ঞানশূন্যও করে দেয় তা। এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে একমাত্র পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার ধারণা। কিন্তু বর্তমান কালে এই ধারণাকে 'সেকেলে ও প্রতিক্রিয়াশীল' বলে মূল্যহীন ও গুরুত্বশূন্য করে দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ প্রতিবন্ধক ছিল অবৈধ গর্ভ সঞ্চারের ভয়। কিন্তু বর্তমানে গর্ভনিরোধক উপকরণ এবং 'ভেসেক্টমী' ও 'লাইগেশন' ব্যবস্থা এই ভয়কে সম্পূর্ণরূপে 'অমূলক' ও 'ভিত্তিহীন' বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এখন মানুষ ঠিক জীব-জন্তুর মতই নির্ভিকভাবে 'পাশবিক জীবন' যাপনের 'সৌভাগ্য' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এভাবে আধুনিক সমাজ মানুষের নৈতিক চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দিয়েছে। নারী ও পুরুষের দায়িত্বজ্ঞানকেও করেছে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সত্যিকার অর্থে আজকের মানুষ একেবারে নিঃস্ব, সর্বহারা। মানব সভ্যতার স্তম্ভসমূহ বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। মানুষ যেন নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে প্রস্তুত নয়। বিশেষ করে যৌন ব্যাপারে কোন রকমের নিয়ন্ত্রণ বা নিয়ম-নীতি পালনের বাধ্য বাধকতাকেও সে বরদাশত করতে রাযী নয়।[২৯৪]

এহেন মানসিকতার দরুণই একালে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। অথচ অতীতকাল থেকে নারী পুরুষ দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনে চিরদিন একত্র জীবন যাপনের শপথ গ্রহণের মাধ্যমেই যৌন আস্বাদনের পথ উন্মুক্ত হয়ে আসছে। একজন অপরজনের সুখ-দুঃখের চির সহচর হয়ে থাকার অটুট প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই ঘটেছে তাদের যৌন মিলন। কিন্তু এক্ষণে এসব কথা বাসি ফুলের মতই গন্ধহীন-পায়ের তলায় মাড়িয়ে দেয়া পথের ধুলি মাত্র। যৌন স্বাদ-আস্বাদন এক্ষণে একটা ক্ষণিক প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়ার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিছক পাশববৃত্তি চরিতার্থ করাই এর লক্ষ্য। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্পর্ক ও সামাজিক বিধি বহির্ভূত যৌনতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

যৌন সম্পর্ক ও ইসলাম

১.স্বাভাবিক যৌনতার গুরুত্ব

স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন বস্তু এমন নেই, যা মানুষকে তার যাবতীয় অন্যায় ও উপভোগের একটি সুনির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম। প্রাণিতত্ত্বের যৌন সম্পর্কই এমন একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ যা প্রত্যেক প্রাণীকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগায় এবং সর্বদা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত

২৯৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

রাখে। এমনকি এ বিষয়ে কোন এক বিশেষজ্ঞ উক্তি করেছেন যে, "মানুষ যদি কোন উদ্দেশ্যের জন্য জীবন ধারণ করে তবে সে উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র যৌন সম্পর্ক।"

স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের সমস্যাদি নিয়ে যিনি সবচেয়ে বেশি গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড।[২৯৫] তিনি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিগ্রস্ত অনেক ব্যক্তি সম্পর্কে গবেষণা চালানোর পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

(ক) যৌন মিলনের অনুভূতির অতিরিক্ত ছাপই এ সব মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।

(খ) স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কই মানব জীবনের প্রধান প্রভাব বিস্তারকারী।

(গ) মানুষের আনন্দ উপভোগের বিভিন্ন দিক, যৌন সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক যেমন নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক ইত্যাদির উপর যৌন সম্পর্কের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যৌনতার অপব্যবহার থেকেই কুচিন্তার সৃষ্টি হয়।[২৯৬]

২. অতিরিক্ত যৌনতার ক্ষতি

অতিরিক্ত যৌন মিলনের কারণে বিভিন্ন রোগজীবাণু সৃষ্টি হয় এবং এর দ্বারা নানারূপ মারাত্মক ব্যাধি জন্মে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

কোন কুমারী মেয়ের সাথে যৌন মিলনের দ্বারা এমনকি যদিও তা বাহ্য মিলন হয় তবুও এর দ্বারা অনেক সময় গর্ভসঞ্চার হয়। এবং তা হয় উভয়ের জন্য দুর্ভাগ্যের এবং মানসিক যন্ত্রণা ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টার কারণ। বিবাহ বন্ধনই নারী-পুরুষের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

৩. বিবাহই যৌন সম্পর্কের স্বাভাবিক পথ

পূর্ব যুগের খৃস্টান পাদ্রিগণ আত্মার পবিত্রতার উচ্চ সোপানে আরোহণের মানসে যৌন থেকে নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখতেন। কিন্তু যৌনতা সম্পর্কে এটা একটি ভ্রান্ত চিন্তা। অর্থাৎ যৌন মিলন সর্বাবস্থায় মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা ভ্রান্ত। ছেলেমেয়ে জন্ম দেয়া ছাড়াও নারী-পুরুষ বন্ধনের যে অনন্য গুরুত্ব রয়েছে, বর্তমান যুগে খৃস্টান পাদ্রিগণ তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলাম যৌন সম্পর্কের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কিন্তু ইসলাম সে সম্পর্ক তার প্রকৃত ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখে। সে সম্পর্কের ক্ষেত্র হচ্ছে একমাত্র বিবাহ বন্ধন। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ বন্ধনের দ্বারা পশুর ন্যায় একমাত্র যৌন সম্ভোগ উদ্দেশ্য নয়। ইসলামে এ সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[২৯৭]

পোশাক যেমন মানুষকে শীত ও গরমের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কও মানুষকে পদস্খলন ও জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মোট কথা দাম্পত্য সম্পর্ক হলো পুরুষের রক্ষাকবচ এবং নারীর আবরণ। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ-

"এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক

---

২৯৫. জিগমুন্ড ফ্রয়েড, প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী।

২৯৬. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ২০১৩ খৃ.), পৃ.৮৮

২৯৭. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ (২) : ১৮৭

ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে।"[২৯৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে।"

এরূপ বলা হয়নি যে, তোমাদের জন্য তোমাদের দেহের উপাদান থেকে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, বিবাহ বন্ধন হচ্ছে পরস্পর দেহের সাথে দেহের এবং হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের একান্ত মিলন। যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে, যে বিচ্ছেদ পারিবারিক জীবনের ভিত্তিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। "যাতে তোমরা শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে স্বীকার করা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনে রয়েছে স্থায়িত্ব ও শান্তি এবং এতে রয়েছে ভালবাসা ও দয়া।[২৯৯]

৪. যৌনতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের যৌন সম্ভোগের একটি স্থায়ী ও বুনিয়াদী বিধান রয়েছে। তাই ইসলাম বৈরাগ্যকে প্রশ্রয় দেয় না। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যৌন সম্ভোগ হতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণও নয়। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন :

«لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلامِ»

"ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই।"[৩০০]

বর্ণিত আছে, একবার তিনজন লোক রাসূলুলাহ্ (স.)-এর বিবিদের ঘরে রাসূল (স.)-এর ইবাদত সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইবাদত সম্পর্কে যখন তাদেরকে অবহিত করা হল তখন তারা একে অতি অল্প স্বল্প মনে করলেন। তাঁরা বললেন, আমরা কি তাঁর মত হতে পারি? তাঁর তো পূর্বের এবং পরবর্তী সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একজন বলল,"আমি সারা রাত নামাজের মধ্যে কাটাব।" অন্যজন বললেন, "আমি সারা জীবন রোজা রাখবো, রোজা ভঙ্গ করবো না।" তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, "আমি স্ত্রীর সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবো, কখনো বিবাহ করবো না।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (স.) সেখানে পদার্পণ করে বললেন, "তোমরা কি এমন কথা বলেছো? জেনে রাখো, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক পরহিযগার। কিন্তু আমি রোযাও রাখি আবার রোযা ছাড়াও থাকি। নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং দাম্পত্য সম্পর্কও রক্ষা করি। অতএব যে আমার সুন্নত হতে বিমুখ হবে সে আমার দলভুক্ত নয়।" রাসূলুল্লাহ্ (স.) বৈবাহিক পদ্ধতিতে যৌন সম্ভোগকে সওয়াবের কাজ মনে করতেন যদি এর উদ্দেশ্য হয় ব্যভিচার ও হারাম সম্পর্ক থেকে চরিত্রকে পবিত্র রাখা। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

"তোমাদের বিবিদের যৌন মিলন তোমাদের জন্য সাদাকা অর্থাৎ পুণ্যের কাজ। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ যদি প্রবৃত্তির চাহিদা মিটায় তাতেও কি তার পুণ্য হবে? তিনি

---

২৯৮. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম (২৯) : ২১

২৯৯. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৯০

৩০০. বাগাভী, *শরহুস সুন্নাহ* (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩ খৃ.) খ. ২, পৃ. হাদিস নং- ৪৮৪

বললেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, যদি তা হারাম উপায়ে চরিতার্থ করতো তাহলে তার জন্য পাপের কারণ হত? অনুরূপভাবে যদি তা হালাল উপায়ে চরিতার্থ কর তবে তাতে সওয়াব হবে।"[৩০১]

আর স্ত্রীদের অনেক সময় এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হয় যখন তারা তাদের স্বামীকে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হতে বাধা দিতে বাধ্য হয়। এ জন্যই ইসলাম বহু বিবাহের ব্যবস্থা রেখেছে স্ত্রীদের সমতার ভিত্তিতে। যাতে লোক ব্যভিচার হতে দূরে থাকতে পারে।

ব্যভিচার ও তার অপকারিতা

১. ব্যভিচার ও তার হীনতা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে ব্যভিচারজনিত অপরাধ। পাশ্চাত্য সভ্যতা এ তাদের আইন ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে অবিবাহিত নারী-পুরুষের মিলনকে বৈধ মনে করে, যদিও তা উভয়ের সম্মতিতে হয়। এসব কারণে সেখানকার শহরগুলোতে ব্যভিচারের ঘটনা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। অবাধ যৌন মিলন বৈধ হওয়ার কারণস্বরূপ তারা বলে যে, ঘরে যেমন নর্দমার প্রয়োজন তদ্রূপ লোকের জন্য বারবনিতারও প্রয়োজন। নর্দমাকে যদি ব্যবহারে না আনা হয় তবে তার পানি পুঁতি দুর্গন্ধময় হয়ে যায় এবং নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যভিচারকে সিদ্ধ করার জন্যে এ যুক্তি যথেষ্ট হতে পারে না। কারণ মানবগোষ্ঠীর একজন নারীকে এ হীন কাজে ব্যবহার করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। সুস্থ বিবেকের অধিকারী মানুষ মাত্রই ব্যভিচারকে ঘৃণা করে এবং এ অপকর্মকে অপরাধ বলে স্বীকার করে। এতদসত্ত্বেও এ ঘৃণ্য কাজ সমাজে প্রসারিত হওয়ার পিছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। সে সবের কিছু হচ্ছে অর্থনৈতিক আর কিছু হচ্ছে যুদ্ধ বিস্তার। বিবেকসচেতন ব্যক্তি মাত্রই ব্যভিচারে আতঙ্কিত হয় এবং এ অপরাধকে ঘৃণ্য মনে করে। এ অপরাধ সচ্চরিত্রের পরিপন্থী। কারণ প্রেম ও ভালবাসা ছাড়া ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে নর-নারীর মিলন কিছুতেই মন্দ ও ঘৃণা ব্যতীত বৈধ হতে পারে না। এরূপ নারীকে স্বয়ং ব্যভিচারী পুরুষও তুচ্ছজ্ঞান করে। সে যখন এসব নারীর সাথে মেলামেশা করে তখনও তার বিবেক এদেরকে হীন ও ঘৃণ্য মনে করে।[৩০২]

ব্যভিচারিণীরা প্রায়ই অস্থিরতা ও অধঃপতনে কালাতিপাত করে। এ সত্য স্বীকার করে তাদেরই একজন বলেছে, আমার মতো এ ঘৃণ্য পেশায় লিপ্ত নারীদের আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, নারীর সৃষ্টি স্বভাবত সাধ্বী ও সতী থাকার জন্য। সে একজন জীবনসঙ্গীকে মনেপ্রাণে ভালবাসবে, আজীবন তার সাথে নিষ্ঠার সাথে জীবন যাপন করবে। এতে অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, যে তার দেহ মনকে কলুষিত করবে। কারণ অসচ্চরিত্রা নারী মক্ষিকার মতো উপপত্নী হিসেবে লোকের সঙ্গিনী হয়। দাম্পত্য জীবনে ভালবাসাই হচ্ছে জান্নাততুল্য। যেখানে এ নিখুঁত ভালবাসা অনুপস্থিত সেখানে জীবন নরকতুল্য। যেখানে বিবেক দংশিত হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে সব বস্তুই ক্ষতিগ্রস্ত। এমনকি জীবনের আনন্দও। কারণ হীনতা ও তুচ্ছতার সাথে আনন্দ থাকতে পারে না।[৩০৩]

২. অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রেম ধ্বংস করে

অবৈধ গোপন যৌন সম্পর্ক অনেক শহরে প্রকাশ্য ব্যভিচারের স্থান দখল করেছে এবং অবৈধ সম্পর্ককে বৈধ বলে মনে করছে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বিকৃত যৌন সম্পর্ক। এর দ্বারা নারী-পুরুষের মধ্যে কোন স্থায়ী ও বৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ভালবাসা ও প্রীতির স্থায়ী সম্পর্কের জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধন

---

৩০১. মুসলিম, *আস-সহিহ*, (বৈরূত : দারু ইহইয়ায়িত্তুরাসিল আরাবী), খ. ২, পৃ. ৬৯৭, হাদিস নং ১০০৬।

৩০২. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*,প্রাগুক্ত, পৃ.১০৫

৩০৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

অবশ্যম্ভাবী। গোপন বিকৃত যৌন সম্পর্ক দাম্পত্য জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক হয় অনেকটা গোপনে। এতে প্রতিবেশী এবং সমাজের লোকে কি বলবে, এ নিয়ে উভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। এতে নারী-পুরুষ উভয়ে তাদের ভালবাসা ও অবৈধ সম্পর্ককে গোপন রাখার চেষ্টা করে। এতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়। মানুষের স্বভাব হচ্ছে যখন দুই ব্যক্তি একে অপরকে ভালবাসে তারা তাদের এ ভালবাসাকে মানুষের কাছে গোপন রাখতে চায় না। বরং তাদের উভয়েরই ইচ্ছা যেন তাদের এ ভালবাসার চর্চা হয়। ভালবাসা গোপন রাখার জন্য নয়। কারণ একে গোপন রাখলে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশে বিঘ্ন ঘটে।

৩. যৌন ব্যাধি ও তার অপকারিতা

ব্যভিচারের দ্বারা সিফিলিস ও প্রমেহ রোগের সৃষ্টি হয়।[৩০৪] এ দু'টি ব্যাধি বর্তমান বিশ্বে অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে। এ দুটি রোগ জন্ম নেয় বিশেষ ধরনের জীবাণু থেকে, যেগুলো যৌন মিলনের সময় সংক্রামকরূপে একজন থেকে অপর জনের দেহে প্রবেশ করে। অধুনা চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে উল্লিখিত ব্যাধি জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর আমি তার কতকটা উল্লেখ করছি।

সিফিলিস

সিফিলিসের তিনটি পর্যায় রয়েছে। **প্রথম পর্যায়:** বিষাক্ত জীবাণু শরীরের আবরণকে ছেদ করে অল্প সময়ের মধ্যে রক্তে প্রবেশ করে। সপ্তাহ খানেক পর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিস ব্যাধির প্রথম লক্ষণ হলো, জীবাণু সংক্রমণের পর নয় দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে এক ধরনের ফোড়া দেখা দেয়। সিফিলিসের ফোঁড়া বেশ শক্ত- যা পুরুষের যৌনাঙ্গে এবং নারীর যোনির অভ্যন্তরে দেখা দেয়। আর কখনো দেখা দেয় উভয় ওষ্ঠে, স্তনে, হাতের আঙুলে অথবা সিনার আশপাশে। সিফিলিসের ফোঁড়া দশ দিন থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রকার চিকিৎসা ছাড়া বিলুপ্ত হয়। কোন কোন সময় এতে ব্যাধি-মুক্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। কেননা তা হয়ত একেবারেই দেখা যায় না কিংবা এত ক্ষুদ্র হয় যে, তা ফোঁড়া বলে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয় পর্যায়: সিফিলিসের দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীরের কোন কোন অংশে ফোস্কা দেখা দেয়। অতঃপর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে উভয় হাতের তালুতে এবং পায়ের পাতায়ও দেখা দেয়। কোন কোন সময় ফোস্কা কাঁকরের ন্যায় জন্মে কিন্তু এতে চুলকানি হয় না এবং রক্ত পরীক্ষা করার পূর্বে তা সিফিলিসের ফোস্কা বলে নির্ণয় করা যায় না। আর কোন কোন সময় মুখের ভিতর, গলার ভিতর, যৌনাঙ্গ ও বুকের আশপাশে ফোঁড়ার ন্যায় দেখা দেয়। এতে কাশি, জ্বর ইত্যাদি ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং হাড়ের ভিতর ও জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কোন কোন সময় মাথার চুলও ঝরে যায় এবং এনিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। তখন চোখের দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়। ওষ্ঠে এবং মুখে সিফিলিসের ফোঁড়া থাকলে চুম্বনের মাধ্যমে তা সংক্রমিত হয়। এই ফোস্কা, ফোঁড়া হওয়ার দুইমাস অথবা ছয় মাসের মধ্যে দেখা দিয়ে অন্তত দুই বছর স্থায়ী হয়। সিফিলিসের উক্ত পর্যায়ও দুই সপ্তাহ থেকে বরো সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় পর্যায়: এটা সিফিলিসের শেষ পর্যায়। এটা কোন কোন সময় দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেখা দেয়। আবার কখনো দেখা দেয় অনেক বছর পর। অর্থাৎ পাঁচ থেকে পনের বছরের মধ্যে। এতে শরীরের মধ্যে জীবাণু থাকা সত্ত্বেও রোগী কোন কোন সময় তা অনুভব করতে পারে না। এই সিফিলিস সংক্রমিত হয় কম। কিন্তু রোগীর জন্য এটা খুবই মারাত্মক। এর জীবাণু শরীরের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যদ্দরুন দৃষ্টিশক্তি হারানো এবং উভয় ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, হাড়ের মগজ, ইত্যাদি শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশে মারাত্মক ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় হাড় এবং

---

৩০৪. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ.৯৬; Encyclopedia of Britannica, part-23, p 45

চামড়াতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন সময় এতে হাঁটুর গিরায় মারাত্মক ধরনের ক্ষত দেখা দেয় এবং হাড্ডির মধ্যে জ্বালাপোড়া ও চিবুকের নিচে গর্তের সৃষ্টি হয়। সিফিলিস তার তৃতীয় পর্যায়ে যদি হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসনালীর কেন্দ্রে আক্রমণ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। অনেক সময় এতে শরীর অবশ হয়ে রোগী উন্মাদ হয়ে যায় ও দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার ফলে শরীর তার কাঁপতে থাকে।[৩০৫]

প্রমেহ

'ভিক্টিরিয়া' নামক জীবাণু থেকে প্রমেহ সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হয় الجونوكوك। জীবাণুর বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, এটা যৌনাঙ্গ ও প্রস্রাব নালীর অভ্যন্তরীণ আবরণে প্রবেশ করে। যার ফলে যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়া ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। যৌনমিলনের সময় এই জীবানু নারী-পুরুষের একজন থেকে আর একজনে সংক্রমিত হয়। কোন কোন সময় উক্ত (الجونوكوك।) জীবাণু চোখের পর্দার ভিতর প্রবেশ করে। যদি দ্রুত এর চিকিৎসা না করে তা হলে রোগী প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়। প্রমেহ রোগের প্রাথমিক উপকরণগুলো এই রোগ সংক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগে। পুরুষের মধ্যে এই রোগ প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া ব্যথা-বেদনা অনুভূতি ও পুরুষাঙ্গের নালী থেকে পুঁজ অথবা সাদাবর্ণের এক ধরনের তরল পদার্থ বের হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। যদি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে দুই মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত অনবরত পুঁজ বের হতে থাকে। এই রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অংগেও সংক্রমিত হয়, তখন অণ্ডকোষ ও লজ্জাস্থানে জ্বালাপোড়া ও এক ধরনের শক্ত ফোড়ার সৃষ্টি হয়। যার ফলে অনেক সময় রোগী যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

মহিলাদের মধ্যে যখন এই রোগ সংক্রমিত হয় তখন রোগের প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যথা অনুভূত হয় না। তবে তারা পেটের নিচের অংশে ব্যথা অনুভব করে। প্রস্রাবের সাথে সাদা বর্ণের এক ধরনের পদার্থ বের হওযা এবং প্রস্রাবের সময় ব্যথা অনুভব করার লক্ষণ কখনো দেখা দেয়, আবার কখনো দেখা দেয় না। এই রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমিত হয়, তখন যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি হয় এবং রোগিনী বাঝা হয়ে যায়। প্রমেহর সংক্রমণ রোধ করা না হলে তা শরীরের অন্যান্য অংশেও প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূত্রাশয় ও ফুসফুস ইত্যাদিতে জ্বালাযন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। কোন কোন সময় হাড্ডিতেও ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কখনো তা মাথায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আর যদি জীবাণু রক্তে ও হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা হলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।[৩০৬]

কি কারণে একজন পুরুষকে নপুংসক আখ্যা দেয়া যায়? এর লক্ষণগুপলাই বা প্রথমত, যদি কারো পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়, তা পুরুষত্বহীনতার কারণ হতে পারে। কেউ বা হৃদরোগের জন্যও পুরুষত্ব হারাতে পারে। আবার ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে হৃদরোগের কোন উপসর্গ ছাড়াই অনেকে যৌনব্যাধির শিকার হতে পারেন। তবে রক্তের চলাচলে বাধা সৃষ্টি অবশ্যই এই রোগের অন্যতম লক্ষণ বলে ধরা যায়। হাইস্টনবেলের মেডিক্যাল কলেজের ব্রান্টলি স্কট অধুনা আবিষ্কার করেছেন পেলিল ইমপ্লান্ড। তাঁর মতে, যাদের মধ্যে এই রোগ এমন প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইমপ্লান্টের মাধ্যমে সহজেই তারা নিরাময় হয়ে উঠতে পারেন ।

দ্বিতীয়ত, বহুমূত্র রোগ পুরুষত্বহীনতার অন্যতম কারণ। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৫০ ভাগ বহুমূত্র রোগী পুরুষত্বহীনতায় ভুগছে। কেননা এই রোগ ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গকে নিস্তেজ করে ফেলে, খর্ব করে

---

৩০৫. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭; ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬; Dr. Lowry, Herself, P. 204

৩০৬. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮; Modern Medical Encyclopedia, Golden Press.

তার ঋজুতা। এ সম্পর্কে একজন রোগীর স্বীকারোক্তি শুনুন- প্রথমে আমি বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে তিনি জানান, বহুমূত্র রোগের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়ই এটি ঘটেছে। ডাক্তাররা এর পরের কারণ হিসেবে হরমোনের স্বাভাবিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষ হরমোনের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের একটি প্রধান ভূমিকা থাকলেও যৌন ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের তা থাকে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের যৌন ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে ।

চতুর্থ কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি হৃদরোগসহ অন্যান্য ব্যাধি উপশমের জন্যে অত্যধিক ঔষধ সেবন যৌন ক্ষমতা হ্রাস করে। এমন অনেক ঔষধ আছে রক্ত সঞ্চালনে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ছাড়া বেশিমাত্রায় মদ্যপানের ফলেও অনেকে পুরুষত্ব হারায়। মদ্যপায়ীদের ওপর এক পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের ৮০ ভাগ যৌন রোগের শিকার। অন্যদিকে মদ স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস করে দেয় এবং হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। এছাড়া সিগারেট, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি সেবনকারীরাও কমবেশি যৌন রোগের শিকার হয়ে থাকে।

তবে পুরুষত্বহীনতার মূল কারণ মানসিক না শারীরিক এ নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। মাস্টার্স ও জনসন জানিয়েছেন, পুরুষত্বহীন লোকের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগকেই দেখা গেছে মানসিক রোগী। আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেছেন এদের ষাট ভাগেরই রোগ শরীরে, মনে নয়। পুরুষত্বহীনতাকে যারা প্রধানত মানসিক রোগ বলে মনে করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু লোক প্রথমত পুরুষত্বহীনতায় ভোগে। বিয়ের পরও দীর্ঘদিন তারা কখনও যৌনমিলনে অংশ নেয়নি। নারীর স্পর্শ ছাড়াই তারা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে। মাস্টার্স ও জনসন উল্লেখ করেছেন, "এটা কড়া ধর্মীয় শাসন ও সামাজিক পশ্চাৎপদ পরিবার থেকে এসেছে। যারা যৌন মিলনকে একটি অপরাধ বলে মনে করে। অন্যদিকে বিয়ের আগে যারা মহিলাদের সংস্পর্শে এসেছে এবং বিষয়টি ভেতরে ভেতরে মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মাধ্যমিক পুরুষত্বহীনতায় ভোগে। এছাড়া দীর্ঘদিন অনভ্যাসের জীবন কাটলে জেল খাটলে, সমাজে নিগৃহীত হলে তাদের মনে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাও অনেক সময় যৌন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩০৭]

৪. অবৈধ সন্তান

অবৈধ যৌন মিলনের ফলে মানবদেহে নানা প্রকার রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এতে অবৈধ সন্তান জন্মেরও আশংকা থাকে। অবৈধ সন্তান না হওয়ার জন্য নানারূপ সাবধানতা অবলম্বন করা হলেও এর সম্ভাবনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অবৈধ সন্তান মানবিক অধিকার থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকে এবং তার জীবন ধারণ ও লালনপালনের সুযোগ-সুবিধা তার জন্য সহজলভ্য হয় না। তার স্বাভাবিক জীবন পথে অনেক বাধা-বিপত্তি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মাতাপিতার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তায় না; তবুও সমাজ অবৈধ সন্তানকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে সম্মত হয় না। অবৈধ সন্তান লালনপালনের কোন প্রতিষ্ঠানে তাকে প্রেরণ করা হলেও মাতাপিতার স্নেহ-মমতা ইত্যাদি অনেক প্রয়োজন থেকে সে বঞ্চিত হয়। অতএব সন্তানের জন্য এমন একটি গৃহের প্রয়োজন যেখানে তার মাতাপিতার অভিভাবকত্ব ও স্নেহ-মমতার স্বাভাবিকত্বে জীবন গড়ায় সহায়ক হয়।

ব্যভিচার প্রতিরোধে কঠোর বিধান না থাকার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করেছে। মাতাপিতার অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বিস্তার লাভ করে।

অবৈধ যৌন সম্ভোগের পাপ

৩০৭. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১০

১.ব্যভিচারের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কবিরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। এজন্যই আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"অবৈধ যৌন-সংযোগের কাছেও যেও না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৩০৮]

আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে অতি গর্হিত পন্থা বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যারা এ পন্থার অনুসরণ করবে তারা অতি মন্দ। আয়াতের প্রারম্ভেই না-বোধক শব্দ উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তার কারণ বর্ণনা করতে দুটি কারণই উল্লেখ করেছেন, যাতে সতর্কবাণী রয়েছে। লোকের জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টির আর এই গর্হিত কাজের নিকটবর্তী হওয়ার উপরই কঠিন নিষেধ বাণী রয়েছে, এতে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা।[৩০৯]

যেমন আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচার, আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা এবং অবৈধ হত্যার সাথে যুক্ত করে কিয়ামতে তার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70).

"এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ্কে ডাকে না, এবং যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। আর যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। তারা নয় যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকার্য করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩১০]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) ব্যভিচার থেকে সতর্ক করে বলেন

" يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِيَّاكُمْ وَالزِّنَا، فَإِنَّ فِيهِ سِتَّ خِصَالٍ، ثَلَاثٌ فِي الدُّنْيَا، وَثَلَاثٌ فِي الْآخِرَةِ، فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا: فَذَهَابُ الْبَهَاءِ، وَدَوَامُ الْفَقْرِ، وَقِصَرُ الْعُمُرِ، وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ: سَخَطُ اللهِ، وَسُوءُ الْحِسَابِ، وَالْخُلُودُ فِي النَّارِ "

"হে মুসলমানরা! তোমরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থেকো, কেননা তার ছয়টি মন্দ পরিণাম রয়েছে। তিনটি পৃথিবীতে এবং তিনটি আখিরাতে। পৃথিবীস্থ তিনটি হলো : (১) সৌন্দর্যহানি (২) দারিদ্র্য (৩) অকালমৃত্যু। আর পর জগতের তিনটি হলো : (১) আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি (২) হিসাবে মন্দ পরিণাম (৩) স্থায়ী জাহান্নাম।"[৩১১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (স.) যে সৌন্দর্যহানির উল্লেখ করেছেন তা ব্যভিচারীর প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন, কেননা ব্যভিচার ব্যভিচারীকে তার বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মিক পবিত্রতা হতে দূরে রাখে যা প্রকৃত শান্তি এবং সৌভাগ্যের উৎস ।

দ্বিতীয়ত, তিনি দরিদ্র বা অর্থাভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যভিচারী লোক অবৈধ প্রণয় মাধুর্যে মত্ত হয়ে সময় নষ্ট করে, বৈধ উপায়ে আয়ের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। ফলে সে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হয়। আর তিনি বলেছেন যে, ব্যভিচারীর জীবনকাল হ্রাস পেয়ে অকালমৃত্যু ঘটে।

---

৩০৮. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

৩০৯. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

৩১০. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান (২৫) : ৬৯-৭০।

৩১১. ইমাম বায়হাক্বী রহ. *শু'আবুল ঈমান*, (রিয়াযঃ মাকতাবাতুর রুশদি লিন্নাশরি ওয়াত্তাওযী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩) অধ্যায়: যৌনাঙ্গ হারাম হওয়ার ব্যাপারে, খ. ৭, পৃ. ৩৩২, হাদিস নং ৫০৯১

কারণ অবৈধ মিলনে ব্যভিচারীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে তাকে দুর্বল করে দেয়, যাতে তার স্বভাবের ফুর্তি লোপ পায় এবং সে নানরূপ মারাত্মক ব্যাধি যেমন ঃ সিফিলিস, গনোরিয়া, হৃদরোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। যার ফলে সে অকালে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।

অতি নিকৃষ্ট ব্যভিচার হলো পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

"আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে মহাপাপ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আবার প্রশ্ন করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, তোমার সাথে খাদ্যে অংশগ্রহণ করবে এ আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন ? তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।"[৩১২]

এক ব্যক্তির মধ্যে ব্যভিচার ও ঈমান একত্র হতে পারে না। কেননা প্রকৃত ঈমান প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রভুর অবাধ্যতায় বাধা দান করে।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،»،

"ব্যভিচারী ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না। আর চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। এবং যখন মদ পান করে তখনও মু'মিন থাকে না।"[৩১৩]

ব্যভিচার আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

" أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ "

"চার প্রকার লোককে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, (১) ঘন ঘন শপথকারী ব্যবসায়ী (২) যে দরিদ্র ব্যক্তি আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করে। (৩) বয়স্ক ব্যভিচারী (৪) অত্যাচারী শাসক।"[৩১৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

«لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ الزِّنَا، فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ»

"যতদিন আমার উম্মতের মধ্যে ব্যভিচার ছড়িয়ে না পড়বে, ততদিন তারা ভালই থাকবে । তাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সাধারণ শাস্তি অবতীর্ণ করবেন।"[৩১৫]

পাপ হিসেবে ব্যভিচারের কয়েকটি স্তর রয়েছে। অবিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া কঠিন পাপ। আর বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। আর পড়শীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পাপ আরো অধিক। তার চেয়ে মহাপাপ হলো যার সাথে কোন প্রকারে বিবাহই বৈধ নয় এমন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর বিবাহিতা নারীর ব্যভিচার অবিবাহিতা নারীর হতে জঘন্য। উভয় দলের শাস্তির তারতম্যে তা প্রকাশ পায়। আর বৃদ্ধের পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়ার দরুন যুবকের তুলনায় বৃদ্ধের ব্যভিচার জঘন্যতর, আর জাহিল ব্যক্তির তুলনায় আলিমের ব্যভিচার জঘন্যতম।

---

৩১২. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ* (দিমাশক: দারু তাওকুন নাজাহ, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হি.,), খ. ৬, পৃ. ১৮, হাদিস নং- ৪৪৭৭

৩১৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৬, হাদিস নং- ২৪৭৫; মুসলিম, *আস-সহিহ*, (বৈরূত, দারু ইহইয়ায়িত্তুরাসিল আরাবী,) অধ্যায়: পাপ দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কে, খ. ১, পৃ. ৭৭, হাদিস নং- ৫৭।

৩১৪. ইমাম নাসাঈ রহ. *আস-সুনান*, (বৈরূত. মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.) খ. ৩, পৃ. ৬৯, হাদিস নং- ২৩৬৮

৩১৫. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, *মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ*, (প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.), খ. ৪৪, পৃ. ৪১২, হাদিস নং- ২৬৮০৩

২. ব্যভিচারের শাস্তি

উপরের আয়াতে বা হাদীসে বর্ণিত তিরস্কার ঐ সকল অসুস্থ আত্মার উপর কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া করে না, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশির উপর নিজেদেরকে অর্পণ করেছে এবং তারা প্রতিটি অপকর্মকে বৈধ মনে করেছে এবং প্রত্যেক স্থলেই তারা প্রকাশ্যে সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করে বেড়ায়। ধর্মীয় আদেশাবলী বা তাদের আন্তরিক ইচ্ছা তাদেরকে ঐ সকল কার্য হতে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। ঐ সকল ধর্মদ্রোহীর জন্য ইসলাম এমন ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে, যা জাতিকে ঐ সকল কুকর্মের কুফল হতে পরিত্রাণ দিতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ কশাঘাত করবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও, মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৩১৬]

এ আয়াতে ব্যভিচারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। আর তাদের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থায় কোন শৈথিল্য দেখাতে নিষেধ করা হয়েছ যেন তা ব্যাভিচারীদের অন্তরকে আরো আঘাত করে, আর তা দৃষ্টান্ত হয় অন্যদের জন্য।

পরবর্তী আয়াতে ব্যভিচারের নিন্দা করে ইরশাদ করা হয়েছে,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক মহিলা ব্যতীত বিবাহ করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করবে না। মু'মিনদের জন্য এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৩১৭]

অতএব যারা এ কাজে লিপ্ত হয় প্রকৃত মু'মিনাবস্থায় এ কাজে লিপ্ত হয় না। আর এ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর কোন ঈমানদারের অন্তর ঐ সকল লোকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না, যারা এ সকল নিন্দনীয় পাপের দরুন ঈমানের চাহিদা থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা তারা এ সকল সম্বন্ধ হতে দূরে থাকাটাই কামনা করে। এমনকি ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, একজন ব্যভিচারীর সাথে সাধ্বী নারীর এবং একজন চরিত্রবান পুরুষের সাথে ব্যভিচারিণীর বিবাহ হারাম। হ্যাঁ যদি তারা এমন তওবা করে, যা তাদেরকে এ অপবিত্রতা হতে পবিত্র করে দেয়, তবে বিবাহ বৈধ।

ইসলাম ঐ সকল পাপযুক্ত যৌন মিলনের সাথে বৈরিতা পোষণ করে যা একটি পরিবার গঠনকে লক্ষ্য করে হয় না বা সম্মিলিত জীবন ধারণ যাদের লক্ষ্য নয়। কেননা দুটি আত্মা, দুটি দেহ বা প্রাণের বৈধ সংমিশ্রণে এমন একটি পারিবারিক জীবনের ভিত গঠন করার ইচ্ছা করে, যাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সম্মিলিত জীবন আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ এবং কাঙ্ক্ষিত উত্তরাধিকার সৃষ্টি। এ কারণেই ইসলামে ব্যভিচার রোধকল্পে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। কেননা ব্যভিচার এসব আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা সৃষ্টি করে।[৩১৮]

ব্যভিচারের ফলে অনেক রকম বিপদ দেখা দেয়, যেমন নফ্সের গোলমাল, শত্রুতার প্রসার এবং পারিবারিক জীবনে অশান্তি ইত্যাদি এবং প্রত্যেকটি কারণই কঠিন শাস্তি প্রবর্তনের জন্য যথেষ্ট।

---

৩১৬. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ২

৩১৭. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ৩

৩১৮. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫

যখন ব্যভিচারের অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন ইসলাম এ অপরাধের শাস্তি বিধানের সহজ পন্থা অবলম্বনের কোন উপায় আছে কিনা এবং অপরাধীকে কোন কারণে শাস্তি প্রয়োগ থেকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা সর্বপ্রথম ইসলাম সেটাই বিবেচনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ.

"যথাসম্ভব মুসলমানকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করো। যদি এ শাস্তি হতে পরিত্রাণের কোন পথ বের হয়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা বিচারকের ক্ষমার ব্যাপারে ভুল করা শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ভুল করা হতে উত্তম।"[৩১৯]

এ জন্যই ইসলাম ব্যভিচারের শাস্তি সাব্যস্তের জন্য এমন চারজন মুসলিম পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় মনে করে যারা সুবিবেচক হবে এবং কার্যে লিপ্ত অবস্থায় তাদেরকে দেখেছে বলে স্বীকার করবে।

এমতাবস্থায় ধারণা করা যেতে পারে যে, এ শাস্তি একটি কাল্পনিকব্যবস্থা। কেননা এ ব্যবস্থায় কেউই শাস্তির আওতায় পড়বে না। কেননা এরূপ সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়াই মুশকিল হবে। কিন্তু এ শাস্তি বিধান দ্বারা ইসলাম শাস্তি সংঘটিত হওয়া কামনা করে না; বরং এ অপরাধের প্রতি প্রলুব্ধ করে এমন কারণগুলি হতে রক্ষা করাই ইসলামের কাম্য।

আর এ শাস্তির আওতায় ঐ সকল লোক ব্যতীত আর কেউই পড়বে না যারা প্রকাশ্যে যৌন কামনা চরিতার্থে লিপ্ত হয়। ফলে লোকের নজরে পড়ে। অথবা অপরাধী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপরাধ স্বীকার করে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে এরূপ অপরাধ স্বীকার করেছিল।

অতএব যখন চারজন বিশ্বস্ত সাক্ষী সাক্ষ্য দান করবে, তখন কোন প্রকার শৈথিল্য ব্যতীত ব্যভিচারীদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। আর তাদের উপর শিথিলতা বা দয়া দেখান হবে মানব সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর।

পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের জন্য ব্যভিচারের শাস্তি হল বেত্রাঘাত আর এ শাস্তির যোগ্য সে তখনই হবে যখন সে মুসলমান বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন ও স্বাধীন হয়। আর যারা বিশুদ্ধভাবে বিবাহিত তাদের শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

৩. ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের ক্ষতি

সমাজকে অপকর্ম হতে রক্ষায় শুধুমাত্র ব্যভিচারের কঠোর শাস্তিই যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা হতে রক্ষা পাওয়ার অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হবে, যেমন মিথ্যা প্রচারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, মিথ্যা অপবাদ রটনা হতে মিথ্যা অপবাদকারীদের মুখ বন্ধ করা, যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীতই তাদেরকে এ অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের শাস্তি বিধান করা। এ ব্যাপারেই আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"আর যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই সত্যত্যাগী ।"[৩২০]

নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ ছাড়া সাধ্বী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও তা প্রচার রোধ করা না হলে যেকোন সৎ পুরুষ বা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপের পথ প্রশস্ত হবে। যেকোন নারী বা পুরুষ এবং সম্প্রদায়ের মান-সম্মান কলুষিত হওয়ার ও সুনাম নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকবে। যে কোন স্বামী মামুলী

---

৩১৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, (বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামি, প্রকাশকাল, ১৯৯৮ খৃ.), খ. ৩, পৃ. ৮৫। হাদিস নং ১৪২৪; ইমাম বায়হাক্বী রহ. *আস-সুনানুল কুবরা*, প্রাগুক্ত খ. ৮ , পৃ. ৪১৩, হাদিস নং ১৭০৫৭

৩২০. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ৪

সন্দেহের কারণে তার স্ত্রীকে সন্দেহের চোখে দেখবে। স্বার্থপর লোকের মিথ্যা প্রচারের দরুন অনেক পরিবারের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হতে পারে। এতে সমাজ নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। অনেক সময় নিরপরাধ লোকদের এ সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আর যখন অপবাদের প্রচার সমাজে নিরপরাধদেরকে ও ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করে- কেননা এতে গোটা সমাজই কলুষিত হয়। তখন যে সৎ তার মনেও এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সেও একে সহজ কাজ বলে মনে করে। অতএব যে সকল মিথ্যা অপবাদ হতে মান-সম্ভ্রম রক্ষাকল্পে এবং যে সকল মিথ্যাপবাদের দরুন যে মনোকষ্ট অনুভূত হয়, তা হতে রক্ষা করার মানসে কুরআনে মিথ্যা অপবাদের শাস্তিকে কঠোর করা হয়েছে। আর এর জন্য ব্যভিচারের শাস্তির প্রায় সমান শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে আশিটি বেত্রাঘাত। সাক্ষীর অযোগ্য ঘোষণা করা এবং তাকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করা। প্রথম শাস্তি শারীরিক আর দ্বিতীয়টি সংযত করার জন্য আর অপবাদকারীর কথার মূল্য রহিত করে দেওয়া তার অপমানের জন্য যথেষ্ট। যেমন বলা হয়েছে, তার কোন সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়, তার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।[৩২১]

এ সকল অবস্থা তখনই হবে যখন অপবাদ আরোপকারী এমন চারজন সাক্ষী অসমর্থ হবে যারা স্বচক্ষে ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে বা তার সাথে আরও তিনজন সাক্ষী যারা প্রত্যক্ষভাবে তাকে কার্যরতাবস্থায় দেখেছে। তা হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কাজ করেছে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

নির্দোষ নারীদেরকে ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত করাকে কুরআনে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে, আর যে কবীরা গুনাহ করে সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়। আর পরকালে তার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25)

"যারা সাধ্বী, সরলমনা, বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। যেদিন তাদের বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদেরই রসনা, তাদের হস্ত ও তাদের চরণ। তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তারা জানবে। সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপরি দেবেন। আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।"[৩২২]

যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স.) নারীদের অপবাদ করাকে কবীরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»

"তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসকারী কাজ হতে আত্মরক্ষা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেগুলো কি? তিনি বললেন, তা হলো (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) জাদু করা (৩) এমন প্রাণীকে হত্যা করা, যার হত্যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা (৬) যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা (৭) মু'মিন সাধ্বী সরলমনা স্ত্রীলোকের দুর্নাম রটনা করা।"[৩২৩]

৪. অশ্লীলতা প্রচারের গুনাহ

এমন কতক অসুস্থমনা লোক রয়েছে যারা কান কথা প্রচার করা এবং লোকের কাছে অন্যের কুৎসা প্রচার করে বেড়াতেই আনন্দ অনুভব করে। হয়ত হিংসার বশবর্তী হয়েই তারা একাজ করে বা কোন নির্দিষ্ট

---

৩২১. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৭

৩২২. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ২৩-২৫

৩২৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১০, হাদিস নং- ২৭৬৬; মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯২, হাদিস নং ৮৯।

শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তারা এ কাজে লিপ্ত হয়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"[৩২৪]

সমাজ ও ব্যক্তির মর্যাদা উপেক্ষা করে যেসব পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী অশ্লীলতা প্রচারে লিপ্ত থাকে উক্ত শাস্তি সেসব পত্রপত্রিকার সম্পাদক প্রকাশকদের প্রতি কঠোরভাবে প্রযোজ্য।

কারো কাছ থেকে অশ্লীলতা প্রকাশিত হলে লোকমুখে তার চর্চা হয়। তার জন্য অপরাধীর কোন মর্যাদা লোক সমাজে অবশিষ্ট থাকে না। যখন মানুষের বিশ্বস্ততা থেকে সে বঞ্চিত হয়, তখন অপরাধ সংঘটনে আর কোন বাধা থাকে না এবং তওবার দ্বারও তার প্রতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ইসলাম চায় যে, মানুষের ভাল গুণগুলো সমাজে প্রচারিত হোক এবং মুখ ও লোকচক্ষু হতে মানুষের মন্দকে আড়ালে রাখা হোক।[৩২৫]

আজকাল যে সকল বই-পুস্তক বা পত্রপত্রিকা লোকের সম্মুখে অন্যের কুৎসা রটনায় তৎপর এবং তারা এমনভাবে প্রচার করে যেন এসব অকাট্য সত্য, এতে তারা মানুষের মান-সম্মানের প্রতি কোন মূল্য দেয় না এবং সমাজের প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ করে না।

ইসলাম লোকের মধ্যে সুনাম ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা করে আর নিন্দা গ্লানি ইত্যাদি লোকের কথাবার্তা ও চক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি পাপ করে এবং লোকের মধ্যে বলে বেড়ায় সে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবে না।" তিনি বলেন,

" كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ "

"আমার সকল উম্মতকেই ক্ষমা করা হবে যারা প্রকাশ্যে পাপ করে বেড়ায় তাদের ব্যতীত। পাপ প্রকাশ করা হলো- এক ব্যক্তি হয়তবা কোন খারাপ কাজ করলো আল্লাহ্ তাকে লুকিয়ে রাখলেন কিন্তু সকালে সে লোকের মধ্যে বলে বেড়ায় যে, হে অমুক! আমি গত রাতে এমন খারাপ কাজ করেছি। রাতে আল্লাহ্ তাআলা তার পাপ পর্দায় রেখেছিলেন, সকালে সে আল্লাহর সে পর্দা উন্মোচন করে দেয়।"[৩২৬]

যৌন সম্পর্কের সীমা ও তার বিধান

যৌন সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক এমন নারী-পুরুষের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় যাদের মধ্যে এমন কোন নিকট সম্পর্ক নেই। যাতে তাদের উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ এবং প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি পায়। কেননা স্বভাবত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক সহজে বাড়ে না। কারণ প্রায়শ নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তি হয় পরস্পর সম্মান প্রদর্শনের উপর। এ জন্যই ইসলাম এ সকল দিক শিক্ষা করে অতি নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কঠিনভাবে অবৈধ করেছে।

১.নারীদের মধ্যে যাদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ

ইসলাম অতি কঠোরতার সাথে নারীদের মধ্যে কয়েক প্রকারের নারীকে বিবাহ করা হারাম করেছে। আর একে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করেছে। যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের পুরাভাগে রয়েছে পিতার স্ত্রী। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

৩২৪. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ১৯

৩২৫. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯

৩২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ২০, হাদিস নং- ৬০৬৯; মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৯১, হাদিস নং ২৯৯০।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতা যাদেরকে বিবাহ করেছে তাদেরকে বিবাহ করো না , পূর্বে যা হয়েছে হয়েছে। এটা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৩২৭]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এ কাজকে 'ফাহিশা' ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা পিতার স্ত্রী মাতৃতুল্য। অতএব তার সাথে যৌন মিলন হবে নিতান্তই অমিল ব্যাপার, যেমন আল্লাহ্ তাআলা এ কাজকে 'মাক্ত' বলেও উল্লেখ করেছেন। 'মাক্ত' বলা হয় অতীব নীচ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে যার কর্তা হবে আল্লাহর কাছে অতীব জঘন্য পাপাচারী। অতঃপর আল্লাহ এ কাজকে وَسَاءَ سَبِيلًا বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ এ কাজের কর্তা যে পথে চলবে এ পথ অতীব মন্দ ও নিকৃষ্ট।

অতঃপর কুরআনে অন্যান্য হারাম নারীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

"তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাতিজা, ভাগিনী, দুধমাতা, দুধভাগিনী, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদিগের মধ্যে যার সাথে সঙ্গম হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাদের সাথে সঙ্গম না হয়ে থাকে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা। পূর্বে যা হয়েছে তা ভিন্ন কথা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[৩২৮]

কোন কোন সমাজে আয়াতে উল্লিখিত কারো সাথে সম্ভোগ চরিতার্থকে সহজ মনে করা হয়; কিন্তু সুস্থ স্বভাবের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখে। কেননা কুরআনের এ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে ঐ সকল নারী রয়েছে যাদের সাথে ঐ পুরুষের আত্মীয়তার এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যে স্বভাবত তাদের দিকে যৌন আকর্ষণ হয় না এবং স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ ব্যতিরেকে সুস্থ ও সবল সন্তান জন্মায় না।

যদি ইসলাম ঐসব নিকট আত্মীয়দের দিকে যৌন স্পৃহার পথ বন্ধ না করতো তা হলে ঐ সকল নারী ও পুরুষের মধ্যে তাদের একত্রে মিলেমিশে থাকার দরুন এবং মিলনের অবাধ সুযোগের কারণে বিশৃংখলার আশংকা বিরাজ করত। ঐ সকল নারী এবং পুরুষের মধ্যে রয়েছে সম্মান ও স্নেহ-মমতার সম্পর্ক। এ সকল সম্পর্কের আদান-প্রদান আর বৈবাহিক সম্বন্ধের কথাবার্তা একত্রিত হতে পারে না, তাতে দুই ভিন্নমুখী ভাবের আদান-প্রদান একত্রিত হয়ে ঝগড়া-বিবাদ, বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। এবং নিকটাত্মীয়তা ও পারিবারিক সম্পর্ক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হতো। কুরআনুল করীমে আল্লাহ তাআলার উক্তি,

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

এ অংশে আল্লাহ স্তন্যদানকারীকে মা বলে উল্লেখ করেছেন আর তার কন্যাকে বলা হয়েছে তার বোন। এতে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুধের সম্পর্কও নসব সমতুল্য! এজন্যই নবী করীম (সা) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

"আল্লাহ তাআলা স্তন্যদানের ক্ষেত্রে তা-ই হারাম করেছেন যা নসবের সম্পর্কে হারাম করেছেন।"[৩২৯]

---

৩২৭. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ২২

৩২৮. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ২৩

৩২৯. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত খ. ২, পৃ. ৪৪৩। হাদিস নং ১১৪৬

স্তন্যপানের পরিমাণের মধ্যে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোন ফকীহ-এর মতে শুধু স্তন্যপানের দ্বারাই এ বৈবাহিক অবৈধতা সাব্যস্ত হবে পরিমাণ অল্প হলেও। কিন্তু প্রধান মতানুযায়ী পেট ভরে পাঁচবার স্তন্যপান ব্যতীত এ অবৈধতা সাব্যস্ত হবে না। আর এ স্তন্যপানের জন্য পানকারীর দু'বছরের পূর্ব পর্যন্ত সময় শর্ত করা হয়েছে যখন দুধই তার প্রধান খাদ্য থাকে । অতএব মায়ের স্তন্যপানকারী শিশুর গোশত বর্ধনে এবং তার হাড়ের গঠনে তা অংশ নেয়। আর তাদের মধ্যে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।[৩৩০]

উপরোক্ত আয়াতে বিবাহে দুই বোনকে একত্র করতে হারাম করা হয়েছে। কারণ স্ত্রীর বোন যদি স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত হয়, তাছাড়া দুই সহোদর বোনকে একত্রে বিবাহ করলে দুই সতীনের মধ্যে স্বভাবত যে আত্মশ্লাঘার আশংকা করা হয় তা ক্রমশ হিংসার অনলকে দুইবোনের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে, যার ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা দেবে ঝগড়া-কলহ এবং আত্মীয়তার বন্ধনে ভাঙন। ইসলাম দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার ন্যায় ফুফু-ভাইজী, খালা-বোন ঝিকে একত্রে বিবাহ করা হারাম করেছে।

২. সমকামিতা

সমকামিতা একটি অস্বাভাবিক যৌন সম্ভোগ। কেননা এ হচ্ছে পুরুষের সাথে পুরুষের যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করা। এর সামাজিক, ব্যক্তিগত এবং বংশগত বিভিন্ন কারণ থাকে।

যৌন সম্পর্কের একটি পবিত্র দিক রয়েছে। আর পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন ক্ষেত্র ব্যতীত এ পবিত্র দিক অনুসারে এর সমাধান হতে পারে না। এ সনাতন রীতিই আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর মধ্যে চালু রেখেছেন। এ সীমার বাইরে গেলেই তা আল্লাহ প্রদত্ত রীতি বা নিয়মের বিরোধিতা করা হবে।

তাহলে বোঝা গেল, বৈবাহিক নিয়মাধীন পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন ব্যতীত যৌন পিপাসা নিবৃত্তি হতে পারে না। এতদুভয়ের মধ্যে কেউ অন্যকে ত্যাগ করে অন্য পথাবলম্বী বলেই তা তার পক্ষে এমন পাপ সাব্যস্ত হবে, যা হবে ক্ষমার অযোগ্য।

অতএব সমকাম এমন একটি পন্থা, যাকে পবিত্র লোকেরা ঘৃণাভরে ত্যাগ করে। যে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত কেউই তা গ্রহণ করবে না। এখান থেকেই ইসলাম সমকামিতার বিরোধিতা করেছে এবং কঠোর শাস্তির মাধ্যমে এর মূলোৎপাটন করেছে। কেননা এতে স্ত্রী-পুরুষের পবিত্র মিলনের বিপরীত পন্থাবলম্বনের পাপ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ.

"তোমরা যাকে লূত সম্প্রদায়ের মত কাজ করতে পাও, সেই কাজের যে কর্তা তাকে এবং যার সাথে সে কাজ করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা কর ।"[৩৩১]

আল্লাহর নবি লূত (আ)-এর সম্প্রদায় যাদের মধ্যে এ ঘৃণিত কাজ প্রসার লাভ করেছিল তাদের ঘটনার বিবরণ কুরআনে বলা হয়েছে। তাদের নবী তাদেরকে এ কাজ হতে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের এই ঘৃণ্য কার্য হতে নিবৃত্ত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ ফেরেশতা প্রেরণ করলেন, তারা তাদের জনবসতি উল্টিয়ে দিলেন। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর উত্তপ্ত প্রস্তর বর্ষণ করলেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

---

৩৩০. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

৩৩১. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত খ. ৩, পৃ. ১০৯। হাদিস নং ১১৫৬; ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ, (মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ*, প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.) খ. ৩, পৃ. ২১৯, হাদিস নং ২৭৩২

"অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম প্রস্তর-কংকর, যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল, এটা সীমালংঘনকারীদের থেকে দূরে নয়।"[৩৩২]

কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে, যে সম্প্রদায়ই এদের মতো এ কাজে লিপ্ত হবে শাস্তি তাদের হতে দূরে নয়। অতএব যারা এ সমকামে লিপ্ত তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত। আর আল্লাহ্ পাক যে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন,

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ورددها ثلاثا

"যারা লূত সম্প্রদায়ের কাজের মত কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তিনি তিনবার এর পুনরুক্তি করেন।"[৩৩৩] তিনি আরো বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

"আমি আমার উম্মতের যে সকল কাজের জন্য ভয় করি তন্মধ্যে অতীব ভয় করি লূত সম্প্রদায়ের আমলের মতো আমলের।"[৩৩৪]

৩. স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা

সম্মানজনক বৈবাহিকতা বন্ধনে নর ও নারীর যৌন সম্পর্ককে ইসলাম বৈধ সাব্যস্ত করে। অতএব এতে উভয়ের একে অন্যের উপর কোন প্রকারে সীমালঙ্ঘন না করা ওয়াজিব। আর কারো কাছে একে অন্যের গুপ্ত কথা প্রকাশ করাও অবৈধ। রাসূল (স.) বলেন,

«إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ، يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»

"কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর কাছে অতি মন্দ ব্যক্তি হবে ঐ লোক যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে আর স্ত্রী তার সাথে সঙ্গমরত হয়। অতঃপর তাদের গোপন বিষয় লোকের কাছে প্রকাশ করে।"[৩৩৫]

৪. ঋতুস্রাবকালে যৌন মিলন নিষিদ্ধ

যৌন মিলনে মানসিক ও শারীরিক সকল প্রকার ক্ষতি হতে সংরক্ষণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য। তাই ইসলাম ঋতুস্রাবকালে স্ত্রী সঙ্গমকে হারাম করেছে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, এটা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।"[৩৩৬]

উক্ত আয়াতটি স্রাবকালকে কষ্টদায়ক বর্ণনা করে হায়েয বা স্রাবকালে পুরুষকে স্ত্রীগমনে নিষেধ করে। এ আয়াতে اذى শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তার দুই অর্থ হতে পারে। এর এক অর্থ- কষ্ট এবং ক্ষতি, অন্য

---

৩৩২. আল-কুরআন, সূরা হূদ (১১) : ৮২-৮৩

৩৩৩. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৬, হাদিস নং ২৮১৬

৩৩৪. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৩১৭, হাদিস নং ১৫০৯৩; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১০। হাদিস নং- ১৪৫৭

৩৩৫. ইমাম আবূ বকর ইব্ন শায়বা, *আল-মুসান্নাফ* (রিয়াযঃ মাকতাবাতুর রুশদি, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.) খ. ৪, পৃ. ৩৯, হাদিস নং- ১৭৫৫৯

৩৩৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারা (২) : ২২২

অর্থ- এমন অপবিত্রতা যা লোকে অপছন্দ করে। স্রাবকালীন সঙ্গমে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য এ উভয় প্রকার কষ্টই বিদ্যমান রয়েছে। অধিকন্তু তাতে জরায়ুর সংকোচন বৃদ্ধি পেতে পারে। যদ্দরুন নানাবিধ রোগ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন এর ফলে কারো রজঃস্রাবে নানা বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং জরায়ুতে জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি হয়। তদুপরি আঘাত লাগার দরুন নারীদের কষ্ট অনুভূত হয়, যাতে এর শিরা উপশিরাগুলি আঘাত প্রাপ্ত হয়। কেননা এ সময় শিরাগুলি এমনিতেই ব্যথিত থাকে। যেমন অভ্যন্তরীণ হরমোনগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অন্য বস্তুর প্রবাহের দরুন এ সময় তার যৌন ক্ষুধা নিস্তেজ থাকে। নারীদের মধ্যেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, নরের মধ্যে নয়। অন্যান্য জীবজন্তুর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় এ অবস্থায় তাদের মধ্যে এর কোন খবরই থাকে না। তারা কোন কষ্টও অনুভব করে না। আর এ জন্য তাদের কোন আরাম-আয়েশেরও প্রয়োজন হয় না।[৩৩৭]

স্রাব অবস্থায় সঙ্গমে লিপ্ত হলে নারীর তুলনায় নরের যে কম কষ্ট হয় তা নয় বরং এ অবস্থায় সংগমকালে নারীদের বাচ্চাদান হতে অনেক সময় রক্তমিশ্রিত নানা প্রকার জীবাণু নির্গত হয়ে তাদের প্রস্রাবনালিতে প্রবেশ করে।

এ সকল কারণে স্রাব অবস্থায় স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন। আর হায়েয হতে উত্তমরূপে পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে সঙ্গম হারাম করেছেন। আর এ অবস্থায় তাদেরকে উত্তেজিত করতে নিষেধ করেছেন যেমন উক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গম বর্জন করবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গম করবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।"[৩৩৮]

---

৩৩৭. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫

৩৩৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা (২) : ২২২

চতুর্থ অধ্যায়
ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইভ-টিজিং
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অশ্লীলতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যিনা-ব্যভিচার
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ধর্ষণ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : পতিতাবৃত্তি
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : অপবাদ আরোপ

ক্রমবর্ধমান সামাজিক সমস্যাবলি

এই অভিসন্দর্ভে সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাসমূহের মধ্য থেকে কয়েকটি প্রধানতম সমস্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু এই অভিসন্দর্ভের বিষয় হলো সূরা নূরের আলোকে সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান সেহেতু এখানে সে সমস্যাগুলোই নির্ধারণ ও নির্বাচন করা হয়েছে যে সমস্যাগুলোর সমাধান সূরা আন্-নূরে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশনার আলোকে সমাধানযোগ্য। কেউ যদি এ নির্বাচন থেকে এই মনে করেন যে, সমাজে বিরাজমান যত সমস্যা রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে সে সমস্যাগুলো নির্ধারণ করেছি, তা সঠিক নয়। কারণ দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে সমস্যার প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া একেক জন মানুষ একেকভাবে বিশ্লেষণ করে, গবেষকদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। সে কারণে এ দাবি করা যাবে না, সমাজে বিরাজমান সকল সমস্যা এখানে আলোচিত হচ্ছে। বরং এ দাবিই সঙ্গত হবে যে, সমাজে বিরাজমান সমস্যাসমূহের মধ্যে প্রভাব, প্রতিত্রিয়া, ক্ষতি করার ক্ষমতা এবং বিস্তার বিবেচনায় এ সমস্যাগুলোই প্রধান। এ ছাড়াও মানব সমাজে আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে নির্বাচিত সমস্যাগুলোর সমাধান যদি সূরা আন্-নূর তথা ইসলামের আলোকে করা হয়, তাহলে অবশিষ্ট সমস্যাগুলো আর থাকবে না। বরং এগুলোর সাথে স্বাভাবিক ধারায় এমনিতেই নির্মুল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আলোচনার জন্য নির্ধারিত সমস্যাগুলো হলো :

১.ইভ-টিজিং
২.অশ্লীলতা
৩.যিনা-ব্যভিচার
৪.ধর্ষণ
৫.পতিতাবৃত্তি
৬.অপবাদ আরোপ

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইভটিজিং

ইভটিজিং (Eve Teasing)

ইসলামে ইভটিজিং-এর স্থান নেই। বর্তমানে আমাদের সমাজে নতুন একটি অসচ্চরিত্রের উন্মেষ ঘটেছে যার নাম ইভটিজিং। ইভটিজিং বা নারীদের উত্যক্ত করা ও যৌন হয়রানি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। প্রতিদিনই বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এ বিষয় সংবাদ আসছে। মেয়েরা ছেলেদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মেয়েদের প্রতি ছেলেরা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছে, নানাভাবে মেয়েদের উত্যক্ত করছে। মেয়েরা অসহায়ের মতো নীরবে ক্ষোভ, ঘৃণা ও অপমান হজম করছে। কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে প্রতিশোধ নিতে পারছে না। ফলে তারা প্রায়ই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। শুধুমাত্র অপমানের কারণেই তারা আত্মহত্যা করছে। এটি আমাদের সমাজের জন্য একটি জঘন্য, ঘৃণিত ও কলঙ্কের বিষয়। ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতা, অভিভাবকসহ সমাজের সকলের সজাগ ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যারা ইভটিজিং-এর মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত

তারাও নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদেরও বোন-ভাগ্নী, কন্যা থাকতে পারে, তারাও এ অপমানের শিকার হতে পারে। কাজেই অন্য মেয়েদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি না দিয়ে, অশ্লীল ও অশালীন আচরণ না করে ভাই-বোনের মতো ভদ্র আচরণ করা প্রয়োজন। এ জঘন্য অপরাধ প্রতিরোধে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অপরাধীর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ইভটিজিং শব্দটি ইভ (Eve) ও টিজিংয়ের (Teasing) একত্রিকরণ রূপ। বাইবেল অনুসারে প্রথম নারীর নাম 'ইভ' (Eve) এখানে 'ইভ' বলতে নারী সমাজকে বুঝানো হয়েছে। আর (Teasing) অর্থ পরিহাস, প্রশ্ন প্রভৃতি দ্বারা জ্বালাতন করা, উত্যক্ত করা, ক্ষেপানো। ইভটিজিং বলতে কথা, কাজ, আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে নারীদের উত্যক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে। নারীদের প্রতি অশালীন উক্তি করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা ইভটিজিংয়ের অন্তর্ভুক্ত।[৩৩৯]

"ইভ টিজিং"-এ শব্দটার ব্যাপারে একটা আপত্তি আছে। অভিধান বলছে Eve (ইভ) শব্দের অর্থ সৃষ্টির প্রথম নারী বা মা হাওয়া। আর Tease (টিজ) শব্দের অর্থ বিরক্ত করা, উত্যক্ত করা বা জ্বালাতন করা। তাহলে অর্থ কী দাঁড়ায়? বখাটেরা কী সৃষ্টির প্রথম নারী বা মা হাওয়াকে উত্যক্ত করছে (নাউযুবিল্লাহ্)? হয়তোবা এ শব্দের ধারক, বাহক কিংবা আমদানীকারকরা ব্যাখ্যা দিবেন যে এ শব্দে 'ইভ' উপমা হিসেবে কিংবা নারীকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাদের মেয়েরা কী মা হাওয়ার সমতূল্য হয়ে গেছে? কেন শব্দটাকে "ইভ টিজিং" না বলে 'গার্ল টিজিং' বলা হলো না? বরং সেটাই তো বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল।[৩৪০]

তবে ইভটিজিং বলতে মেয়েদেরকে উত্যক্ত বা হয়রানী করাকে বুঝায়। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ইভটিজিং-এর কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি এবং কতটুকু কার্যাবলী এর আওতায় পড়বে তা নির্ধারণ করা হয়নি। কাজেই কোন কাজগুলো ঠিক ইভটিজিং-এর আওতায় পড়বে তার সীমারেখা নির্ধারণ করা খুব কঠিন। মেয়েদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গান বাজানো বা গাওয়া, অশ্লীল বা উদ্দেশ্যমূলক কোন কথা বলা, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করা, শিস দেয়া, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সিগারেটের ধোঁয়া দেয়া, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পিছু নেয়া, অশ্লীল প্রেম নিবেদন বা বিয়ের প্রস্তাব দেয়া,[৩৪১] চিঠিপত্র দেয়া, পথরোধ করে দাঁড়ানো, প্রস্তাবে সাড়া না দিলে হুমকি দেয়া, ওড়না টেনে ধরা,[৩৪২] ইত্যাদি ইভটিজিং-এর আওতায় পড়ে। তবে সময়ের সাথে সাথে ইভটিজিং-এর ধরণও পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে উত্যক্ততা ইলেকট্রনিক পদ্ধতির বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হচ্ছে- যার মধ্যে অন্যতম মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অশালীন ম্যাসেজ পাঠিয়ে এবং কখনও মোবাইল ফোনের ক্যামেরার মাধ্যমে বিভিন্ন কায়দায় মেয়েদের ছবি তুলে অথবা সেই ছবি মেসেজ আকারে পাঠিয়ে অথবা মোবাইল ফোনে অশ্লীল কথা বলার মাধ্যমে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করা হয়।[৩৪৩]

উইকিপিডিয়া বলছে যে, এটি মূলতঃ তারুণ্যে সংঘটিত একটি গুরুতর অপরাধ। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যা হোক, ইভটিজিং বিষয়টি আসলে এমন এক ধরণের যৌন আগ্রাসন যার মধ্যে

---

৩৩৯. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৮), পৃ. ৩৩৩; এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া,*ইসলাম শিক্ষা*, (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, জুন ২০১৯), পৃ. ১৯৮

৩৪০. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, (ঢাকা: শব্দশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০১২),পৃ. ১৩

৩৪১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৩; মো. আব্দুর রহিম মিয়া, *ইভটিজিং, বাংলাদেশী আইন ও বাস্তবতা: একটি পর্যালোচনা*, (রাজশাহী: রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৮ বর্ষ, মার্চ ২০১৩), পৃ. ৩০৬

৩৪২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৩; শাহেদ ফেরদৌস মুন্নী, *"রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও হয়রানী করার বিরুদ্ধে চাই সামাজিক প্রতিরোধ"*,(*উন্নয়ন পদক্ষেপ*,সপ্তম সংখ্যা,সেপ্টেম্বর ২০০৭),পৃ. ২০

৩৪৩. মো. আব্দুর রহিম মিয়া, *ইভটিজিং, বাংলাদেশী আইন ও বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ৩০৬; দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি, ২০০৮, পৃ. ১৭

রয়েছে যৌন ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, অঙ্গ-ভঙ্গি, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অযাচিত স্পর্শ, শিস দেয়া, ভীড়ের মধ্যে সুযোগ বুঝে শরীরের সংবেদনশীল অংশে স্পর্শ করা বা হাত দেয়া, মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ এসএমএস পাঠাননা, কৌশলে পর্ণ ছবি বা মুভি দেখানো কিংবা ই-মেইলে এ ধরণের কোন টেক্সট, ছবি বা মুভি পাঠানো ইত্যাদি। কখনো কখনো একে নিছক রসিকতা হিসেবে গণ্য করা হয় যা একজন অপরাধীকে তার কৃত দায় এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ টিজাররা নানা রকমের কূট-চিন্তার দ্বারা কৌশলে মেয়েদের উত্যক্ত করে থাকে, ফলে এ অপরাধ প্রমাণ করাও বেশ কঠিন। এজন্য অনেক নারীবাদী একে 'ছোটখাট ধর্ষণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৪৪]

এক কথায় বলা যায়, কোন নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার উদ্দেশ্যে বা ইচ্ছায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোন মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করে বা কোন বস্তু এমনভাবে প্রদর্শন করে যাতে ঐ নারী তা দেখতে বা শুনতে পায় এবং বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়, তাহলে তাকেই ইভটিজিং বলা হয়। ১৯৭৬ সালে প্রণীত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অডিন্যান্স -এ ইভটিজিং -কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যাতে বলা হয় যে, রাস্তা বা জনসম্মুখে কোনো নারীকে অশোভন শব্দ, অঙ্গভঙ্গি ও মন্তব্যের মাধ্যমে যৌন উৎপীড়ন করা ইভটিজিং হিসেবে গণ্য হবে। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে নিম্নের বিষয়গুলোকে ইভটিজিং-এর আওতাভুক্ত বলে অভিহিত করা যায় :

ক. মোবাইল ফোনে, এস এম এস, ই-মেইল, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা যে-কোন ধরনের চিত্র ধারণ, অশ্লীল ছবি প্রদান অথবা অশ্লীল কথা বলা।

খ. অশালীন উক্তিসহ আপত্তিকর কোন কিছু করা, কাউকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সুন্দরী বলা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা রসিকতা করা।

গ. কোন নারীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা যে কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা।

ঘ. যে কোন শারীরিক বা ভাষাগত আচরণ, যার মধ্যে যৌন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন।

ঙ. মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা বা যৌন সম্পর্ক স্থাপনের দাবি বা অনুরোধ করা।[৩৪৫]

ইভটিজিং-এর কারণ

ইভটিজিং-এর কোন ধরাবাঁধা শ্রেণী বা বয়স নেই। তবে পুরুষ, বিশেষ করে তরুণ বয়সী ছেলেরা ইভটিজিং করে। উঠতি বয়সের ছেলে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গলির মোড়ে আড্ডা দেয়া তরুণ, পাড়ার মাস্তান, রাজনৈতিক ক্যাডার, বেকার ও ভবঘুরে যুবক প্রমুখ ইভটিজিং করে।[৩৪৬] সাধারণ ছেলে বা ছাত্ররাও অনেকসময় বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে ইভটিজিং করতে পারে। আবার মধ্যবয়সী বা বৃদ্ধ লোকজন টিএনএজ মেয়েদের টিজ করছে এমন ঘটনাও কম নয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী পুরুষ কিংবা আদালতে বিজ্ঞ আইনজীবীও তার মক্কেলের পক্ষ অবলম্বন করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম কথায় নারীদের ইভটিজিং করে থাকে। এছাড়া রিক্সা চালক, বাস-ট্রাক-ট্যক্সি ড্রাইভার, ফুটপাত-মার্কেট বা সাধারণ দোকানদার এদের বিরুদ্ধেও ইভটিজিং-এর অভিযোগ পাওয়া যায়।[৩৪৭] নিম্নোক্ত কারণগুলোকে ইভটিজিং-এর কারণ বলে অভিহিত করা যায়। যেমন:

ক. ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অভাব।

খ. বেকারত্ব ও হতাশাব্যাঞ্জক জীবন।

গ. প্রশাসনিক অবেহলা।

---

৩৪৪. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪

৩৪৫. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৪

৩৪৬. *ইভটিজিং : নগরীর পথে-ঘাটে বখাটেদের উৎপাত*, দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ এপ্রিল, ২০১০, পৃ.১

৩৪৭. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৫; বিল্লাল বিন কাশেম, "বেপরোয়া যাত্রীবেশী বখাটেরা", দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১

ঘ. আইনী লড়াইয়ে বাঁধা।
ঙ. গণমাধ্যমের প্রভাব।
চ. চলমান অবস্থা থেকে শেখা।
ছ. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।

ইভটিজিং-এর ভয়াবহতা

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমানে ইভটিজিং হচ্ছে যৌন হয়রানীর সবচেয়ে প্রকাশ্য, বেপরোয়া ও মারাত্মক রূপ।[৩৪৮] বাংলাদেশে জনসমক্ষে যৌন হয়রানী ঘটনার বিস্তৃতি এত প্রকট আকার ধারণ করেছে প্রধানত ইভটিজিংরূপে। ইভটিজিং-এর পথ ধরে অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, জোরপূর্বক বিয়ে, আত্মহত্যা, পরিবারের এলাকা ত্যাগ, নির্যাতিতার পরিবার-পরিজনকে হত্যা, অপমান করা এবং নির্যাতিতাকে গুলি করে চোখ নষ্ট করার মতো ঘটনাও ঘটে।[৩৪৯] এমনকি বখাটেদের উত্যক্ততায় কেউ সহযোগিতা না করায় তাকেও হত্যা করা হয়েছে। বা হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ইভটিজিং-এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে শিক্ষককেও লাঞ্ছিত করেছে উত্যক্তকারীরা।[৩৫০] চলমান সামাজিক অসুস্থতা ও অস্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইভটিজিং এর সাধারণ সামাজিক সমস্যা থেকে ক্রমশঃ নারী নির্যাতনের একটি লুকায়িত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। বখাটেদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বহুসংখ্যক।[৩৫১] ইভটিজিং এর ফলে অনেক মেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। কেউ কেউ আবার আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এতে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়। সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। জাতি ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়।
নারীদের উত্যক্ত করা, কাউকে মন্দ নামে ডাকা বা উপহাস করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"তোমরা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা বড় ধরণের অপরাধ। যারা তাওবা করে না, তারাই যালিম।"[৩৫২]

ইভটিজিং এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ভারতের মতো আমাদের দেশেও ইভটিজিং রোধে শুধু নয়; বরং নারী নির্যাতন বিরোধী অনেকগুলি শক্ত আইন তৈরি হয়েছে, এর প্রয়োগও হচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এটাকে অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। হালে ইভটিজিং এর ঘটনা বৃদ্ধি পাবার প্রেক্ষিতে র‍্যাব ও পুলিশ কিছু টিজারকে আটক করে উপস্থিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও দিয়েছে। কিন্তু তারপরও যে অপরাধী তার ভেতরে যেন কোন রকম বোধদয় ঘটছে না। কিংবা অন্য যারা এ ধরণের অপরাধ ঘটিয়ে থাকে তারাও সতর্ক হচ্ছে না। ফলে ঘটনার ভয়াবহতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীচে সংক্ষেপে আমাদের দেশে

---

৩৪৮. নাসরিন সুলতানা, *"নারী নির্যাতন"*, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১০
৩৪৯. আদেল উদ্দীন আল-মাহমুদ, *"বখাটেদের অত্যাচারে প্রাণ দেবে আর কত বোন"*, দৈনিক ইত্তেফাক,২১ এপ্রিল ২০১০, পৃ. ১০।
৩৫০. *"খুলনা বি. এল. কলেজে ছাত্রী উত্যক্ত: দুই শিক্ষিকসহ আহত ১২"*, দৈনিক আমার দেশ, ৬ আগষ্ট ২০১০, পৃ. ১০।
৩৫১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩৩৬; *ইভটিজিং, বাংলাদেশী আইন ও বাস্তবতা : একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১১।
৩৫২. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১১

ইভটিজিংয়ের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো, যা দৈনিক পত্রিকাগুলোর নিয়মিত নিউজের ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাড়া ফেলেছিল।

১) চাঁপাই নবাবগঞ্জের একজন কলেজ শিক্ষক ছাত্রীদেরকে উত্যক্ত করার জন্য কিছু বখাটেকে বাধা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ঐ বখাটেরা কয়েকজন মিলে ঐ শিক্ষকের গায়ের ওপর মোটর সাইকেল তুলে দিয়ে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

২) ফরিদপুরে ৫০ বছর বয়সের এক হিন্দু মহিলা চাপা রাণী ভৌমিক তার মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য উত্যক্তকারীদের প্রতিবাদ করলে ঐ বখাটেরাও তার শরীরের ওপর মোটর সাইকেল তুলে দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে মেরে ফেলে।

৩) ১৩ বছরের মেয়ে নাশফিয়া আখন্দ পিংকী ঢাকা শহরে তার চাচার কাছে থেকে লেখাপড়া করত। উত্যক্তকারীদের উপর্যুপরি অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

৪) বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী সুপ্তিকে উত্যক্ত করার ঘটনায় তার বাবা মোঃ জিন্নাত মাষ্টার বখাটে রূপা ওরফে রূপম ওরফে অনিকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেছিলেন। এরপর ঐ বখাটে মোবাইল ফোনে জিন্নাত মাষ্টারকে হুমকি দেয়। তিনি সেটা রেকর্ড করে থানার ওসি রফিকুল ইসলামকে শুনিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও কোন এক অদৃশ্য কারণে পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। এরপর ঐ বখাটে রূপা জিডি করার প্রতিশোধ হিসেবে জিন্নাত মাষ্টারকে মটর সাইকেলে করে দুই বন্ধুসহ এসে পথরোধ করে এবং পেটে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পথে তিনি মারা যান।

৫) জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী নাফিজা জাহান ঢাকা শহরের উত্তরার একটি বাসায় ঈদের জন্য তৈরিকৃত একটি নাটকের শুটিং চলাকালীন দু'জন তরুণ কর্তৃক টিজিং এর শিকার হন। তরুণরা তার প্রতি কটুক্তি করছিল। নাফিজা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ঐ নাটকের পরিচালক মোঃ মোস্তফা কামাল রাজকে অবহিত করেন। রাজ উত্তরা থানায় জানালে গোয়েন্দা পুলিশের লোক এসে বখাটেদেরকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে।

৬) বেশ কয়েক বছর আগে গাইবান্ধায় ৮/৯ বছরের একটি ফুটফুটে শিশু বখাটেদের উৎপাতে বাঁচার জন্য দৌড়াতে গিয়ে অবশেষে একটি পুকুরে ডুবে মারা যায়। সে সময় এ ঘটনা সারা দেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ।

এ রকম আরো শত শত ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায় যেগুলো আমরা পত্রিকা মারফত জানতে পেরেছি। কিন্তু যত ঘটনা ঘটে তার শতকরা ৫ ভাগও কী জনসম্মুখে আসে? যেখানে আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্স এবং ধর্মীয় বাধাহীন দেশেই ১৯৯০ সালের রিপোর্ট মোতাবেক এ জাতীয় ঘটনার মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ নথিভুক্ত হয়েছিল সেখানে আমাদের মতো রক্ষণশীল এবং ধর্মীয় প্রভাবযুক্ত সমাজে এ ঘটনার কতটুকু প্রকাশিত হতে পারে?[৩৫৩]

তাহলে বাস্তবে এ ব্যাধি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সহজেই অনুমেয়। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশে বাল্য বিয়ের হার এমনিতেই বেশি। তার উপর এ জাতীয় সমস্যার কারণে বেশির ভাগ বাবা-মা'ই মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তারা চিন্তা করেন স্বামী থাকলে তাকে আর কেউ উত্যক্ত করতে চাইবে না।

এর ফলে এক দিকে যেমন বাল্য বিয়ের হার না কমে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে এ সব মেয়েদের লেখাপড়াও অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে সরকার ঘোষিত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষাও তেমন কোন কাজে আসছে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের ড্রপ-আউট সংখ্যা তাই দিন দিন বাড়ছে।

---

৩৫৩. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত,পৃ.২৪-২৬

ইভটিজিং থেকে উত্তরণের উপায়

১. ইভটিজিং থেকে উত্তরণের প্রধান উপায় হলো ধর্মীয় নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা। ইভটিজিং থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ পাক আল-কুরআনে নর-নারী উভয়ের দৃষ্টি সংযত ও নত করতে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজাত করতে বলেছেন। পর্দা ও শালীনতার সাথে যদি নারীরা চলাফেরা করে তাহলে ইভটিজিং থেকে উত্তরণ পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৩৫৪]

২.আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ

"মুমিনগণ, তোমাদের একদল অন্য দলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না।"[৩৫৫]

৩. এ জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মেয়েদের ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা একান্ত আবশ্যক। শালীনতাপূর্ণ মার্জিত বেশ-ভূষা ও আচার-আচরণেরও গুরুত্ব অপরিসীম। অশালীন বেশ-ভূষা ও আচার-আচরণ মানুষের মধ্যকার পশুবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে, কুৎসিত কামনাকে উত্তেজিত করে। এতে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং নানা ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়।

৪. রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

"প্রত্যেক নয়ন ব্যভিচারী। যে নারী সুগন্ধি মেখে কোনো মজলিসের নিকট দিয়ে যায় সেও ব্যভিচারীণী হিসাবে গণ্য হবে।"[৩৫৬]

৫. রাসূলুল্লাহ (স.) আরও বলেছেন,

«يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ»

"হে আয়েশা, আল্লাহ তাআলা কখনোই অশ্লীল কথাবার্তা উচ্চারণকারীকে পসন্দ করেন না।"[৩৫৭]

---

৩৫৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩১

৩৫৫. আল-কুরআন, সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১১

৩৫৬. তিরমিযী, *আল-জামি'*, (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮), হাদিস নং ২৭৮৬

৩৫৭. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ),খ. ৪, পৃ. ২৫১, হাদিস নং ৪৭৯২

৬. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

"الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرَجُ يَزْنِيْ".

" নয়ন যুগল দ্বারাও (খারাপ উদ্দেশ্যে তাকালে) ব্যভিচার হয়, হাত দ্বারাও ব্যভিচার হয়, পদ-যুগল দ্বারাও ব্যভিচার হয় এবং লজ্জাস্থান দ্বারাও ব্যভিচার হয়।"[৩৫৮]

৭. ব্যভিচারের শাস্তি সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ، أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟... وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ

মেরাজের রাতে জিবরাইল (আ) ও মিকাইল (আ)-এর সাথে আমি যাচ্ছিলাম, যেতে যেতে আমরা একটা বড় চুল্লি দেখলাম। চুল্লির উপরিভাগ সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ প্রশস্ত। ভেতর থেকে ভয়ানক চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমরা চুল্লিটির ভেতরে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পরপর তাদের নিচ থেকে আগুনের হলকা আসছিল আর তারা আগুনের তীব্র দহনে বিকট চিৎকার করছিলো। এরা কারা? তিনি বললেন, এরা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ।[৩৫৯]

৮. ইসলাম, ইয়াহুদী, খৃস্টানসহ সকল ধর্মেই ব্যভিচারের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে।[৩৬০]

৯. ১৯৭৬ সালে প্রণীত বাংলাদেশ আইনে ইভটিজিং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর শাস্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

আমরা ধর্মের অনুশাসনগুলো মেনে চলবো, ইভটিজিং এর মতো মারাত্মক অপরাধে লিপ্ত হবে না। এর বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলব।

যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পর্দা করে সমস্ত শরীর আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, তাদের দেখলে বুঝতে পারা যায়, এরা পর্দানশীন, দুষ্ট চরিত্রের বখাটে লোকেরা তাদেরকে চরিত্রবতী ও সতীত্বসম্পন্না নারী মনে করে তাদের সম্পর্কে নৈরাশ্য পোষণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে সমস্ত নারী উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ হওয়ার মত পাতলা জামা পরে, পর্দা ছাড়াই নিজেদের মাথা, গলা, বুক ও বাহুযুগল উন্মুক্ত করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট, দোকান, পার্ক, হোস্টেল-রেস্তোরায়, অফিস-আদালতে চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে বিপরীত ধারণা জাগ্রত হয়। দুষ্ট লোকেরা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে পরিচিত হয়, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চার চেষ্টা করতে থাকে আগ্রহ সহকারে। পর্দা না করে অশালীন পোশাক পরে বাইরে আসার কারণে ধর্মীয় আদর্শ বিবর্জিত বখাটে লোকদের দ্বারা ইভটিজিং বা উত্যক্ততার শিকার হয়। অপরপক্ষে পুরুষরা যদি ঈমানদার ও ধর্মপরায়ণ হয় এবং পর্দা লংঘন সংক্রান্ত গুনাহের শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হতো, তাহলে নারীরা ইভটিজিং-এর শিকার হতো না।[৩৬১]

উক্ত আয়াতে দৃষ্টিকে সংযত করার হুকুমটি পালন করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। দৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি তীক্ষ্ণ শানিত তীর যা নারী-পুরুষের অন্তর ভেদ করে আসক্তির মাধ্যমে পাপের পথে পরিচালিত করতে পারে। এমতাবস্থায় দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হলে অবশ্যই লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা পাবে। অপরপক্ষে দৃষ্টি যদি নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে অন্তরে লালসার উত্তাপ-উন্মাদনা সৃষ্টি হবে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেবে।

---

৩৫৮. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিছ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫); হাদিস নং ৩৯১২

৩৫৯. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, (দারুতাওকিন্নাজাত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি.),খ. ২, পৃ. ১০০, হাদিস নং ১৩৮৬

৩৬০. এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

৩৬১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, যেন তারা নিজেদের চাদর দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে রাখে।"[৩৬২]

বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) আলী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

" يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ "

"হে 'আলী! একবার দেখার পর পুনরায় তাকাবে না। প্রথমবারের দেখা মাফ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার দেখলে তা মাফ হবে না।"[৩৬৩]

বস্তুত আল্লাহর বান্দা হিসেবে সঠিক পুত-পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ জরুরী। কেননা দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ হলেই লজ্জাস্থানের বা যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ সম্ভব। অন্যথায় নিঃসন্দেহে তাকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হতে হবে। যদি পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, পার্কে-ক্লাবে, হোটেল রেস্তোরায় নারী-পুরুষের বেপর্দা অবস্থায় অবাধ মেলামেশাকে উৎসাহিত করা হয়, তাহলে নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু অনিবার্য। যার কারণেই প্রতিনিয়ত নারীরা ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে। পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা ইভটিজিংয়ের মতো খারাপ কাজ করব না। আমরা সবসময় ভদ্র, নম্র, শালীন আচরণ করব। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করব।

ইভটিজিং প্রতিরোধে করণীয়

ইভটিজিং-এর মতো বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে দরকার ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রত্যেকের কার্যকর ভূমিকা। ইভটিজিং প্রতিরোধে আমাদের মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে হবে। সকল স্তরের জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেনতা সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মকাণ্ডে পাড়ার মুরুব্বী, স্থানীয় মসজিদের ইমাম, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে যাতে তারা তাদের সন্তানদের এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে পারে। ইভটিজিং কমাতে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রমে সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে নারী-পুরুষ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও পারস্পরিক মর্যাদা এবং ইভটিজিং বিষয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ নিয়ে কারিকুলাম রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকরা এ বিষয়ে সচেতন হবে। কিশোর-তরুণদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যাতে তারা ইভটিজিংকে একটি অনৈতিক কাজ হিসেবে জানতে পারে এবং এ ধরনের অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকে। গণমাধ্যমে ইভটিজিং বিষয়ে প্রচারণা এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। নারীর প্রতি সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সম্মানবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

অশ্লীল চলচ্চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায় বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে যুবশক্তিকে অনৈতিক কার্যাবলী থেকে বিরত রেখে জনকল্যাণমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত রাখতে হবে। ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান বা বিকল্প কর্মসংস্থান, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।[৩৬৪]

---

৩৬২. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩) : ৫৯

৩৬৩. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২২৯৯১

৩৬৪. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮-৩৩৯

পারিবারিক পর্যায়ে ইসলামি অনুশাসন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে হবে এবং পর্দা সংক্রান্ত ইসলামি বিধানগুলো ছেলেমেয়েদের মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সন্তানদের বড় করার প্রতিটি পর্যায়ে তাদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি আমরা আমাদের সমাজে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হই, তাহলে ইভটিজিং নামক অসচ্চরিত্র তথা অনৈতিক কার্যাবলী থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
অশ্লীলতা

সমাজে অশ্লীলতা একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সমাজিক অপরাধ, যা সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। অশ্লীলতা অসৎ চরিত্রের অন্যতম দিক। অশ্লীলতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। কোন ভদ্র ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তা, আচার-আচরণ করতে পারে না। অশ্লীলতা দ্বারা নির্লজ্জ ও কুরুচিপূর্ণ সব কাজই সম্ভব। অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও বর্বরতার প্রতীক। এটি সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে। সমাজকে কলুষিত করে। এটি সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস রূপে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এ অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞান-গুণী ব্যক্তিগণ নানা পদ্ধতি ও আইন-কানুন রচনা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি একটি বড় গুনাহ্। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপনে অশ্লীল আচরণ।"

অশ্লীলতা ত্যাগ না করলে কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ

"(তারাই মুমিন) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে।"[৩৬৫]

ইসলাম আল্লাহর দেয়া একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসাবে অশ্লীলতামুক্ত সমাজ গঠনেরও এক চমৎকার পদ্ধতি উল্লেখ করেছে।

অশ্লীলতার পরিচয় (تعريف الفحش)

অশ্লীলতার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে فضح، فحش، مجون، خلع ইত্যাদি।[৩৬৬] এ শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো: অসম্মান করা, লাঞ্ছিত করা, সম্ভ্রম নষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, খারাপ কাজ করা, ব্যভিচার করা, নির্লজ্জ হওয়া ইত্যাদি।[৩৬৭] ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো: Vulgrity, Obscenity, Wantonness, Smutty, Loalhsome.368

---

৩৬৫. আল-কুরআন, সূরা শূরা (৪২) : ৩৭

৩৬৬. আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার* [বাংলা-আরবী অভিধান], (ঢাকা : মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯৮), পৃ.৮৭

৩৬৭. ড. এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী [সম্পাদিত], *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৬৮

৩৬৮. Md. Kamruzzaman Khan,Oxford Advanced Learner's Dictionary [Bangli to English],(Dhaka: Oxford press & Publication, 2009), p. 87

আর-রাযী (র) বলেন, كُلُّ شَيْئٍ جَاوَزَ حَدَّهُ প্রত্যেক বস্তুর সীমা অতিক্রম করাকে অশ্লীলতা বলে।[৩৬৯] ইবন সাইয়্যেদ বলেন,الْفَحْشُ وَالفَحْشَاءُ والْفَاحِشَةُ القَبِيْح مِنَ الْقَوْلِ والفِعْلِ 'নিন্দনীয় কথা ও কাজকে ফুহশা, ফাহশা ও ফাহিশা বলা হয়।[৩৭০]

ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) বলেন, مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الأَفْعَالِ وَالأَقْوَالِ 'যেসব কথা ও কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয় তাকে ফাহেশা বা অশ্লীল বলা হয়।[৩৭১]

মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান বলেন, الْفَاحشَةُ وَهِيَ الَّتِيْ تُوْجِبُ الْحَدَّ فِيْ الدُّنْيَا وَالعَذَابَ فِيْ الآخِرَةِ. 'অশ্লীলতা এমন কর্ম যাতে দুনিয়াতে, দণ্ডবিধি ওয়াজিব হয় এবং আখিরাতে শাস্তি অবধারিত করে। কারো কারো মতে مَا نَهَى الله عنه 'আল্লাহ্ তা'আলা যে বিষয় নিষেধ করেছেন তাই অশ্লীল।

আন-নাসাফী (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, الفاحشة أنْ تَزْنِيَ فَتَخْرُجَ لِلْحَدِّ. 'অশ্লীলতা হলো ব্যভিচার করে দণ্ডবিধির জন্য বেরিয়ে পড়া।

ড. হামিদ সাদিক ও ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস বলেন, الْفَاحِشُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ الكَثِيْرُ الَّذِيْ جَاوَزَ الْحَدَّ وَكَانَ فِيْه ضَرَرٌ، প্রত্যেক খারাপ কাজ যা সীমা অতিক্রম করে এবং যার মধ্যে ক্ষতি রয়েছে তাকে আল-ফাহিশ বা অশ্লীলতা বলা হয়।[৩৭২]

মহাগ্রন্থ কুর আনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে فاحشة শব্দে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾

"আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে।"[৩৭৩]

আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা সাধারণতভাবে অশ্লীল কাজকেই বুঝানো হয়েছে। তবে তা দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্টত বুঝা যায় মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে জাবির রা. বলেন, আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা ব্যভিচার বুঝানো হয়েছে।[৩৭৪] ইবন আব্বাস রা. বলেন, আলোচ্য আয়াতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা অবাধ্যতাকে বুঝানো হয়েছে।[৩৭৫]

অন্য আয়তে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾

"আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে, তখন তারা বলে, আমর আমাদের পূর্বপুরুষদেরও এর ওপর পেয়েছি এবং স্বয়ং আল্লাহও আমাদের এর নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৭৬]

আলোচ্য আয়োতে فَاحِشَةً শব্দ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে-এ বিষয়ে বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন- ইবনু আব্বাস ও মুজাহিদ রা. প্রমুখের মতে, এখানে তা দ্বারা

---

৩৬৯. মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আর-রাযী, *মুখতারুস্-সিহাহ*, (বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৯খৃ.),পৃ. ১৪৪

৩৭০. ইব্ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুল তারীখিল 'আরাবী,৩য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খৃ.), ১০ ম খণ্ড, পৃ. ১৯২

৩৭১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত, পৃ.২৫২; আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৩৭৬; মু'জামুল মুসতালাহাত ওয়াল আল-ফায আল-ফিকহিয়্যাহ, পৃ. ৩০

৩৭২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪০৫

৩৭৩. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৫

৩৭৪. আবু মুহাম্মদ ইবন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, (বৈরূত: দারুত তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ,১৯৯৭),খ.৩,পৃ.২২৩

৩৭৫. আব্দুল্লাহ বিন আহমদ,*তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, (করাচী : কাদিমী কুতুখানা),খ. ১, পৃ.৭১; আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম উমর আল-খাযিন, *লুবাবত তা'বীল ফী মা'আনিয়াত তানযীল 'তাফসীর আল-খাযিন*, (বৈরূত: দারুল মারিফাহ, তা. বি.), খ.৩, পৃ.২০১

৩৭৬. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ (৭) : ২৮

উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা উদ্দেশ্য। আতা রা. এর মতে, শিরক করা এবং যে কোন লির্জ্জ অপকর্ম করা।[৩৭৭]

ভারতীয় পেনাল কোডে বলা হয়েছে- বই, পুস্তিকা, কাগজ, লেখা, আঁকা, ছবি, বর্ণনা, মূর্তি বা অন্য কোনো বস্তু অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে, যদি এটি লাম্পট্যজনক হয় (lascivious) বা এটি কামপ্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে (appeals to the pruriest interest) অথবা সামগ্রিক বিচারে এটি লোকের মনকে কলুষিত(deprave) ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত (corrupt) বলে।

ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারায় অশ্লীলতার কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই বলে অনেকে দাবী করেন। যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে- সেটা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শালীনতা-অশ্লীলতা অনেকটাই ব্যক্তি-নির্ভর। একজনের কাছে যা অশ্লীল, আরেকজনের কাছে তা না-ও হতে পারে। অশ্লীলতার ব্যাখ্যাই যেখানে অস্পষ্ট, তার উপর ভিত্তি করে শাস্তি আরোপ করা যায় কি? রণজিত ডি উদেশী বনাম মহারাষ্ট্র সরকার মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ২৯২ ধারার সাংবিধানিক বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিলো। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য সেটাকে নাকচ করে। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের মত হলো: অশ্লীলতা শব্দটি মোটেই অস্পষ্ট নয়। (১) এটি অনুভূতিপ্রবণ মনকে কলুষিত করে ও নৈতিক অধঃপতন ঘটায়; (২) এটি নোংরা ও লাম্পট্য চিন্তা মাথায় আনে; (৩) এটা অকৃত্রিম পর্নোগ্রাফি: (৪) এটি কাম উদ্রেককারী; (৫) এটি যৌন বিষয়ক কুচিন্ত মনের মধ্যে আনে; (৬) সামাজিকভাবে গ্রাহ্য যে সীমারেখা- তা ছাড়িয়ে যায়।[৩৭৮]

সমাজে প্রচলিত অশ্লীলতা

বর্তমানে মানব সমাজে বিভিন্ন ধরণের অশ্লীলতা প্রচলিত আছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো:

১.ব্যভিচার

ব্যভিচার একটি চরম ঘৃণিত, মানবতাবিরোধী ও কুৎসিত সামাজিক অপরাধ, যা সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত ও বিপন্ন করে। ব্যভিচার সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও বীভৎস হিসেবে চিহ্নিত। সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধ হতে ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিরা নানা পদ্ধতি ও আইন রচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে এ হীন অপরাধ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলামই একমাত্র কল্যাণময় বিধান হিসেবে ব্যভিচার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে।

ব্যভিচার পরিচিতি

ব্যভিচারের অরবী প্রতিশব্দ যিনা (زنى)। এটির আভিধানিক অর্থ হলো, অবৈধ যৌন সম্ভোগ, পাপাচার, সংকীর্ণতা, ঊর্ধ্বারোহণ ইত্যাদি।[৩৭৯] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Adultery; going astray; develation from the proper cowrse;

---

৩৭৭. আবু মুহাম্মদ ইবন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, প্রাগুক্ত,খ.৩,পৃ.২২৩

৩৭৮. ১৮৬০ সালের ভারতীয় পেনাল কাডের ২৯২ ধারা

৩৭৯. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ,১৯৯৪ খৃ.),খ. ১. পৃ.২৫৭; আল-ফাইরুযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১ খৃ.),খ.১, পৃ.২৩১

Transgression; exception to a rule[380] ইসলামি আইনের পরভাষায়, যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইবনে রুশদ আল-হাফীদ রহ. যিনার পরিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে বলেন,

أما الزنا فهوكل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

'ব্যভিচার এমন যৌন মিলনকে বলা হয় যা বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া ও দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।'[৩৮১]

ইবন হামযা যিনার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, **(فإنه وطئ من لا يحل النظر إلى مجردها مع العلم بالتحريم)** "যিনা হলো হারাম জেনে যার দিকে তাকানোও বৈধ নয়, তার সাথে সংগম করা।"[৩৮২]

অতএব, ব্যভিচার বা যিনা হলো, বৈবাহিক কিংবা দাসত্বের মালিকানা সূত্র ছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর মাঝে যৌন সঙ্গম হওয়া।

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামি আইন

ইসলামি শরী'আতের বিধানে যিনা-ব্যভিচার একটি গুরুতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অশ্লীল অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"৩৮৩

আর যারা এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাদের উভয়ের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর দীনের (আদেশ কার্যকর করার) ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে –যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিনী মহিলা কিংবা কোন মুশরিক নারী ব্যতীত অন্য কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করবে না, (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিনী মহিলাকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোন মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কোন সৎ লোক বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৩৮৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। অন্যথায় বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার লিপ্ত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا،الثيب بالثيب و الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثيب جَلْدُ مِائَةٍ ثم رجم بالحجارة والبكر جَلْدُ مِائَةٍ ثم نَفْيُ سَنَةٍ»،

---

৩৮০. Ashu Tosh Dev, *Students Favourite Directionary*, Bangla to English,(Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986), p. 973

৩৮১. ইবন রুশদ আল-হাফীদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহাইয়াতিল মুকতাসিদ*, (বৈরূত: মা'রিফাহ, ১৯৭৮ খৃ.), খ.২. পৃ. ৪৩৩

৩৮২. ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, (মিশর: আল-জমহুরীয়া আরাবীয়াহ্, ১৯৭০ খৃ.),খ.১১,পৃ.২২৯

৩৮৩. আল-কুরআন, সূরা ইসরা (১৭) : ৩২

৩৮৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ২-৩

"আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিবাহিত নারী পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম। আর যুবক-যুবতী (অবিবাহিত) যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন।"[৩৮৫]

এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ: وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ،

"আবূ হুরায়রা ও যাইদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: এক বেদুইন রাসূল্লাল্লাহ (স.)-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে আপনাকে বলছি যে, আপনি আল্লাহর তাআলার কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবেন। আর অধিকতর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল: আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘটনাটি বলার অনুমিত দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। সে বলল: আমাদের ছেলে এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রী সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে আমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি তাকে এর বিনিময়ে একশত বকরী ও একটি বাঁদী দিয়েছি। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসণ, আর এ মহিলার জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী স. বলেন: আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। বকরী ও বাঁদী ফেরত দেয়া হলো। তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে এবং একবছর নিবার্সন দেয়া হবে। হে উনাইছ! তুমি সকাল বেলা এর স্ত্রীর নিকট যাবে যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন: অতপর সে (উনাইছ) সকালে তার নিকট গেল এবং স্বীকারোক্তি করল। আর রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হলো।"[৩৮৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিচারিক দৃষ্টান্ত ও বিদ্যমান রয়েছে।

২. পতিতাবৃত্তি

অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

---

৩৮৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*,(বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), খ. ৫. পৃ. ৫৯, হাদিস নং-৩২০০; ইমাম তিরমিযী, *আস সুনান*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ.৫. পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং-১৩৫৪; ইবন হিব্বান মুহাম্মদ আল-বুস্তী, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৪ হি.), খ.১৮, পৃ.৩৫৪, হাদিস নং-৪৫০৪

৩৮৬. ইমাম মুসলিম, *আস সহিহ*,, প্রাগুক্ত, খ. ৯,পৃ.৭১, হাদিস নং ৩২১০; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ.৫.পৃ.৩৩০,হাদিস নং ১৩৪৯

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, প্রাগুক্ত হাদিস নং ১৫৯১০, ইমাম তাবরানী রহ., *আল-মু'জামুল কাবীর*, (কাহিরা: মাকতাবাতু ইব্ন তাইমিয়া, প্রথম সংস্করণ), হাদিস নং- ৫১৮৮

পতিতাবৃত্তি পরিচিতি

নারীদের মধ্যে যারা দেহ ব্যবসায় কোনো প্রতিষ্ঠানিক বা মুক্তভাবে জড়িত তাদেরকে যৌনকর্মী বলে। আরবীতে এ অপর্মকে (بغاء) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৮৭]

পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামি আইন

কোন নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা হারাম তথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও হারাম। আল কুরআনে এসেছে। (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না।[৩৮৮] ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশুর চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে কোন প্রকার অশ্লীতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"তোমরা কোন ধরনের প্রাকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" [৩৮৯]

উল্লেখ্য যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলামি শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ

আবু মাসউদ আল আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ স. কুকুরের বিক্রয়মূল্য ও পতিতার উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৯০]

এ হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম।

৩. অবৈধ গর্ভপাত

অবৈধ গর্ভপাতের অভিধানিক অর্থ হলো অস্বাভাবিকভাবে ভ্রূণের গর্ভ থেকে নিঃসরণ বা ভ্রুন হত্যা।[৩৯১] অস্বাভাবিকভবে ব্যক্তি উদ্যোগে ও স্বেচ্ছায় গর্ভের ভ্রূণকে পরিপূর্ণ হওয়ার আগেই কোনো ঔষধ, আঘাত বা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নষ্ট বা হত্যা করাই হলো অবৈধ গর্ভপাত।

আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর মধ্যে যে আকর্ষণ ও উভয়য়ের দাম্পত্য জীবনে যে আনন্দ দান করেছেন তা মহান আল্লাহর এক শ্রেষ্ঠ নি'আমত। সুতরাং যে ব্যক্তি দাম্পত্য জীবনের সুখ আনন্দ উপভোগ করতে চায়, কিন্তু এর ফলাফলকে মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না, সে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন সাধন করার ইচ্ছা পোষণ করে।

৪. অশ্লীল প্রকাশনা

সাধারণত 'প্রকাশ' বলতে কোন কিছুর প্রচার বা সঞ্চার বুঝায়। বাংলাদেশ কোড-এর, ২৮ নং আইন 'কপিরাইট আইন-২০০০' এর আলোকে প্রকাশনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "প্রকাশনা" অর্থ কোন কর্মের অনুলিপি জনগণের নিকট সরবরাহ করার অথবা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৈনিক, পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকায়, অশ্লীল ও নগ্ন ছবি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পত্রিকার মধ্যে আবার এমন পত্রিকাও রয়েছে যেগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত

---

৩৮৭. ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*,প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ.৭৫

৩৮৮. *আল-কুরআন*, সূরা নূর (২৪) : ৩৩

৩৮৯. *আল-কুরআন*, সূরা আন'আম (৬) : ১৫১

৩৯০. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ.৮,পৃ.২৩২, হাদিস নং-২২৩৭

৩৯১. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খৃ.), পৃ. ৩৪১

পরিতাপ ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে আমাদের দেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশ বিজাতীয়দের অনুসরণ করে একই বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকার এমন কিছু নির্দিষ্ট পাতা রয়েছে যেখানে, অর্ধনগ্ন ও নগ্ন ছবি প্রকাশিত হয়। আর এ সকল পত্রিকার পাতাগুলোতে অশ্লীল ছবি প্রকাশিত হওয়ার কারণে সর্বস্তরের জনগনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এ জন্য সমাজেও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ছাড়া আরো কিছু পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায় যা গোপনে বিক্রি করা হয় এবং তার মুলবিষয় হলো নগ্নতা ও যৌনতা উষ্কিয়ে দেয়া।

৫. গীবত ও বুহতান

অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারের অপর একটি মাধ্যমে হলো গীবত তথা পরনিন্দা এবং বুহতান বা মিথ্যা অপবাদ।

গীবত غيبة আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থা-কুৎসা, পরনিন্দা, পরচর্চা, পরোক্ষে নিন্দা ইত্যাদি।[৩৯২] কারো অগোচরে তার পোশাক-পরিচ্ছদ, বংশ চরিত্র, দেহাকৃতি, কর্ম, দীন, চলাফেলা ইত্যাদি যে কোন বিষয়ে কোন দোষ অপরের কাছে প্রকাশ করা।[৩৯৩]

এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী রহ. বলেন : পরচর্চায় তিন ধরণের পাপ হতে পারে। অপরের মধ্যে যে দোষ বিদ্যামন তা আলোচনা করা গীবত; যে ত্রুটি তার মধ্য নেই তা আলোচনা করা অপবাদ; আর তার সম্বন্ধে যা কিছু শ্রুত তা আলোচনা করা মিথ্যা বলার শামিল।[৩৯৪]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় জানা যায়,

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ؟

"আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসুল্লাহ স. বলেছেন, গীবত হলো তোমার ভাই সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।"[৩৯৫]

অপর এক বর্ণনায়ে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

"আবূ হুরায়রা রা. বলেন: একদা রাসূল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গীবত কী? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, গীবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু বলা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে। বলা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে তা বিদ্যমান থেকে তাহলেও কি গীবত হবে? তিনি জবাবে বললেন, তোমার ভাইয়ের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান তা বললে তুমি তার গীবত করলে; আর তা না থাকলে তুমি তাকে বুহতান তথা মিথ্যা অপবাদ দিলে।"[৩৯৬]

বুহতান (بهتان) আরবী শব্দ। অভিধানিক অর্থ অপবাদ, দুর্নাম, মিথ্যা, রটনা ইত্যাদি। ইসলামের চিরস্থায়ী বিধান হলো কারো প্রশংসা করতে হলে তার অসাক্ষাতে আর সমালোচনা করতে হলে সাক্ষাতে করতে হয়। এ বিধান লংঘন করে যখনই কারো অসাক্ষাতে নিন্দা, সমালোচনা বা কুৎসা রটানো হয়, তখন তা শরীয়াতবিরোধী কাজে পরিণত হয়। এ ধরনের কাজ তিন রকমের হতে পারে এবং তিনটিই কবীরা

---

৩৯২. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১৫২

৩৯৩. আবু হামেদ আল-গাযালী, *ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন* (বৈরূত: দারুল মা'রিফা,তাবি.), খ. ৩, পৃ. ১৪

৩৯৪. আবু হামেদ আল-গাযালী, *ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন*,প্রাগুক্ত, খ.৩,পৃ.১৪৪

৩৯৫. ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.২৬৯, হাদিস নং-৪৮৭

৩৯৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৬,পৃ-১৪২, হাদিস নং-৬৭৫৮

গুনাহ। প্রথমত. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ বা দোষ অরোপ করা হয়, তা যদি মিথ্যা বা প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণহীন হয়, তবে তা নিছক অপবাদ। আরবীতে একে বুহতান বা 'কায্ফ' বলা হয়।

৬. সমকামিতা

বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণব্যাধি এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, এটি একটি বদমায়েশী রোগ, যা শুধু মাত্র দুশ্চরিত্রদেরকে আক্রমণ করে। এ মরণব্যাধির উৎপত্তি ঘটেছিল লূত আ. এর সম্প্রদায়ের কুকর্মের জন্য। আর সেটি হলো লূত আ: এর সম্প্রদায় ব্যভিচার করেছিল, মহিলা বাদ দিয়ে পুরুষে-পুরুষে। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

"আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল: 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশত পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।"[৩৯৭]

১৯৮৫ সালের অন্য এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে: ১৪,৭৩৯ জন এইডস রোগে আক্রান্ত রোগী মধ্যে ১০৬৫৩ জন রোগীই পুরুষ সমকামী। আমেরিকার মত উচ্চ শিক্ষিত সভ্য এবং সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়ে সমকামিতার মত নিকৃষ্ট ঘৃণিত মানবতা বিরোধী অশ্লীলতাকে যদি আইন করে বৈধ করে তাহলে কিভাবে সম্ভব অশ্লীলতাসহ মানব সভ্যতা ধ্বংসের সকল ধরনের কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিরোধ প্রতিহত করে বিশ্ব সমাজে মানব সভ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা? কামপ্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জালে আবদ্ধ হয়ে লজ্জা শরম ও ভাল-মন্ডের স্বভাবজাত পার্থক্য বিসর্জন দিয়ে পার্লামেন্টে সমকামিতা বিল পাশ করে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকাশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছে। ব্যভিচার যখন পার্লামেন্টে বৈধ ঘোষণা করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা সমাজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। আর তখনই সে সমাজ আল্লাহ্র গজবের উপযুক্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয় যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুস্থ্য স্বভাবের কাছে ঘৃণ্য হওয়ার কারণে সাধারণ জন্ত জানোয়ারও এর নিকটবর্তী হয় না। মানুষের পাশবিক ও লজ্জাকর অশোভন আচরণ যে কত দ্রুত সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আধুনিক শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা কিভ বে ভয়াবহ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা সমস্ত বিশ্ববাসী আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ

"যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেই নেই।"[৩৯৮]

বিভিন্ন জটিল, দুরাগোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং যাবতীয় বিধিনিষেধ যথাযথ ভাবে পালন। আর রাসূলে কারীম স. এর মহান আর্দশের বাস্তবায়ন। বিশ্বের এই মহা দুর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ার বাণী উপলব্ধি করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুসাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই (WHO) এ মর্মে ঘোষণা করেছে:

---

৩৯৭. আল-কুরআন, আন'আম (৭) : ৪৭

৩৯৮. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস (১০) : ২৭

"এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই অধিক সহায়ক হতে পারে না, যার প্রতি সকল ওহীভিত্তিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।"[৩৯৯]

৭. অশ্লীল কথাবার্তা

ইসলামি সমাজে অশ্লীল কথাবার্তার কোন অবকাশ নেই। তা ব্যক্তির মনের কলুষতারই প্রকাশ করে না, গোটা পরিবেশ-পরিমণ্ডলকেও পংকিল করে তোলে। তাতে আল্লাহ-নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়। তবে একান্তই প্রয়োজনীয় অবস্থায় নিছক ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বললে তা অবশ্য নিষিদ্ধ নয়, এ জন্যই কুর'আনে লজ্জার সীমালংঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব অশ্লীল কথাবার্তার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত থাকে কোন না কোন নারীর যৌন দিক সম্পর্কে। নারীর রূপ-সৌন্দর্যও অনেক সময় অশ্লীল কথাবার্তার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। তাতে তার বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখও হয়ে থাকে, যা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। আরবী ভাষায় এটিকে رفث বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

"তার জন্য হজ্জে অশ্লীল ও পাপকাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।"[৪০০] এ অশ্লীল ও নারীর যৌনতার দিকে ইঙ্গিতবহ কথাবার্তা কেবল হজ্জ-এর দিনসমূহের করা যাবে না তাই নয়, সাধারভাবে সকল সময়ের জন্যই তা নিষিদ্ধ।

নির্লজ্জ অশ্লীল কথাবার্তার অপর একটি দিক হচ্ছে এটি ক্রোধ ও আক্রোশ প্রকাশ করার জন্য গালাগাল উচ্চারণ করা। গালাগাল, বিশেষ করে অশ্লীল গালাগাল সামাজিক পংকিলতা নিয়ে আসে। ক্রোধ আক্রোশে অন্ধ হয়ে মানুষ মুখে অশ্লীল গালাগাল উচ্চারণ করে থাকে। সামান-সামনি এ গালাগাল দিলে গোটা পরিবেশ বিষাক্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। সামাজিক কলুষতা ব্যাপক হয়ে উঠে। এ গালাগাল ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে তার বাপ মাকে গাল দিয়েও অনেকে ক্ষান্ত হয় না; বরং গোটা বংশকেই হীন প্রমাণ করতে চেষ্টা করে।৪০১ এ ধরনের গালাগাল সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

"لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ

"আল্লাহ্ নির্লজ্জতা প্রকাশকারী কথাবার্তা মোটেই পছন্দ করেন না, তবে যার ওপর যুলম করা হয়েছে (তার কথা আলাদা)।"[৪০২]

সাধারণত একজন একটি গালি দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক তীব্র ও অধিক অশ্লীল গালি উচ্চারণ করে থাকে। তাতে অশ্লীলতারই ব্যাপকতা বাড়ে, চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। এ কারণে কোনরূপ গালাগাল না করাই বাঞ্ছনীয়। এমনকি আল্লাহ্ তো মুশরিকদেরও গালাগাল করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৩৯৯. Nothing can be more helful in this preventive effort than religious teaching and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by ll divine religions the role of religion and ethics in the prevention and control of AIDS

-দিরোল অফ রিলিজিয়ন এন্ড ইথিক্স ইন দ্যা প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ এইডস, (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্যা কর্তৃক প্রকাশিত),অনুচ্ছেদ. ৯, পৃ.৩

ডা. মুহাম্মদ মনসুর আলী বলেন: বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ. আই ভি। এইডস এমনই এক সময়ে সমগ্র বিশ্বে চরম আতঙ্ক এবং নিরতিশয় হতাশা সৃষ্টি করেছে যখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির অত্যুঙ্গ শিখরে অবস্থান করছে। এ মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসেবে দেখা গেছে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামিতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫% সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং দিন দিন এইডস নামক মরণব্যাধিতে আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। -আল উম্মাহ পত্রিকা, রবিউল আখির, ১৪০৬ হিজরী

৪০০. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা (২) : ১৯৭

৪০১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৪

৪০২. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ১৪৮

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

"আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে ডাকে (ইবাদত করে), কেননা তোমরা তাদের গাল দিলে তারাও শত্রুতাবশত কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াই তোমাদের আল্লাহকে গালমন্দ করবে।"[৪০৩]

অশ্লীল কথাবার্তা মূর্খতার লক্ষণ, বর্বর যুগের স্মারক এবং সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। একজন সাহাবী তার ক্রীতদাসকে তার মা'র কথা বলে গাল দিলেন। নবী করীম (সা) তা শুনে বললেন, তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে? গালাগাল নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে এ সূক্ষ্ম কারণও নিহিত রয়েছে যে, তাতে সাধারণত নির্লজ্জ, বেহায়া কথাবার্তা ও উক্তি শব্দের আকারে মুখে উচ্চারিত হয়। তাতে সমাজের লোকদের মধ্যে অশ্লীল কথাবার্তা শুনবার ও সহ্য করার অভ্যাস হয়ে যায়। এভাবে অশ্লীল কথা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত হয়ে যায়। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন,

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ،

"অশ্লীল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা যে জিনিসে শামিল হবে, সে জিনিসকেই কুৎসিত করে দিবে।"[৪০৪]

একমাত্র নামাযই অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.

"আপনি আবৃত্তি করুন কিতাব হতে যা আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় এবং নামায কায়েম করুন। নামায অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকার্য হতে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।[৪০৫]

কাম-প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মানুষ অশ্লীল কথাবার্তা বলে থাকে। আবার ক্রোধের বশীভূত হয়েও লোকেরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে। কোন অবস্থাতেই অশ্লীল কথাবার্তা ও গালিগালাজ করা জায়েয নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপ এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী।"[৪০৬]

অশ্লীলতা প্রসারে আধুনিক গনমাধ্যমের ব্যবহার

অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারে আধুনিক গনমাধ্যমসমূহের বৈরী পদক্ষেপ সম্পর্কে চিত্র তুলে ধরা হলো:

১.ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা

বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আর তাতে অংশ নেয় বিভিন্ন সুন্দরীগণ। আর সেখানে সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে প্রদর্শিত হয় তাদের উলঙ্গ দেহের বিভিন্ন অংগের বৈচিত্রময় ব্যবহার। যা সেখানে উপস্থিত ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পরিচালিত চ্যানেলগুলোর দর্শকদের নৈতিক জীবনকে যৌন সুড়সুড়ির দিকে ধাবিত করে। তন্মধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সুন্দরী মিস ওয়ার্ল্ড ও বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য। তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির নামে অপসংস্কতির এ কালো ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে –যা মুসলিম জাতির জন্য একটি অশুভ লক্ষণ।

---

৪০৩. আল-কুরআন, সূরা আন'আম (৬) : ১০৮

৪০৪. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১২৬৮৯;

৪০৫. আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত (২৯) : ৪৫

৪০৬. আবু জাফর তাহাভী, *শরহু মুশকিলিল আছার*, (*মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ*, প্রথম সংস্কণ: ১৪১৫ হি.) খ. ২, পৃ. ৩১১, হাদিস নং ৮৪৪

২. ইউটিউবে আপলোড করা বিভিন্ন নগ্ন ভিডিও

অশ্লীলতা প্রচার ও প্রসারে আধুনিক প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে আছে। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভিডিও আপলোড ও ডাউনলোড করার উল্লেখযোগ্য একটি ওয়েবসাইট হলো ইউটিউব, যেখানে একজন ব্যক্তি যে কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারে এ বিষয়টাকে আমরা সকলেই ইচ্ছা করলে ভালো ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু তা না করে বরং সেখানে এমন এমন ভিডিও আপলোড করা হয় যা ইতিপূর্বের সকল নগ্নতাকেও ছাড়িয়ে গেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। কেননা, সেখানে সকল প্রকার নগ্ন ভিডিও প্রকাশ করা হয়। যেমন: কোনো ছেলে মেয়ের অন্তরঙ্গ ভিডিও গোপনে ধারণকৃত অশ্লীল দৃশ্য ইত্যাদি।

৩. ফেসবুক

আধুনিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের একটি বহুল চর্চিত মাধ্যম হলো ফেসবুক। যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও বার্তা আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু আধুনিক যুগে এ গণমাধ্যমে এমন কিছু অশ্লীল ছবি দিয়ে আইডি খোলা এবং সেখানে এমন অশ্লীল ছবি ও মন্তব্য পোস্ট করা হয় যা ইসলামি শরীআহ ও নৈতিকতাবিরোধী এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা না হলে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ও আগত প্রজন্ম নৈতিকতা থেকে দূরে চলে যাবে এবং জাতি মেধা বুদ্ধি থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে।

৪. বিভিন্ন ব্লগ

যোগাযোগ মাধ্যমের একটি বৃহৎ মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। এ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমানে বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ তৈরি করেন। আর সেখানে তারা নিজস্ব মতামত ও নানাবিধ লেখা পোষ্ট করে থাকেন। কিন্তু আধুনিককালে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে ব্লগ পরিচালিত করে থাকেন যেখানে ইসলাম বিরোধী ও যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার জন্য বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী, জঙ্গিবাদী এবং উস্কানিমূলক লেখা পোস্ট করে থাকেন। আর এ কারণে আজ আমাদের যুবসমাজের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতাবোধ পরিলক্ষিত হয় না। আর এগুলো পড়ে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা জন্ম নিতে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাব পড়ছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর।

৫. অশ্লীল পত্রিকা

বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৈনিক, পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকায়, অশ্লীল ও নগ্ন ছবি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পত্রিকার মধ্যে আবার এমন পত্রিকাও রয়েছে যেগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য ও ছবি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের সাথে বলতে হয় যে আমাদের দেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশ বিজাতীয়দের অনুসরণ করে একই বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকার এমন কিছু নির্দিষ্ট পাতা রয়েছে যেখানে, অর্ধনগ্ন ও নগ্ন ছবি প্রকাশিত হয়। আর এ সকল পত্রিকার পাতাগুলোতে অশ্লীল ছবি প্রকাশিত হওয়ার কারণে সর্বস্তরের জনগনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এ জন্য সমাজেও অশ্লীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এ ছাড়া আরো কিছু পত্রিকা বাজারে পাওয়া যায় যা গোপনে বিক্রি করা হয় এবং তার মুলবিষয় হলো নগ্নতা ও যৌনতা উস্কিয়ে দেয়া।

৬. নগ্ন বিলবোর্ড ও পোস্টার

অশ্লীলতার অপর একটি প্রচার মাধ্যম হলো নগ্ন বিলবোর্ড ও অশ্লীল পোস্টার। এ দৃশ্যটি বাংলাদেশে অনেক বছর আগে থেকেই প্রচলিত। যদিও পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত কিন্তু বর্তমানে যে অশ্লীল পোস্টার দেখা যায় তা হয়তো পূর্বের সকল কার্যক্রমকেও হার মানিয়ে দেবে। কেননা, অধুনা সিনেমার পোস্টারগুলোতে এমন কিছু উলঙ্গ নারীদের ছবি প্রকাশ করা হয়, যার দিকে কোনো নারীও হয়তো

দৃষ্টিপাত করতে পারে না। লজ্জায় তার মাথা নত হয়ে যাবে। আর এগুলো যখন যুব সমাজের মাঝে প্রকাশিত, তখন তারা এ সকল পোস্টার দেখে বিভিন্ন রকম অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

৭. নারীদের উচ্ছৃংখল চলাচল

নারীদের অমার্জিত চালচলন-উচ্ছৃংখল চলাফেরা। পবিত্র কুরআনে নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে তাগিদ দেবার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের মতো সাজ-সজ্জা করে নির্লজ্জের মতো রাস্তায় চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসে কুরআনের হুকুমের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেহায়ার মতো চলাফেরা শুরু করেছে। আপত্তিকর পোশাক পরে হরেক রকমের প্রসাধনী মেখে চরম সাজসজ্জা করে রাস্তা-ঘাটে, বাইরে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের মাঝে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেড়াচ্ছে।[৪০৭] নারীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যৌন নিপীড়ন মতো সামাজিক অপরাধ।

৮. মোবাইলের মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে

আধুনিক যুগে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল অন্যতম। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হচ্ছে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। যেমন ধর্ষণের ভিডিও চিত্র ধারণ করে ব্লুটুথের মাধ্যমে পরস্পর ফাইল আদান প্রদান করা বিভিন্ন অশ্লীল ভিডিও মেমোরি কার্ডে ধারণ করে তা দেখা। আর এর মাধ্যমে আমাদের সমাজ বিশেষ করে যুবসমাজ একেবারে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে।

অশ্লীলতার পরিণাম

১.অশ্লীলতা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা

অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪০৮] এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন।

২. অশ্লীল ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম

অশ্লীলতা মানুষের পারলৌকিক জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। অশ্লীল ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

«إِنَّ الْجَنَّةَ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ أَنْ يَدْخُلَهَا

"প্রত্যেক অশ্লীল আচরণকারীর জন্য জান্নাতে প্রবেশ হারাম।"[৪০৯]

৩. অশ্লীলতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা

---

৪০৭. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪ খৃ.), পৃ. ৫০৯

৪০৮. আল-কুরআন, সূরা নাহল (১৬) : ৯০

৪০৯. আবু নু'আইম ইসপাহানী, *হিলইয়াতুল আওলিয়া*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী),খ. ১,পৃ.২৮

যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (স.)-কে অমান্য করে সে তার নিজেরই ক্ষতি করে, আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারে না। রাসূলে পাক (স.) এরশাদ করেন,

«كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»

"আমার প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যে অস্বীকার করেছে সে নয়। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, কে অস্বীকার করে? প্রতি উত্তরে বললেন, যে আমার অনুসরণ করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার নাফরমানী করেছে সে আমাকে অস্বীকার করল।"[৪১০]

মু'আবিয়া (রা.) সিরিয়ার হেমসে ঘোষণা করেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭ (সাত)টি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন এবং তন্মধ্যে অশ্লীলতা একটি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ (দশ) রকমের আচরণকে অপছন্দ (ঘৃণা) করতেন, তন্মধ্যে অবাঞ্ছিত স্থানে অশ্লীলতার মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রদর্শন অন্যতম।

আল্লাহ্ পাকের করুণা বর্ষিত হোক ইমাম সুয়ুতি (রা.) এর প্রতি। তিনি বলেছেন অপরিচিত আগন্তুকদেরকে সৌন্দর্য প্রদর্শনের ন্যায় নগ্নতাকে আল্লাহ্ পাক ঘৃণা করেন।[৪১১]

৪. অশ্লীলতা এক ধ্বংসাত্মক গোনাহ

রুকাইয়ার কন্যা উমাইয়া দ্বীন ইসলামের বাণী কবুল করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার বার্তাবাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার ও ভেজাল করবে না, শিশু হত্যা করবে না ও হাতের ও পায়ের দ্বারা গোনাহ করবে না, বিলাপ করে ক্রন্দন করবে না। এবং জাহেলী যুগের ন্যায় অশ্লীলতার আশ্রয় নেবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীলতাকে মহাপাপের অংশ হিসেবে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করেছেন।

৫. অশ্লীলতার অভিশাপ আল্লাহ্র রহমত হতে বঞ্চিত করে

নবি করিম (স.) বলেন,

«سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات»

"অচিরেই আমার শেষ জামানার উম্মতের মাঝে এমন কিছু নারীর আগমন ঘটবে যারা পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে উলঙ্গ থাকবে। এবং তাদের মাথার উপর উটের মত টুটি থাকবে। তোমরা তাদের অভিশাপ কর। যেহেতু তারা অতিশপ্ত।"[৪১২]

৬. অশ্লীলতা মানুষকে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে

রাসূল (স.) এরশাদ করেন:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

"দুই শ্রেণীর দোজখবাসীকে আমি এখনও দেখি নাই, তাদের এক শ্রেণীর হাতে গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে এবং তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে এবং ঐ সমস্ত স্ত্রী লোক যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ

---

৪১০. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: দাওরু তওকিন্নাজাত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২হি.),খ. ৯, পৃ. ৯২,হাদিস নং ৭২৮২

৪১১. শাইখ ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও আব্দুল হামীদ আল বেলালী, অনু.এ.এস.এম.এ. হাকিম, প্রিয় বোন! পর্দা কি,কেন পর্দা কর না? (ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৭ খৃ.),পৃ.১৭

৪১২. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুস সগীর*, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৫),খ. ২, পৃ. ২৫৭,হাদিস নং ১১২৫

থাকবে। পরপুরুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবে। তাদের মাথা বড় উটের মাথার মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না। যদিও ঘ্রাণ দুর থেকে পাওয়া যাবে।"[৪১৩]

৭. অশ্লীলতা বিচার দিবসে অন্ধকারময়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ نُورَ لَهَا.

"কিয়ামতের দিন ভিন্ন পুরুষের মাঝে সেজেগুজে, হেলেদুলে মাটিতে হেঁচড়ে মন্থর গতিতে চলাচলকারী স্ত্রীবর্গের উপমা হলো এই যে, তারা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। তাদের মাঝে কোন আলো থাকবে না।"[৪১৪]

বিচার দিবসে ঐ সমস্থ নারী অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে যেমন অন্ধকারে সে মাতৃগর্ভে ছিল। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল (স.) এর আনুগত বান্দা পরজীবনে মহা আনন্দঘন দিনক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। সিয়াম সাধনার পুরস্কারের ন্যায় পর্দাশীন নারী বিচার দিবসে পুরস্কৃত হবেন। যারা পর্দাশীল মহিলাকে উত্ত্যক্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হবে তারা আল্লাহ্র গজবে নিপতিত হবে।

৮. অশ্লীলতা এক প্রকার ভন্ডামী (মুনাফেকী)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

" خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ، إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ، إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ "

"তোমাদের স্ত্রীবর্গের মধ্যে উত্তম হলো তারা যারা স্নেহপরায়ণ, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী বিনম্র, সংবেদনশীলা, কেননা তারা আল্লাহ্কে ভয় করে। এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো তারা যারা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে ঘোড়ার মত চটপটে এবং তারাই হলো মুনাফিক। তাদের মধ্যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে যদি কেউ সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মতো হয়ে যায়।"[৪১৫] এখানে সাদা পা বিশিষ্ট কাক বলতে লাল ঠোঁট ও সাদা পা বিশিষ্টি কাককে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, খুব কম মহিলাই জান্নাতে যাবে। কেননা এ ধরনের কাক খুব কমই দেখা যায়।

৯. অশ্লীলতা-অপমানজনক

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

" أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ "

"যে মহিলা তার স্বামীর ঘর ব্যতীত পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয়, সে যেন আল্লাহ্ ও তার মধ্যেকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলল।[৪১৬] ইমাম আল মানাভী (র.) বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন মহিলা বাড়িতে স্বামী ব্যতীত অন্য কারও সামনে পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে অনাবৃত হয়ে কাউকে তার সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তবে সে যেন আল্লাহ্ ও তার মধ্যকার বন্ধক ঢালকে ভেঙ্গে ফেলল। মহান আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন:

يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি দেহের আবরণ এবং সাজসজ্জা বস্তু হিসেবে এবং পরহেজগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম।"[৪১৭]

---

৪১৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,হাদিস নং ২১২৮

৪১৪. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত,খ. ২, পৃ. ৪৬১, হাদিস নং-১১৬৭

৪১৫. ইমাম বায়হাক্কী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ,২০০৩), খ. ৭, পৃ. ১৩১, হাদিস নং ১৪৪৬৮

৪১৬. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪৩, পৃ, ৩৩০, হাদিস নং ২৬৩০৪

৪১৭. আল-কুরআন, সূরা আরাফ (০৭) : ২৬

সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় না করে যে মহিলা অনাবৃত হয়ে তার এবং মহান আল্লাহ্‌র সম্পর্ককে ছিন্ন করে, নিজেকে অপমানিত করে স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে দোষী হলো, আল্লাহ্ তাকে লজ্জিত ও লানত করেন।

১০. অশ্লীলতা অনবিজ্ঞতা ও লজ্জাহীনতা

নারীদের শারীরিক গঠনপ্রণালী এমন যে, তাদের সমস্ত শরীর দেখা যায় না। তাদের এমন পোশাক পরিধান করা উচিত যাতে শরীরের মূল গঠনপ্রণালী লজ্জাজনকভাবে দৃষ্টিগোচর না হয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার গোলামদের সর্বপ্রকার লজ্জাজনক গোনাহ হতে বেঁচে থাকতে বলেছেন,

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ

"তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে তখন বলে আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আপনি বলুন, নিশ্চয় আল্লাহ্ মন্দ কাজের আদেশ দেন না।এমন কথা আল্লাহ্‌র প্রতি কেন আরোপ কর যা তোমরা জান না।[৪১৮] আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর অশ্লীল কাজ করতে আদেশ করে।"[৪১৯]

মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[৪২০] অশ্লীলতাই যেনার মত মহাপাপ ছড়িয়ে দেয়ার প্রধানতম কারণ।"

১১. অশ্লীলতা ইহুদীদের রীতিনীতি

নারী ফেৎনা দ্বারা কোন জাতিকে ধ্বংস করার মত বিশেষ ভূমিকা পালন করে ইহুদী জাতি। তাদের অবস্থানকে মজবুত করার পেছনে অশ্লীলতা একটা কার্যকর অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। লক্ষ্য করা উচিৎ কাদের দ্বারা হলিউড, বিখ্যাত সাজঘর, সাময়িকী পত্রিকাসমূহের ন্যায় বিশ্ব বিজ্ঞাপন ও ছবি জগতের পর্দাসমূহের চলে আসছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

"কাজেই তোমরা ভয় কর পৃথিবীকে আর ভয় কর নারীদেরকে। কেননা বনী ইসরাইলের সর্বপ্রথম পরীক্ষার বস্তু (ফিতনা) ছিল নারী জাতির মধ্যে।"[৪২১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বলবৎ থাকলেও নারী জাতির অনুকরণ ও অনুসরণ নিষেধাজ্ঞা তথাপিও বিপুলসংখ্যক মুসলমান তার সাবধানতাকে মূল্যায়ন করছে না।

১২. অশ্লীলতা জাহিলিয়াতের ন্যায় নোংরা অজ্ঞতা

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

---

৪১৮. আল-কুরআন, সূরা আরাফ (০৭) : ২৮

৪১৯. আল-কুরআন, সূরা বাকারা (০২) : ২৬৮

৪২০. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ১৯

৪২১. ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫), মুসনাদে আবু সাঈদ খুদরী, খ. ১৭ , পৃ, ২৬১, হাদিস নং ১১১৬৯

"জাহিলী যুগের মত তোমরা নিজদেরকে প্রদর্শন না করে নিজ বাসস্থানে অবস্থান কর।"[৪২২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নোংরা জাহেলী যুগের বর্ণনা দিয়ে তার ধরণ পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"আর তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহকে হালাল করেছেন এবং হারাম করেছেন তাদের উপরে অপবিত্র বিষয়াবলি।"[৪২৩] অশ্লীলতা জাহিলী যুগের ন্যায় অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং দুটোকেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিধি বহির্ভূত বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ

"জাহিলী যুগের প্রতিটি বিষয় অবশ্যই আমার পায়ের তলায়।[৪২৪]

জাহিলী যুগের ন্যায় মিথ্যা অহংকার ও গর্ব আল্লাহ্ সম্বন্ধে খারাপ চিন্তা ও উক্তি, আল্লাহ্র সহিত শরিক, অশ্লীলতা এসবই গর্হিত কাজ।

১৩. অশ্লীলতা-বেপর্দা পশুবৃত্তি, নৈতিকতার অস্বীকৃতি ও অবক্ষয়

প্রকাশ ও প্রদর্শন নীতিগতভাবে পশুর চরিত্র। মানুষ ঐ চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ বিপথগামী না হয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত ন্যূনতম লজ্জা ও আত্মরক্ষার স্বভাব ধারণ করে অবশেষে সঠিক পথে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়। উম্মুক্ততা, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেপর্দা সৌন্দর্যের মাপকাঠি বিবেচিত হলে নারী জাতি কুপ্রবৃত্তি, রুচিহীনতা, ধ্বংস, অধ:পতন ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে বাধ্য। মানুষের সাধারণ সভ্যতা পর্দা বা শরীর ঢেকে রাখার সাথে সম্পৃক্ত আত্মার বলে বলীয়ান হয়েই নারী পর্দায় আকৃষ্ট ও অভ্যস্থ হয়ে থাকে। পর্দার শৃঙ্খল হতে তথাকথিত মুক্তির সংগ্রাম একটি ঘৃণ্য অপপ্রয়াস। বেপর্দায় অবাধ মেলামেশা অশ্লীল, যৌন ও অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। আর যে এই প্রচেষ্টায় কামিয়াবি চায় তাকে অন্তরের চাহিদা আবৃত রাখার আশা পরিত্যাগ করে অশ্লীলতার আনন্দ উপভোগ করতে হবে। এতেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, অশ্লীলতাই লজ্জার অবনতি ঘটিয়ে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে।[৪২৫]

১৪. অশ্লীলতা পথভ্রষ্টতার দ্বার উন্মোচন করে

সাবধানতার সাথে ইসলামে প্রতিপাদ্য (কুরআন, সুন্নাহ) নিরীক্ষণ কিংবা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করলে অশ্লীলতা খারাপ দিক ও কুফল যে কোন ব্যক্তির নিকট পরিছন্ন প্রতিভাত হবে। ধর্মীয় বৈষয়িক ব্যাপার ব্যতীত অবাধ মেলামেশার পর্যায়ে পৌঁছলে অশ্লীলতার ভয়াবহতা বিশেষভাবে অনুধাবন সম্ভব হয়ে পড়বে।

১৫. রোগ বিস্তার

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا،

"যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পুর্বপুরুষদেও মধ্যে প্রসারিত ছিল না।"[৪২৬]

---

৪২২. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৩

৪২৩. আল-কুরআন, সূরা আরাফ (০৭) : ১৫৭

৪২৪. ইমাম ইব্ন মাযাহ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ) খ. ২, পৃ. ১০২২, হাদিস নং ৩০৭০

৪২৫. শাইখ ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও আব্দুল হামীদ আল বেলালী, প্রিয় বোন!পর্দা কি,কেন পর্দা কর না?, প্রাগুক্ত,পৃ.২৬

৪২৬. ইমাম ইব্ন মাযাহ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ) খ. ২, পৃ. ১৩৩২, হাদিস নং ৪০১৯

তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহারের ফলে মানুষ আজ নানান ধরণের অন্যায়-অপরাধ, অশ্লীলতায় নিয়োজিত হচ্ছে। যা উঠতি বয়সী কিশোর যুবক থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধদেরকেও অন্যায় অপরাধের দিকে অনেক বেশি ধাবিত করছে। এ ধরণের সমস্যায় শুধু পুরুষ নয়, মহিলারাও আক্রান্ত হচ্ছে। আর সময় মতো এই অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিপত্তি। মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। যে কোনো সময় আমাদের দুনিয়ার জীবনেই নেমে আসতে পারে 'যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'। রোগব্যাধি, জাগতিক অপমান, শাস্তি, লাঞ্ছনা, পরিবারের অশান্তি সন্তানদের অধঃপতন ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে আল্লাহর শাস্তি আমাদের জীবনকে স্পর্শ করতে পারে। কাজেই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতে হবে। রোধ করতে হবে অশ্লীলতার সকল পথ। অন্তত কোনোভাবেই অশ্লীলতার প্রসারে সহায়ক হবো না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যিনা-ব্যভিচার

ব্যভিচার বা যিনা চরিত্রকে কলুষিত ও ধ্বংস করে। এটি অসচ্চরিত্রের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় –যা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ নষ্ট করে, পরিবারকে বিনষ্ট করে, সংক্রামক ব্যাধি ও চারিত্রিক অপরাধগুলোকে শেষ করে দেয়। ব্যভিচারের কারণে সামাজিক ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায়। যার কারণে সমাজে চরম নৈতিক বিপর্যয় ঘটে। সুস্থ বিবেকের অধিকারী মানুষমাত্রই ব্যভিচারকে ঘৃণা করে এবং এ অপকর্মকে মানবতাবিরোধী চরম ঘৃণিত সামাজিক অপরাধ বলে স্বীকার করে। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজ যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা বা নৈতিক বিধি নিষেধের পরওয়া করে না। এ কারণেই পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে ব্যভিচারকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামে ব্যভিচারকে জঘন্যতম ও নিকৃষ্ট কর্ম বলে এর কাছেও যেতে নিষেধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[৪২৭]

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ

৪২৭. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মুমিন থাকে না।[৪২৮]

ব্যভিচার বা যিনার পরিচয়

ব্যভিচারের আরবী প্রতিশব্দ যিনা (الزناء)। এটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। এটির আভিধানিক অর্থ হলো, অবৈধ যৌন সম্ভোগ, পাপাচার, সংকীর্ণতা, ঊর্ধ্বারোহণ ইত্যাদি।[৪২৯] ব্যভিচার বা যিনা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Adultery; going astray; develation from the proper cowrse; Transgression; exception to a rule.[430] সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন মিলনকে বুঝানো হয়। ইসলামি আইনের পরভাষায়, যিনা-ব্যভিচার হলো অবৈধ সংগমের নাম, যা বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে।[৪৩১]

ড. আনওয়ার আহ্মদ কাদেরী বলেন, বিবাহ ZINA: Adultery is committed either with an unmarried or a married person.[432]

Oxford English Dictionary গ্রন্থে বলা হয়েছে, Adultery (الزناء) Voluntary sexual intercourse of a married person other than with his or her spouse.[433]

ইবন 'আবেদীন আশ-শামী (র) বলেন,

أَمَّا الزِّنَا فَهُوَ كُلُّ وَطْيٍ وَقَعَ عَلَى غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ وَلَا مِلْكِ يَمِيْنٍ

'যিনা এমন সহবাসকে বলা হয়, যা সঠিক বিয়ে কিংবা রূপক বিয়ে ছাড়া ও দাসত্বের মালিকানা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়।[৪৩৪]

হানাফী ফকীহগণের মতে,

اَلزِّنَا وَطْئُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ فِيْ الْقُبُلِ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ

'প্রকৃত মালিকানাবিহীন ও রূপক মালিকানাহীন মহিলার সামনের দিকে কোন পুরুষ সংগম করাকে যিনা বলা হয়।'[৪৩৫]

শাফিঈ ফকীহগণের মতে,

هُوَ إِيلَاجٌ فِي فَرْجٍ محرم لعينه قطعا مشتهى طبعا من غير شبهة ولا إكراه

"স্বভাবগতভাবে যৌনকামনাময়ী নিষিদ্ধ কোন লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ ও জবরদস্তি ছাড়া পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো।[৪৩৬]

হাম্বলী ফকীহগণের মতে,

---

৪২৮. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৪৭৩১;

৪২৯. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ,১৯৯৪ খৃ.),খ. ১. পৃ.২৫৭; আল-ফাইরুযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১ খৃ.),খ.১, পৃ.২৩১

৪৩০. Ashu Tosh Dev, *Students Favourite Directionary*, Bangla to English,(Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986), p. 973

৪৩১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৪৩২. Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the modern world*, (New Delhi: Taj Printers, 1986), P. 295.

৪৩৩. *Oxford Dictionary of contemporary English*,(Dhaka: Networks Printers, New Edition,2006), P. 30

৪৩৪. ইব্ন 'আবেদীন আশ-শামী, *রদুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার*, (পাকিস্তান : এডুকেশন প্রেস, তা, বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪; ইব্ন রুশদ আল-কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহায়াতিল মুকতাসিদ*, (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮ খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩

৪৩৫. আল-বাহরুর-রাইক, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩; ফাতহুল-কাদীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

৪৩৬. আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়্যাহ আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব শারহ রাওযিত্-তালিব*, (মিসর: আল-মাতবা'আতুল মায়মানিয়্যাহ, ১৩১৩ হি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫; আবু ইসহাক আশ-শীরাযী, *আল-মাযহাবুল ফিকহুল ইমাম আশ-শাফিঈ*, (বৈরূত: দারুল-মা'রিফাহ্, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

هُوَ فعل الفاحشة في قبل أو دبر

'সামনে কিংবা পেছনের দিকে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলা হয়।'[৪৩৭]

আহমাদ আদ-দরদীর বলেন,

الزِّنَا: بِأَنَّهُ إِيْلَاجُ فَرْجٍ فِيْ فَرْجٍ هِيَ محرم قبل أو دبر بلا شبهة

'সন্দেহ ব্যতিরেকে একটি লিঙ্গকে অপর লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানোকে যিনা বলে, যা হারাম, সামনের দিকে তোক বা পিছনের দিকে হোক।' [৪৩৮]

আল-মাওয়ারদী বলেন,

الزنا هو تغيب البالغ العَاقِلُ حَشَفَةَ ذَكَرِه فِيْ أَحَدِ فَرْجَيْنِ مِنْ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ لَا عِصَمَةِ بَيْنَهُمَا وَ لَا شُبْهَةٍ

"যিনা হলো সামনের কি পিছনের লজ্জাস্থানের যে কোন একটির মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেকসম্পন লিঙ্গের মাথাকে অদশ্য করা, যাতে উভয়ের মধ্যখানে সংরক্ষণ ও সন্দেহের অবকাশ নেই।'[৪৩৯]

'আব্দুর রহমান আল-জাযায়েরী বলেন,

الزِّنَا: هُوَ عِبَارَةٌ عِن وَطيِ مُكلَّفٍ فِيْ فَرْجِ امْرَأَةٍ مُشْتَهَاةٍ، خَالٍ عَنِ المِلْكِ وَشُبْهَتِه.

'প্রাপ্তবয়স্ক লোকের যৌনশক্তিসম্পন্ন মহিলার স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে সহবাস করাকে যিনা বলে, যা প্রকৃত ও রূপক মালিকানা থেকে মুক্ত।[৪৪০]

ব্যভিচারের ভয়াবহতা ও পরিণাম

১.নিকৃষ্ট অশ্লীলতা

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যভিচার কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকে অশ্লীল কাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন এবং একে অতি গর্হিত পন্থা বলে উল্লেখ করে বলেন,

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[৪৪১]

এ আয়াতাংশে 'যিনার কাছেও যেয়ো না'-এর ব্যাখ্যা হলো যিনার প্রতি আকৃষ্ট হয় এমন কার্যাবলী এবং যিনা সহজ ও সম্ভব করে যে কার্যাবলী তা তোমরা নিজেও করো না এবং সমাজেও হতে দিয়ো না।[৪৪২]

যারা সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"[৪৪৩]

২. ব্যভিচারের ন্যায় সমকামিতাও নিষিদ্ধ অশ্লীল কর্ম

---

৪৩৭. মানসূর ইন ইউনুস আল-বুহুতী, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব, ১৪০৩ হি.), পৃ. ৮৯; শারফুদ্দীন মূসা আল-হিজাভী, *আত্-তাশরীউল জানাই*, ২য় খণ্ড, ৩৪৯।

৪৩৮. আহমাদ আদ্-দাদীর, *শারহুল আযহার*, (মিসর: "ঈসা বাবী আল-হালাভী, তা, বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬।

৪৩৯. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস-সুলতানিয়্যাহ*, (মিসর: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩১২ হি.), পৃ. ২২৩

৪৪০. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪; *কিতাবুল ফিকহ 'আলা মাযাহিবিল 'আরাবাআ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৩।

৪৪১. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

৪৪২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুর'আন, ৫ম খণ্ড (দিল্লী: ই'তিকাদ পাবলিকেশন হাউজ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৬৩।

৪৪৩. আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪ : ১৯

যিনা বা ব্যভিচারের ন্যায় সমকামিতাও নিষিদ্ধ অশ্লীল কর্ম, তা কবীরা গুনাহ্, এর জন্য তা'যীরী তথা রাষ্ট্রীয় দণ্ডবিধি রয়েছে। সমকামিতা চারিত্রিক দুষ্টতা অপমান ও বিপদের সম্মুখীন করে। আর যারা এ ধরনের দোষে দুষ্ট, তারা অসৎচরিত্রের হয়ে থাকে; অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে। তারা ভাল-মন্দে পার্থক্য করতে পারে না, দুর্বলচিত্ত হয়ে থাকে। তাদের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব থাকে না, আর এমন মান-মানসিকতাও থাকে না, যাতে একে প্রতিরোধ করতে পারে।[৪৪৪]

৩. শিরক ও নরহত্যার মত জঘন্য পাপ

আল্লাহ্ তাআলা যিনা-ব্যভিচারের অনিষ্টকারীতার কথা উল্লেখ করার জন্য শিরক, নরহত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের অত্যন্ত জঘন্য পাপ কর্ম রূপে চিহ্নিত করে বলেন,

وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

-আল্লাহর নেক বান্দা তারাও, যারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এসব কাজ করে, সে শাস্তি ভোগ করবে।'[৪৪৫]

উক্ত আয়াতে আল্লাহর সাথে শরীক, অবৈধ হত্যা ও যিনাকে একই পর্যায়ের জঘন্য গর্হিত কাজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহমানের বান্দারা এ কাজগুলোর মধ্যে কোন একটিও করতে পারে না। করলে তাঁর অনুগত বান্দারূপে গণ্যই হতে পারে না।[৪৪৬]

৪. ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী

যারা নিজ অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে দিয়ে ব্যভিচারে বাধ্য করে অর্থ উপার্জন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪৪৭]

৫. দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের কারণ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসেও যিনা-ব্যভিচারের কঠিন ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চরিত হয়েছে। আমর ইবন আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الزِّنا، إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ،

যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, সে জাতি দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনে পতিত হবে।

৬. ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ

যিনা ও এর পাপিষ্ঠ প্রভাবের ক্ষতি অগণিত, এতে চারিত্রিক, ধর্মীয়, শারীরিক, সামাজিক, পারিবারিক সর্বোপরি পাপকাজে জড়িয়ে পাপিষ্ঠ হওয়ার ক্ষতি রয়েছে। এছাড়া রয়েছে আত্মিক ক্ষতি, পরকালে ও দুনিয়াতে কঠোর শাস্তি

---

৪৪৪. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮; সাইয়্যেদ সাবিক, ফিকহুস্ সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৪।

৪৪৫. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৮

৪৪৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মাআরিফুল কুর'আন*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫।

৪৪৭. আল-কুরআন, সূরা নূর, ২৪ : ৩৩

এবং ঈমান অন্তঃকরণ থেকে হারিয়ে যাওয়ার অনিষ্টতা। যেমন মানুষকে দিশেহারা করা হয়। সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে ইসলামি মিল্লাহ্ ছাড়া অন্য ধর্মে ধর্মান্তরের পাপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ

"ব্যভিচারী ব্যভিচার করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না।"[৪৪৮]

ব্যভিচার প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

ইসলামি শরিআতের বিধানে যিনা-ব্যভিচার একটি গুরুতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। এ অশ্লীল অপকর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

"তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাবে না। নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৪৪৯]

সামাজিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলাম অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে। ইসলামের এই বিধান যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে অবশ্যই সমাজ থেকে ব্যভিচারের মত নিকৃষ্ট অপরাধ উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্ন হবে। অপরাধ হিসেবে ব্যভিচারের দুটি স্তর রয়েছে,

১. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার

২.অবিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার

ব্যভিচারের ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এর কঠিন শাস্তি বিধান করেছে ইসলাম। এ অপরাধটি যেমন জঘন্য, শাস্তিও ঠিক তেমন কঠোর। ব্যভিচারী নারী-পুরুষের একশটি বেত্রাঘাত ও অবস্থাভেদে পাথর মেরে প্রাণনাশের শাস্তির বিধান করেছে ইসলামি শরী'আত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, পাপের উৎসমূল চিররুদ্ধ করে দেওয়া। ব্যভিচারী যদি অবিবাহিত আযাদ ব্যক্তি হয়, তাহলে তার শাস্তি বিধান সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর দীনের (আদেশ কার্যকর করার) ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে –যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ব্যভিচারী পুরুষ কোন ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা কোন মুশরিক নারী ব্যতীত অন্য কোনো সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করবে না, (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী মহিলাকে কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা কোন মুশরিক পুরুষ ব্যতীত কোন সৎ লোক বিয়ে করবে না। মুমিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৪৫০]

এখানে উল্লেখ্য যে, অত্র আয়াতে অবিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। অন্যথায় বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার লিপ্ত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,

---

৪৪৮. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ;* প্রাগুক্ত, হাদিস নং ১৪৭৩১;

৪৪৯. আল-কুরআন, সূরা ইসরা (১৭) : ৩২

৪৫০. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ২-৩

«خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا،الثيب بالثيب و الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثيب جَلْدُ مِائَةٍ ثم رجم بالحجارة والبكر جَلْدُ مِائَةٍ ثم نَفْيُ سَنَةٍ»،

"আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ্ নারীদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিবাহিত নারী পুরুষ যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও পাথর দ্বারা রজম। আর যুবক-যুবতী (অবিবাহিত) যিনা করলে তাদের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসন।"[৪৫১]

অর্থাৎ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া গেছে। উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ

'বিবাহিতের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও রজম।'[৪৫২]

অপর বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনায়স আল-আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا

'যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে রজম কর।'৪৫৩

মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।

এ সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ: وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُلْ»، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ،

"আবূ হুরায়রা ও যাইদ ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: এক বেদুইন রাসূল্লাল্লাহ (স.)-এর নিকট এসে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে আপনাকে বলছি যে, আপনি আল্লাহর তাআলার কিতাব মোতাবেক ফয়সালা করবেন। আর অধিকতর বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ বলল: আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক বিচার করুন হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ঘটনাটি বলার অনুমিত দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। সে বলল: আমাদের ছেলে এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল। সে তার স্ত্রী সাথে যিনা করেছে। আর আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে আমার ছেলেকে রজম করা হবে। আমি তাকে এর বিনিময়ে একশত বকরী ও একটি বাঁদী দিয়েছি। আর আমি আলেমদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তারা আমাকে জানালেন যে, তার জন্য একশত বেত্রাঘাত ও একবছর নির্বাসণ, আর এ মহিলার

---

৪৫১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫. পৃ. ৫৯, হাদিস নং-৩২০০; ইমাম তিরমিযী, *আস সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.৫. পৃ. ৩৩৮, হাদিস নং-১৩৫৪; ইবন হিব্বান মুহাম্মদ আল-বুস্তী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ.১৮, পৃ.৩৫৪, হাদিস নং-৪৫০৪

৪৫২. মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত হাদিস নং ৩১৯৯; ইবন মাজাহ, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২৫৪০; আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং ২১৬১৪; *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদিস নং ২৫৫৮ ।.

৪৫৩. সহীহুল বুখারী, বাবু আল-ওয়াকালাতি ফিল-হুদুদি, হাদিস নং ২১৪৭, ২৫২৩, ৬১৪, ৬৩৩৭, ৬৩৫৩, ৬৭১৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩২১০; সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ৩৮৫৫; জামিউত-তিরমিযী, হাদিস নং ১৩৫৩; সুনানুন-নাসাঈ, হাদিস নং ৫৩১৫, ৫৩১৬,

জন্য রজম নির্ধারিত শাস্তি। মহানবী স. বলেন: আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। বকরী ও বাঁদী ফেরত দেয়া হলো। তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে এবং একবছর নিবার্সন দেয়া হবে। হে উনাইছ! তুমি সকাল বেলা এর স্ত্রীর নিকট যাবে যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করবে। বর্ণনাকারী বলেন: অতপর সে (উনাইছ) সকালে তার নিকট গেল এবং স্বীকারোক্তি করল। আর রাসূলুল্লাহ (স.) এর নির্দেশ মত তাকে রজম করা হলো।"[৪৫৪]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অবিবাহিত অপরাধীর শাস্তি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত অপরাধীর শাস্তি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.) এর বিচারিক দৃষ্টান্ত ও বিদ্যমান রয়েছে।

অবশ্য এই শাস্তি প্রয়োগের জন্য, উপযুক্ত সাক্ষী অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তিমূলক স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাওয়া শর্ত। সাক্ষী কমপক্ষে চারজন হতে হবে। স্পষ্টভাবে ঘটনার বিবরণ দিতে হবে। কোথায় কখন কার সাথে কিভাবে ব্যভিচার হতে দেখেছে তা পরিষ্কার করে বলতে হবে। সুরমাদানীর কাঠি সুরমাদানীর মধ্যে যেভাবে প্রবেশ করে সেভাবে প্রবিষ্ট করতে দেখেছি এই জাতীয় স্পষ্ট বক্তব্য দিতে হবে সকল সাক্ষীকে। অনুরূপ স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রেও চারবার স্পষ্টভাষায় অপরাধের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিতে হবে। বিচারক এ ক্ষেত্রে বরং এভাবে টলাতে চেষ্টা করবেন, তুমি হয়তো ব্যভিচার করনি; চুমু খেয়েছ, ধরেছ ইত্যাদি। তাতেও যদি না দমে বরং নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করে, তবেই তাকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।[৪৫৫]

অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এজন্যই যিনা-ব্যভিচারের কেঠার শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজমের ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী ও হত্যার সাথেসাথেই যিনা ব্যভিচারের উল্লেখ করেছেন। শাস্তি প্রয়োগের সময় করুণা প্রদর্শন না করতে ও মুমিনদেরকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। যাতে এরূপ পাপে লিপ্ত হওয়া থেকেও হুমকি সৃষ্টি করে। যার ফলে 'ইয্যত ও সম্মান হিফাযত হবে, ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা থেকে নিজেকে হিফাযত করতে পারবে। তেমনিভাবে ব্যভিচারী পুরুষ থেকেও বাঁচতে পারা যাবে। এরপর পাপাচারে লিপ্ত হলে ঈমান শূন্য হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে ব্যভিচারী মূর্তিপূজকের মত পাপী আর আল্লাহ তাআলা এরূপ কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা বান্দার প্রতি রহমতস্বরূপ করেছেন, যাতে মানবকূলের অস্তিত্ব সংরক্ষিত হয়।[৪৫৬]

ইসলামি আইনে দুটি মূলনীতি লক্ষ্য করা যায়, অপরাধ নিবারণ ও সমাজকে রক্ষা করা। ইসলাম অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাবনাকে প্রথমেই বন্ধ করে দেয়। এই উদ্দেশ্যে মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যথোচিতভাবে পূরণ করার পাশপাশি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদেরকে সচেতন করে তোলে। এরপরও কেউ অপরাধে লিপ্ত হয়ে সমাজের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে চাইলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাইতো আল্লাহ্ তাআলা ব্যভিচারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান অবতীর্ণ করে মানুষের অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত ব্যভিচার একটি বড় অপরাধ যা নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করে এবং জীবন, সম্পদ ও স্বাস্থ্যের বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করে। ব্যভিচার সমাজে আরও নানা অপরাধ সৃষ্টি করে। ফলে মানবতা ও মানবিকতা ধ্বংসের কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

---

৪৫৪. ইমাম মুসলিম, *আস সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯,পৃ.৭১, হাদিস নং ৩২১০; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ.৫.পৃ.৩৩০,হাদিস নং ১৩৪৯

৪৫৫. আল-হিদায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৪৫৬. 'আফীফ 'আব্দুল ফাত্তাহ্ তাব্বারা, *আল-খাতাইয়া ফি নজরল ইসলাম*, পৃ. ৭৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ধর্ষণ

বর্তমান মানব সমাজে সবচাইতে জঘন্যতম অবক্ষয় হচ্ছে ধর্ষণ। দৈনিক পত্রিকার পাতা উল্টালে দুই-একটি ধর্ষণের খবর পাওয়া যাবে না এমন দিনের নজির নেই। কোলের শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা পর্যন্ত কোন নারীর ইজ্জত ও জীবন আজ আর নিরাপদ নয়। পাঁচ বৎসরের শিশুও এখন ধর্ষিতা হয়। নিজ গৃহ, শিক্ষাঙ্গন, থানা হাজত, আদালত প্রাঙ্গণ কোথাও আজ নারীদের নিরাপত্তা নেই। এ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী জানোয়ারেরা শত নারী ধর্ষণ করে উদযাপন করে ধর্ষণের সেঞ্চুরী।

ধর্ষণের সংজ্ঞা

ধর্ষণ একটি ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম যৌনাচার। এটি জঘন্যতম সামাজিক অপরাধ। এটা চরম মানবতাবিরোধী ও নীতিগর্হিত কাজ যা সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থাকে ভীষণভাবে কলুষিত করে। ধর্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ Rape। শাব্দিক অর্থে Sexual intercourse with a woman without her consent.[৪৫৭] বাংলা ভাষায় বলাৎকার,[৪৫৮] সতীত্ব নাশ ইত্যাদি ধর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, "সাধারণত কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাহার সম্মতি ব্যতীত বা ভয় দেখাইয়া সম্মতি আদায় করিয়া বা অন্যায়ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া যে তার স্ত্রী বা চৌদ্দ বছরের কম বয়স্কা বালিকাকে তাহার সম্মতি লইয়া যৌন সহবাস করিলে উহা ধর্ষণ নামে পরিচিত হয়।"[৪৫৯]

ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "কোন পুরুষ বা নারী বল প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে কোন নারী বা পুরুষের সাথে সঙ্গম করে তা যেনা হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের যেনাকে বল প্রয়োগ যেনা বা ধর্ষণ বলা হয়।[৪৬০]

আমরা লক্ষ্য করছি এখানে শুধু নারী ধর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নারী কর্তৃক কোন পুরুষও ক্ষেত্রবিশেষ ধর্ষিত হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ষণের সংজ্ঞায় এ কথাটিও সুস্পষ্ট হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "কোন পুরুষ বা নারী বল প্রয়োগ করে পর্যায়ক্রমে কোন নারী বা পুরুষের সাথে সঙ্গম করে তা যেনা হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের যেনাকে বল প্রয়োগ যেনা বা ধর্ষণ বলা হয়। [৪৬১]

প্রচলিত আইনে ধর্ষণের শাস্তি

বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী নারী ধর্ষণকারী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে (যার মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে) দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডের দণ্ডনীয় হবে যদি না ধর্ষিতা নারীটি তার নিজ স্ত্রী হয়

---

৪৫৭. Ashu Tosh Dev, *Students favorite Dictionary*, (English to Bengali and English) (edition June 1990), P. 1059

৪৫৮. Bangla Academy English-Bangla Dictionary, Edited by Zillur Rahman Siddiqi,(Dhaka, Bangla Academy, June 2015), P. 590

৪৫৯. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *দণ্ডবিধি*, (ঢাকা : আলীগড় লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪),ধারা ৩৭৫,পৃ.৫৫৩

৪৬০. ইসলামি আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৫),খ. ১, পৃ. ৩৩৬

৪৬১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*),প্রাগুক্ত,পৃ. ৫০৪

এবং সে বার বছরের কম বয়স্কা না হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। [৪৬২]

ইসলামি আইনে ধর্ষণের শাস্তি

ইসলামি আইনে ধর্ষণকারী যেনার শাস্তি ভোগ করবে এবং যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে শাস্তিযোগ্য হবে না, যদি এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়। আদালতের সুবিবেচনা অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে নির্দোষী পক্ষ ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।[৪৬৩] পবিত্র কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় নারীদেরকে যেনায় বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং কোন নারীকে এরূপ কাজে বাধ্য করা হলে উক্ত নারীকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তোমাদের দাসীরা নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪৬৪]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ، فَانْطَلَقَ، وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَانْطَلَقُوا، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ هُوَ هَذَا، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، وَقَالَ: لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ.

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক মহিলা অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বের হয়। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাকে ধরে ফেলে এবং জোরপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। মহিলার চিৎকারে চারিদিক থেকে লোকজন জড়ো হয় এবং ধর্ষণকারীকে ধরে ফেলে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বললেন তুমি চলে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। বিস্তারিত হাদিসটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে,[৪৬৫]

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ: «أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الخُمُسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ، الحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا»

একটি ক্রীতদাস একটি ক্রীতদাসীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করলে হযরত উমর (রা.) ক্রীতদাসের উপর হদ্দ জারি করেন কিন্তু ক্রীতদাসীকে শাস্তি দেননি। কারণ, তাতে বলাৎকার করা হয়েছিল। সহিহ বুখারী শরীফে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।[৪৬৬]

বাংলাদেশে ধর্ষণের চিত্র

---

৪৬২. বাসুদেব গাঙ্গুলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৪ ধারা ৪৭৩

৪৬৩. ইসলামি আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং) খ. ১, পৃ. ৩৩৭।

৪৬৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর, ২৪:৩৩।

৪৬৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১০৮, হাদিস নং-১৪৫৪।

৪৬৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ২১, হাদিস নং-৬৯৪৯

বিভিন্ন মামলা ও দৈনিকে প্রকাশিত খবরের উপর ভিত্তি করে দৈনিক ইনকিলাব একটি পরিসংখ্যান তৈরি করে যা ১৯৯৯ সালের ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত হয়। এতে দেখানো হয়েছে বাংলাদেশে ৫ বৎসরে মোট ৩৬৩৫টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। গড়ে প্রতিদিন ৫ জন : ১ জন শিশু।[৪৬৭] ঢাকা মহানগরী থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে অবস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে ১৭৭টি ধর্ষণের ঘটনা। এর মধ্যে এক জসিম উদ্দীন মানিক একাই ধর্ষণ করেছে ১০১টি মেয়েকে এবং শেষ ধর্ষণের পর শ্লোগান দিয়েছে "এ্যাকশন এ্যাকশন, ডাইরেক্ট ধর্ষণ"। ধর্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্থানে প্রকাশ্যেই ধর্ষণ করেছে। লাইব্রেরী, নাটকের সাজঘর, মিলনায়তন প্রাঙ্গণ, শহীদ মিনার চত্বর, প্রতিটি হলে, সুইমিংপুলেও ধর্ষণ করেছে। ধর্ষণকারীরা এত ধর্ষণ করেও বিশেষ পরিচয়ে নিজেদেরকে এর শাস্তির হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই শেষ নয় এদেশে পুলিশের নিরাপত্তা হেফাজতে পুলিশ কর্তৃক গ্রুপ ধর্ষণের শিকার হয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ হারায় সীমা চৌধুরী। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে ভাসমান পতিতা হিসেবে দাঁড় করাতে কোশেশ করে। হতভাগিনী মুসলমান হলেও পুলিশ তড়িঘড়ি করে তার লাশ পুড়িয়ে ফেলে নিজেদের অপরাধ ঢাকতে চেষ্টা করে। এ দেশে গৃহবধু চামেলীকে তার স্বামীর সামনে ধর্ষণ করে নরপশুরা। স্বামী যাতে কোন প্রতিবাদ করতে না পারে, সেজন্য তার হাত-পা ঘরের খুটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। ধর্ষণের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বিভিন্ন পত্রিকায় প্রাপ্ত ধর্ষণের খবরের ওপর ভিত্তি করে দেখেছে ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের ঘটনা ২৪০টি, ১৯৯৬ তে ২৬২টি, ১৯৯৭ সালে ৭৫৩টি, ১৯৯৮ সালে ১৪২৫টি ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বৎসর বয়সের ধর্ষিত হয়েছে প্রায় ১০০০ জন এবং ১৯৯৯ পূর্ব পাঁচ বছরে ১৯ থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত ধর্ষিত হয়েছে ৪০০ জন।[৪৬৮] এসব ধর্ষণের মধ্যে বেশির ভাগ ঘটে শহরে। অথচ শহরে ভদ্রলোকের বাস। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত তিন বছরে রাজধানীতে ৪২৫টি, রাজশাহীতে ৩১৭টি, চট্টগ্রামে ২০৬টি, খুলনায় ২২১টি, বরিশালে ১০৭টি, সিলেটে ৭০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

১৯৯৯ সালে ২জন বি.এস.এফ. সদস্য বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে ধর্ষণের চেষ্টা করে। একই সালে আমাদের আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে ধর্ষিতা হয়েছে ৯ জন। একই বছর দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে ২৭৮টি। ১৯৯৮ সালে আইন-শৃংখলা বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৩টি। দলবদ্ধভাবে হয়েছে ৬৩৪টি। ১৯৯৭ সালে আইন-শৃংখলা বাহিনীর হাতে ৬টি। দলবদ্ধভাবে ২৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারীদের হাতে ২১টি। দলবদ্ধভাবে ১০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। দলবদ্ধভাবে যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে তাতে ছাত্র, বেকার যুবকদের সংখ্যা বেশি। অনেক সময় বয়স্ক পুরুষ কর্তৃকও ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ওয়ার্ড কমিশনাররাও ধর্ষণ করে।[৪৬৯]

কারা হচ্ছে ধর্ষণের শিকার?

১৯৯৮ সালে ধর্ষিতাদের মধ্যে ১৫০ জন ছিল ছাত্রী, গৃহবধু ৪৩ জন, গার্মেন্টস কর্মী ১৮ জন, স্বামী পরিত্যাক্তা ১৭ জন, বিধবা ১৮ জন, শ্রমিক ৪৭ জন, গৃহ পরিচারিকা ১২ জন, কর্মজীবী ৭ জন, আদিবাসী ৮১৩ জনের পরিচয় জানা যায়নি। একজন শিশুকে সবাই স্নেহ করে, কিন্তু নিষ্পাপ শিশুটিও ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯-এর জুন পর্যন্ত ৬ বছর বয়স পর্যন্ত ১৪০ জন শিশু ধর্ষিতা হয়েছে। ১৯৯৯-

---

৪৬৭. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা : বুধবার, ১৩ অক্টোবর, ১৯৯৯।

৪৬৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭; দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

৪৬৯. দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

এর অক্টোবর পর্যন্ত তৎপূর্ব পাঁচ বৎসরে ৭ থেকে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ৫৩৮ জন ধর্ষিত হয়েছে, যার হার হচ্ছে ৫১.৪১%।

১৯৯৯-এর জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যাও ধর্ষিতা হয়েছে। মৌলভী বাজার, নোয়াখালী, যশোর, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় মোট ৪ জন ইউপি সদস্যা ধর্ষিতা হয়েছে।[৪৭০]

ধর্ষণ শেষে হত্যা

অনেক সময় দেখা গেছে বিকৃত রুচিধারী ধর্ষণকারীরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা কখনও কখনও ধর্ষিতাকে মেরে ফেলেছে। কখনও বা খালে-বিলে ফেলে দিয়েছে কিংবা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। কখনও বা গলা, হাত-পা, কেটে বনে-বাদাড়ে ফেলে দিচ্ছে হতভাগিণীর লাশ। আবার দলবদ্ধভাবে বা পালাক্রমে ধর্ষণের কারণেও অনেকের মৃত্যু ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে। ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের ঘটনায় প্রায় ৬৭ জন, ১৯৯৮ সালে ১০৫ জন, ১৯৯৭ সালে ৩৮ জন, ১৯৯৬ সালে ৯ জন, ১৯৯৫ সালে ১০ জন নিহত হয়েছে। এদের কেউ কেউ ধর্ষণের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।[৪৭১]

বর্তমানে বাবা-মায়ের সামনে মেয়ে, স্বামীর সামনে স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের সামনে মা ধর্ষিতা হচ্ছে। এর চাইতে বর্বরতা আর কি হতে পারে? আর একটি ঘটনা যা আদিম বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। নিজ কন্যাকে কয়েক দফা ধর্ষণ করেছে এক পাষণ্ড পিতা। ষাটোর্ধ্ব এই পিতা কুষ্টিয়া শহরতলীর ছেউরিয়াস্থ নিজ বাড়িতে আটকে রেখে রাতের পর রাত দশম শ্রেণী পড়ুয়া ষোড়শী কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। এক পর্যায়ে পাষণ্ড পিতার হাত থেকে পালিয়ে এসে চাচার সহায়তায় মেয়েটি তার এই নির্মম কাহিনীর কথা কুষ্টিয়া থানায় এসে বর্ণনা করেছে। পুলিশ অবশ্য ওই ইতরকে গ্রেফতার এবং জেল-হাজতে পুরতে সক্ষম হয়েছে।[৪৭২]

উপরের আলোচনায় সমাজের বিশেষ করে এ দেশের ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তা আদৌ সঠিক নয়। এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। কারণ ধর্ষণের অনেক ঘটনা থানায় বা পত্রিকায় আসে না। অনেকেই লজ্জা-শরমের কারণে এ ঘটনা চেপে রাখেন। কেউ কেউ সাহসী হয়ে অথবা ঘটনাপ্রবাহের কারণে থানা বা পত্রিকার সাংবাদিকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কাজেই থানা ও পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে কেবলমাত্র গোটা সমাজের একটা খণ্ডচিত্র মাত্র ফুটে ওঠে। থানায় গিয়ে ধর্ষণ প্রমাণ করা অনেক কঠিন। সেখানে ধর্ষিতাকে আরও বেশি অপমানিত হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত ধর্ষণকারী আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কোন শাস্তি ছাড়াই বেরিয়ে যায়। উপরন্তু ধর্ষণকারীরা সাধারণত প্রভাবশালী হয়ে থাকে। আর সে কারণেই সমাজের অপেক্ষাকৃত অসহায় শ্রেণীর মানুষ ধর্ষণের বিচার চেয়ে জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যান।

তাছাড়া একজন ধর্ষিতা প্রথমেই হোচট খান ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার ধর্ষণ প্রমাণের জন্য। ডাক্তার বিভিন্ন অজুহাতে ভিকটিমের মেডিক্যাল পরীক্ষায় বিলম্ব করেন। ফলে আলামত বিনষ্ট হয়। আবার যদিও বা ধর্ষিতা হতভাগিণীকে পরীক্ষা করা হয় তখন বাধে বিপত্তি। তাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা হয় এবং শরীরের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করা হয়। অনেকে মনে করেন এটাও এক প্রকার ধর্ষণ। তাই আর এ ধরনের নাজেহাল হওয়ার চেয়ে অপমানের গ্লানি কাঁধে নিয়ে সবকিছু চেপে গিয়ে মুখ বুজে বসে থাকেন। ফলে অসংখ্য ধর্ষণের ঘটনা অপ্রকাশিতই থেকে যায়।

---

৪৭০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭

৪৭১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন,প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮; দৈনিক ইনকিলাব, প্রাগুক্ত।

৪৭২. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা: ১৮ই জানুয়ারি, ২০০১ ইং।

ধর্ষণ বৃদ্ধির কারণ

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে যাচ্ছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে সকল কারণে ধর্ষণকারীদের অভয়ারণ্য তৈরি হয়েছে সেগুলো অবশ্যই খতিয়ে দেখা আবশ্যক। গভীরভাবে বিচার করলে এ দেশে ধর্ষণ বৃদ্ধির কিছু কারণ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তেমন কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

১.নারীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা

পবিত্র কুরআনে নারীদের ভদ্র ও মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে তাগিদ দেবার পাশাপাশি অজ্ঞযুগের মতো সাজ-সজ্জা করে নির্লজ্জের মতো রাস্তায় চলাফেরা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"হে নবি পত্নীগণ ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পুরুষদের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না ফলে সেই ব্যক্তি কু-বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতা যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।[৪৭৩]

কিন্তু আজ মেয়েরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় এসে কুরআনের হুকুমের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বেহায়ার মতো চলাফেরা শুরু করেছে। আপত্তিকর পোশাক পরে হরেক রকমের প্রসাধনী মেখে চরম সাজসজ্জা করে রাস্তা-ঘাটে, বাইরে, হাটে-বাজারে, মার্কেটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবকদের মাঝে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেড়াচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এভাবে তারা পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। ফলে তারা পুরুষের কাছে নিজেদেরকে সহজলভ্য করে তুলছে। আর তাদের এহেন সৌন্দর্য প্রদর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ দেশের একশ্রেণীর টগবগে যৌবনের যুবকেরা উন্মাদের ন্যায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের কাম চরিতার্থ করছে।[৪৭৪] যেসব মেয়ে ইসলামের নির্ধারিত পর্দার সীমা রক্ষা করে প্রয়োজনে বাইরে চলাফেরা করে তারা অবশ্যই পুরুষ দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় না। নারীদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, ধর্ষণের মতো জঘন্য সামাজিক অপরাধ।

২. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ

প্রগতির নামে দিন দিন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে মোক্ষম ভূমিকা পালন করে বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশে কতিপয় এনজিও ও তথাকথিত কিছু নারীসংগঠন। তারা সে সকল মুসলিম প্রধান দেশের মুসলিম ঘরের যুবতী, অবিবাহিতা মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে এনে পুরুষের কাজে লাগাচ্ছে এবং পুরুষের সাথে একসঙ্গে একই মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছে। দারিদ্র্য আর বেকার সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের কোমলমতি মেয়েরা নিজেদেরকে এসব কাজে জড়িয়ে ফেলছে। তারা যা কিছু করছে নারীদের জন্য তাতে নারী আরও ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পুরুষদের কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমানসংখ্যক কোটা বাড়িয়ে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসা, পুরুষের সাথে

---

৪৭৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহ্যাব (৩৩) : ৩২-৩৩।

৪৭৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪ খৃ.), পৃ. ৫০৯

ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করে বাসে-ট্রেনে চলাফেরা করা। যুবক-যুবতী একসাথে সুইমিং কষ্টিউম পরে সাঁতার কাটা, ব্যায়াম করা, গেঞ্জী হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলা, দেহের বিশেষ অংশ দুলিয়ে দুলিয়ে ভলিবল, ফুটবল খেলা এসবই নারীদেরকে পুরুষের কাছে সহজলভ্য করে দিচ্ছে। আর সমাজের একশ্রেণীর বিকৃত রুচিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত প্রগতিবাদী কিছু অভিভাবক এগুলোকে নারীর স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন বলে জাহির করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বস্তুত নারী স্বাধীনতা নামে নারী-পুরুষের এহেন অবাধ মেলামেশার সুযোগ দানের মাধ্যমে নারীর সম্ভ্রমহানির পথকেই সুগম করে দেয়া হচ্ছে।[৪৭৫]

৩. সহশিক্ষা

নারীসমাজের জন্য আর এক মহা অভিশাপ হচ্ছে সহশিক্ষা। নারী পুরুষের যৌবনের ভরাবসন্ত অতিবাহিত হয় তাদের শিক্ষাজীবনে। সহশিক্ষার সুযোগে বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণী অবাধে মেলামেশা ও অবৈধ প্রেম বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছে। এদের এসব প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপ নিচ্ছে দৈহিক সম্পর্কে। তরুণ-তরুণীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হাজারো ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আর যেক্ষেত্রে তরুণেরা তরুণীদের সম্মতি আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে সেক্ষেত্রে বেছে নিচ্ছে ধর্ষণের পথ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্ষণ বৃদ্ধি সহশিক্ষারই অনিবার্য প্রতিফল। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতিকে স্বাধীনতা, পর্দাহীনতা ও সহশিক্ষার নামে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার চরম সীমানায় পৌঁছে দিয়েছে। এক রিপোর্টে দেখা যায় বর্তমানে আমেরিকার একটি শহরের মাধ্যমিক স্কুলে শতকরা ৪৮জন ছাত্রী গর্ভবতী। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ১ লক্ষ ১০ হাজার মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে যাদের বয়স বিশ বছরের নিচে। এরা প্রাথমিক স্কুলেই যৌনচর্চা শুরু করে। এগারো ও বারো বৎসরের ৩১২ জন ছাত্রীর উপর এক জরিপ করে দেখা যায় তন্মধ্যে ২২৫ জন যৌন ক্রিয়ায় অভ্যস্থ।[৪৭৬]

আমেরিকার Oklahuma বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিদায় অনুষ্ঠানে অতি আনন্দের এক পর্যায়ে সকলে উলঙ্গ হয়ে রাতভর নাচের অনুষ্ঠান করে। সহশিক্ষার কারণে আমেরিকার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শতকরা ৪৫ ভাগ মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে থাকে, সেখানে মেয়েদের জন্য পৃথক ১০৭ টি কলেজ এবং রাশিয়াতে ১১০ টি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৪৭৭]

আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্সের দেশে যদি সহশিক্ষার কুফল এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে থাকে সেখানে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান রক্ষণশীল দেশে আমরা আমাদের যুবসমাজকে কিভাবে এর কুফল থেকে রক্ষা করতে পারি?

৪. নগ্ন চলচ্চিত্র ও অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন

ধর্ষণের মত অনেক সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হলো নগ্ন দৃশ্য সম্বলিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও কুরুচিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রচার। এ দেশের সিনেমা হলগুলোতে হরহামেশা চলছে অশ্লীল চলচ্চিত্র। ছবিতে নায়ক-নায়িকাদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় অভিনয় ও নাচ-গান প্রদর্শিত হচ্ছে। এতে করে আমাদের যুবসমাজ ধর্ষণের কৌশল জানতে পারছে। বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির আশীর্বাদে ডিস এ্যান্টেনা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাশ্চাত্য নগ্ন সংস্কৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে। কম্পিউটারের সিডি ও হার্ডডিস্কের মাধ্যমে নীল ছবি দেখানো হচ্ছে যা যুবসমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। টিভি অনুষ্ঠানমালায় তরুণ-তরুণীদের একত্রে নাচের ঢলাঢলি, গানের কলাকলি, বিজ্ঞাপনে যৌন উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। দেশী-বিদেশী সুন্দরী নর্তকী আমদানি করে লাখ লাখ দর্শকের সামনে কাত হয়ে

---

৪৭৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১০

৪৭৬. সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া-সালামুল আলাম* (বৈরুত : দারুস সালাম, ১৯৯৩ইং), পৃ.২১

৪৭৭. আদ-দাওয়াহ পত্রিকা, ঢাকা : এপ্রিল ১৯৭৮।

চিত হয়ে যুবতী মেয়েদের দৈহিক কসরৎ প্রদর্শন করে তরুণদেরকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করা হচ্ছে। আর তখনই যৌবনের তাড়নায় উন্মাদ হয়ে ঐ সব তরুণ ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারীদের উপর।[৪৭৮] আর এর জলন্ত প্রমাণ থার্টি ফার্স্ট নাইটে 'বাঁধন' যখন গভীর রাতে যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য প্রদর্শন করতে আসে তখনই একই অনুষ্ঠানে আসা এ দেশের কয়েকজন তার বস্ত্রহরণ করে শত শত দর্শকের সামনে তাকে দিগম্বর করে এক কুৎসিত উৎসবে মেতে ওঠে। পরে অবশ্য বস্ত্রহরণকারীরা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। কিন্তু যদি এ দেশের বাঁধনেরা এহেন পাশ্চাত্য কৃষ্টি-কালচার পালন করতে এভাবে বাইরে বের হয়ে না আসত আর আমাদের যুবকদেরকে এভাবে উত্তেজিত না করত তবে হয়তো এহেন ঘৃণিত অপরাধটি নাও ঘটতে পারত। এসব অশ্লীল, নোংরা, যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে যুবক-তরুণেরা, যুবক-পুলিশেরা কেন আধবয়সী বৃদ্ধদেরও যৌনউত্তেজনা না দেখা দিয়ে পারে না। বিড়ালের সামনে ভাজা মাছ রেখে সারাদিন ঠেঙ্গালেই কি বিড়াল ভাজা মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে ঠেঙ্গানীর ভয়ে? আগুনের উপর ঘি রেখে সারাদিন যদি বলা হয়ে এই ঘি গলবিনা, তাহলে ঘি না গলে থাকবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে তার অনিবার্য পরিণতি ভোগ করতেই হবে। এটাই বাস্তবতা।

৫. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব

ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাবেই মূলত সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক নর-নারীর ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য একথা সুস্পষ্ট হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত । একমাত্র ইসলামি শিক্ষা পারে মানুষকে তার পাশবিকতা দূর করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। ইসলামি শিক্ষা তথা নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরে সবসময় সৃষ্টার ভয় নিহিত থাকে। তার পক্ষে সহজেই বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ ও পাপকাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। জাহেলী যুগে নারীর যে দুঃখ-দুর্দশার চিত্র আমাদের কাছে ভেসে ওঠে তার অবসান ঘটায় ইসলাম। যে বর্বর আরব জাতি একসময় নারীকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত তারাই পরবর্তীতে ইসলামের সুশিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ইজ্জত-আব্রুর একশত ভাগ রক্ষণাবেক্ষণে সচেষ্ট হয়। নারীকে তারা সমাজে একজন মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং কন্যা হিসেবে সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামি শিক্ষায় সুশিক্ষিত একজন যুবক সবসময় পরকালের ভয়ে ভীত থাকে। নারী ধর্ষণ তো দূরের কথা নারীর সম্ভ্রম রক্ষাকে যে তাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যদি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা যায় তাহলে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। নৈতিক শিক্ষার অভাবেও অসংখ্য সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়। বিভিন্ন দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত যৌন হয়রানির ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রক্ষকদের ভেতরে যদি নৈতিকতা না থাকে তবে কাদের কাছে আমরা নিরাপত্তা আশা করব। তাদের মধ্যে যদি নীতিবোধ থাকত তবে তাদের হাতে কোন নারীর সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হতো না। বরং তারা অপরাধীদের পাকড়াও এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনার জন্য সদা সচেষ্ট থাকত। নীতি-নৈতিকতার অভাবে আজ রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করছে।[৪৭৯]

৬. ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থা

ধর্ষণ বৃদ্ধির আর একটি বড় কারণ অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচার না হওয়া। অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা বিচারের আওতায় আসে না। কতিপয় দু'চারটি মামলা আদালতে উত্থাপিত হলেও তার প্রকৃত বিচার হয় না। আদালতে অপরাধ প্রমাণ করতে গিয়েও ধর্ষিতা নারী নানা বিড়ম্বনার শিকার হয়। তাই অনেকে নির্যাতিত

---

৪৭৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১১

৪৭৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৩

হয়েও আদালতের স্মরণাপন্ন না হয়ে লাঞ্ছনার গ্লানি নিয়ে চুপ করে বসে থাকেন। কেউবা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আবার কখনও যদি অপরাধের আলামত প্রমাণিতও হয় সেক্ষেত্রে আদালত ধর্ষিতা নারীর চেয়ে অপরাধীর পক্ষাবলম্বনে বেশি তৎপর থাকে এবং নানা কৌশলে অপরাধীকে মুক্তি দিয়ে দেয়। ফলে অপরাধীরা আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আবার নব উদ্যোমে অপরাধে মেতে ওঠে।

ধর্ষণরোধের উপায়

বিশ্বমানবতার মুক্তির অনন্য দিশারী মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের অপরাধ রোধ করা সম্ভব। একমাত্র তাঁর প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নারী সমাজের ইজ্জত-আব্রুর যথাযথ সংরক্ষণ এবং সমাজে নারীদের নিরাপদ ও সম্মানজনক অবস্থান সুনিশ্চিত হতে পারে। আজ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী মুক্তি, নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদির হাজারো স্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত নারী সংগঠন পৃথিবীর বুকে জন্ম লাভ করেছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিনিয়তই নারীর মুক্তির জন্য বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এর মাধ্যমেই কেবল নারীকে রাস্তায় নামানো এবং পুরুষের কাছে সস্তা পণ্যের মত সহজলভ্য করে তোলা হচ্ছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে তাদের অধিকার প্রকারান্তরে নষ্টই করা হচ্ছে। নারীর মর্যাদার প্রতি সচেতনতা সৃষ্টির হাজারও চেষ্টা করেও অধুনা বিশ্বের সভ্যসমাজের মানুষগুলোর বিবেকবোধ জাগ্রত করা সম্ভব হচ্ছে না। এর একমাত্র কারণ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহীত পন্থা এবং নারীর ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের জন্য তার প্রদর্শিত নীতিমালা থেকে আজ সবাই দূরে সরে গেছে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ তথা কুরআন-হাদীসের আলোকে সমাজের ধর্ষণ বন্ধে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ক. চলাফেরায় নারীদের মার্জিত হতে হবে

বাংলাদেশের নারীরা যতই খোলামেলাভাবে চলাফেরা বেশি করছে ততই ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগের দিনে আমাদের নারীরা পর্দাসহকারে সভ্য শালীন হয়ে গৃহে অবস্থান করত। বিনা প্রয়োজনে খুব একটা বাইরে বের হতো না। সে সময় এত ধর্ষণও হতো না। এখন নারীরা যতই পর্দাহীনভাবে রাস্তায় বের হচ্ছে সেজে-গুজে পর পুরুষের চোখের সামনে দিয়ে সদর্পে বিচরণ করছে ততই তারা পুরুষ কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। সুতরাং নারীকে ধর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ইসলামি বিধান পর্দা প্রথার পূর্ণ অনুশীলন এবং তা পুরোপুরি পালন করে মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে হবে। বেপর্দা চলাফেরা করা যাবে না। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে মূর্খতা যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করবে না।"[৪৮০]

নিতান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ

"হে নবি! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটি তাদের চেনার সহজ উপায়—ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।"[৪৮১]

---

৪৮০. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৩৩।

৪৮১. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৫৯।

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ

"ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপতি, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।"[৪৮২]

অপরিচিত লোকদের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে তা স্বাভাবিকভাবে বলতে হবে। এমনভাবে মিষ্টি মিষ্টি, রসালো কথা বলা যাবে না যাতে পরপুরুষের মনে যৌন কামনা জাগ্রত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"হে নবি পত্নীগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীগণের মতো নও, তোমরা যদি আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে চাও, তবে ইনিয়ে বিনিয়ে নরম করে কথা বলো না। কারণ এর দ্বারা যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে তোমাদের প্রতি খারাপ লালসা পোষণ করতে পারে। আর তোমরা উত্তম ও সহজ-সরল কথা বলবে।"[৪৮৩]

সুতরাং নারীকে কথাবার্তায়, চলাফেরায় অত্যন্ত সংযত ও শালীন হতে হবে। কারণ নারীর প্রকৃতিতে চুম্বকধর্মী অম্লের প্রভাব বিদ্যমান, আর পুরুষের প্রকৃতিতে খারের প্রভাব প্রবল। নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আগুনের পরশে যেমন মোম না গলে পারেনা তেমনি নারীর সংশ্রবে পুরুষ উদ্বেলিত না হয়ে পারে না। যে জাহেলী যুগের নারীরা সদা-সর্বদা পুরুষের তুষ্টির জন্য নানাভাবে নিজেদের উপস্থাপন করার পরও তারা পুরুষের হাতে বিভিন্নভাবে ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা হতো, ইসলাম এসে সেসব নারীকে পরিমার্জিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করার মাধ্যমে তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে একশভাগ সক্ষম হয়েছে। বর্বর আরব জাতি ইসলামের সংস্পর্শে আসার পর নারীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবার মানসিকতাও প্রদর্শন করেনি।[৪৮৪]

ইসলামি জীবনপদ্ধতি নারীকে যেমন পরিশিলিত করেছে, পুরুষকেও নারীমোহ থেকে ফিরিয়ে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করেছে। সুতরাং নারীর অশালীন পোশাক পরে বাইরে নগ্নভাবে চলাফেরা বন্ধ করতে হবে।

খ. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মতো আমাদের দেশেও ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। অফিসে, আড্ডায়, বিভিন্ন ক্লাবে, পার্টিতে, পার্কে, গাড়ি-ঘোড়ায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সকলক্ষেত্রে বর্তমানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তারই সাথে পাল্টা দিয়ে বাড়ছে ব্যভিচার ও ধর্ষণ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ প্রাণীকুলের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এ প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতিও মুক্ত নয়। বরং যৌবন শক্তি সম্পন্ন প্রতিটি পুরুষ ও

---

৪৮২. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩১

৪৮৩. আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব (৩৩) : ৩২

৪৮৪. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

নারীই তার যৌন ক্ষুধার তাড়নায় বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়ে থাকে। এমনকি যৌন উত্তেজনাবশে দুর্বল মুহূর্তে তারা ব্যভিচার ও ধর্ষণের ন্যায় জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাই পবিত্র ইসলাম শুধুমাত্র ব্যভিচার ও যৌন অনাচারকে নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তৎসঙ্গে এর যাবতীয় উপকরণ এবং উপলক্ষকেও হারাম করে দিয়েছে। যেহেতু নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নারী সৌন্দর্য যত্রতত্র প্রকাশ করা ব্যভিচারিতা ও ধর্ষণের পথকে সুগম করে দেয়, পুরুষকে নারীর মোহনীয় দৈহিক রূপ-লাবণ্যের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তার সাথে অবৈধ যৌনাচারে প্রলুব্ধ করে তাই ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ একজন পুরুষ আর একজন নারী একান্তে মিলিত হলে তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়ে ইবলিশ শয়তান, যার প্রধান উদ্দ্যেশ্য মানুষকে অপকর্মে লিপ্ত করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে জাহান্নামের পথে ঠেলে দেয়া। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ،

"একজন নারী ও পুরুষ যেন একান্তে কোন ঘরে না বসে, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হয় শয়তান।"[৪৮৫] নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধের লক্ষ্যে নারীদের জন্য পৃথক কর্মস্থল, আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নারীদের জন্য মহিলা ডাক্তার, পৃথক পরিবহণ ব্যবস্থাসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সমাজের অভিভাবক শ্রেণী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের যৌথ প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

গ. নারীদের জন্য পৃথকশিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা

প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শিক্ষার সকল স্তরে সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে। এজন্য চাহিদা মাফিক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদ্রাসা, মহিলা কলেজ ও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একসাথে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়সাধ্য বিধায় পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সব এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা শিফট চালু করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চূড়ান্তরূপ দেয়া সম্ভব না হবে ততদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামি পরিবেশ ও পর্দাপ্রথা চালু করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় বাজেটে নারীদের শিক্ষার জন্য পৃথকভাবে পুরুষের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর সময়েই নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ»

"জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাদিস পুরুষরা নিয়ে গেল। অন্য বর্ণনায় আপনার খিদমতে আমাদের তুলনায় পুরুষদের প্রাধান্য অধিক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলম থেকে কিছু শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। যেদিন আমরা সবাই আপনার খেদমতে হাজির হবো। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, অমুক দিন অমুক স্থানে তোমরা সমবেত হবে। তাঁরা সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (স.) সেখানে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্প্রদত্ত

৪৮৫. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৫, হাদিস নং ১১৭১

ইলম থেকে তাদেরকে কিছু শিক্ষাদান করলেন। এরপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান হবে জাহান্নাম তার জন্য হারাম হবে। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি দু'টি হয়? তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন দুই দুই।"[৪৮৬]

আমেরিকা, রাশিয়াসহ পশ্চিমা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে বর্তমানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলা হয়েছে। খোদ আমেরিকার মতো ফ্রি সেক্সের দেশে সহশিক্ষার ভয়াবহ কুফলের দিক বিবেচনা করে ১৭০টি মহিলা কলেজ এবং রাশিয়াতে ১২০টি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।[৪৮৭] সুতরাং সহশিক্ষা বন্ধ এবং নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ বন্ধ করা সম্ভব।

ঘ. অশ্লীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ করা

সিনেমা, টেলিভিশনে, পত্র-পত্রিকায়, বিজ্ঞাপণে নারী প্রদর্শন, যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠান, অশালীন পোশাক পরিহিত চিত্র বা ছায়াছবি প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যৌন উত্তেজনাকর গান, কবিতা, সাহিত্য, নভেল, নাটক বন্ধ করতে হবে। প্রাইমারী শিক্ষার পর থেকে জাতীয়, সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এবং মহিলা ও পুরুষদের এক অনুষ্ঠান বন্ধ করে পৃথকভাবে করার সুন্দর এবং নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও, টিভি ও সিনেমায় শিক্ষামূলক, জাতিগঠনমূলক এবং নির্মল আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংস্কৃতির নামে বিদেশ থেকে নর্তকী আমদানি করে আমাদের দেশের যুবকদের সঙ্গে একত্রে নাচানাচি, ঢলাঢলির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে হবে। দেশের সকল পতিতালয় বন্ধ করে দিয়ে পতিতাদের অবিলম্বে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা

প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যার্জন অত্যাবশ্যক। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، »

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর দীনী ইল্‌ম অর্জন করা ফরয।"[৪৮৮]

এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা হতে হবে। সুশিক্ষা যেমন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয় তেমনি অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। একমাত্র ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামি সমাজ-পরিবেশ, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থাই নারীর জন্য সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে পারে। ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক জানে যে, ব্যভিচার বা নারী ধর্ষণ তো দূরের কথা, গাইরে মাহরাম কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়াই পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিয়েছে। সেই সাথে প্রতিটি নারী-পুরুষের নিজ নিজ লজ্জাস্থানের যথাযথ হেফাজতের ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ পথে পা বাড়ালে তাকে পৃথিবীর আদালতে সোপর্দ করা না গেলেও পরকালে সকল বিচারকের বিচারক আহকামুল হাকিমীনের দরবারে হাজির হয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। আর দুনিয়ায় ধরা পড়লে প্রস্তর নিক্ষেপে তার জীবননাশ করা হবে। এসব ভয় একজন মু'মিনকে সবসময় পাপাচার থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। আমাদের দেশের ধর্ষণকারীদের বেশিরভাগই ধর্মীয় শিক্ষায় একেবারেই অজ্ঞ। ফলে তারা এর ভয়াবহ পরিণামের দিকে আদৌ তোয়াক্কা

---

৪৮৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২, হাদিস নং ১০১

৪৮৭. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭; আদ-দাওয়াহ পত্রিকা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৭৮।

৪৮৮. ইমাম ইব্‌ন মাযাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত,খ. ১, পৃ. ৮১, হাদিস নং ২২৪

করে না। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র খোদাভীতি বা পরকালের ভয় নেই। জন্মগতভাবেই এরা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দুই ধারায় প্রবাহিত। মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা। এ দেশের মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয় বিধায় মাদ্রাসা শিক্ষিতদের হাতে কেউ ধর্ষিতা হয়েছে এমন খবর তেমন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা খুবই অপ্রতুল। যা আছে তাও আবার গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় না। ফলে এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা ধর্মের বিষয়ে সবসময় অজ্ঞই থেকে যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে কেউ কেউ প্রচণ্ড ধর্মবিদ্বেষী ও নাস্তিক হয়ে বেড়ে ওঠে। আনন্দের বিষয় হলো আজ বিলম্বে হলেও ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সবাই অনুভব করতে শুরু করছে। গত ১ ডিসেম্বর ২০০১ বিশ্ব এইডস দিবসের আলোচকবৃন্দ প্রায় সমস্বরেই বলেছেন, "এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন।" সুতরাং তারা বুঝতে পেরেছেন যে, সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে বিশ্বব্যাপী এইডস বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললেই একজন যুবক অবৈধ যৌন মিলন থেকে দূরে থাকবে এবং এতে করে এইডসের মতো ঘাতক ব্যাধি থেকে গোটা সমাজ পরিত্রাণ পাবে।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ইসলামি আকীদা ও তাহজীব তামাদ্দুন অনুযায়ী জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে ইসলামের প্রয়োজনীয় আহকাম ও ইবাদতের বিধিবিধান এবং ইসলামের অপরাধ দমন আইন প্রভৃতি বিষয়–সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছেন বৃটিশরা। যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমাদেরকে গোলাম বানানো। "Education in the harmonious development of body, mind and soul." কিন্তু এর কোনটিরই উন্নয়ন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে একটি জেনারেশন, যারা আমাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী।[৪৮৯]

সুতরাং এদেশের যুবক-যুবতী ও তরুণ-তরুণীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে ইসলামি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তবেই ধর্ষণসহ অগণিত সামাজিক অপরাধ বহুলাংশে হ্রাস পাবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। যে বর্বর আরব জাতি এক সময় নারীকে নিছক ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো, পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ভাগ করে নিত এবং তাদেরকে স্ত্রীর মত ব্যবহার করত। তারাই একদিন মহানবির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীকে একজন মা, কন্যা ও বোন হিসেবে তাদের যথাযথ মর্যাদার আসনে আসীন করেছিল।

চ. বিচারব্যবস্থা ইসলামিকরণ করা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।"[৪৯০] অন্যত্র তিনি বলেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান মুতাবিক ফয়সালা করে না তারাই জালিম।"[৪৯১] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন,

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী যারা ফয়সালা না করে তারাই পাপাচারী।"[৪৯২]

---

৪৮৯. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

৪৯০. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ৪৪।

৪৯১. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ৪৫।

অন্যত্র বলা হয়েছে,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তার আলোকে মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর। আর তোমার নিকট যে সত্য আগমন করেছে তা বিস্মৃত হয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ো না।"[৪৯৩]

হাদিস শরীফে এসেছে,

عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي؟، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ.

"হযরত মু'আয (ইবনে জাবাল) (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) মু'আয (রা.)-কে ইয়েমেনে (বিচারক করে) প্রেরণ করলেন। অতঃপর (প্রেরণের প্রাক্কালে) বললেন, তুমি কিভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করবে? জবাবে মু'আয (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) যা আছে তদনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করব। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, যদি আল্লাহর কিতাবে (বিচার্য বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু) না থাকে? তিনি (মু'আয) বললেন, তাহলে আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের আলোকে করব। তিনি [রাসূলুল্লাহ (স.)] বললেন, যদি রাসূলের সুন্নতেও (সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ) না থাকে ? জবাবে (মু'আয) বললেন, আমি আমার চিন্তার আলোকে ইজতিহাদ করব। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত ব্যক্তিকে এমন কিছু (জ্ঞান) দান করেছেন যা তিনি ভালবাসেন এবং যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।"[৪৯৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর বিধান এবং এ দু'য়ের উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদের আলোকেই বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় মনগড়া আইন দিয়ে বিচার করা হলে সেক্ষেত্রে বিচারক কাফির, জালিম বা ফাসিক হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই ধর্ষণের বিচার করার ক্ষেত্রেও কুরআন-সুন্নাহ ও তদানুযায়ী ইজতিহাদের আলোকে বিচারকার্য নিষ্পত্তি করতে হবে। বিচারকার্যে কোন প্রকার সময়ক্ষেপণ, ছলচাতুরী, প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করে দ্রুততার সাথে ন্যায়বিচার প্রদান করে ধর্ষণকারীকে শাস্তি দিতে হবে। আদালত সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে ধর্ষণকারীকে তাৎক্ষণিক শাস্তিদান করবে। প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইবুনালে এ বিচার সম্পন্ন করতে হবে। কোনমতেই কোন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কোন ধর্ষণকারীর পক্ষাবলম্বন করবেন না এবং এদের জন্য কোন তদবির/সাহায্য সহযোগিতাও করবেন না। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[৪৯৫]

বিচারক কিংবা সাক্ষী বা কোন আইনজীবীসহ যে কাউকে কোন প্রকার উপহার, উপঢৌকন বা উৎকোচ দান-পূর্বক বিচারের রায়কে ধর্ষণকারীর পক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা যাবে না। অনুরূপভাবে বিচারক কোন পক্ষের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে বিচার কার্যে পক্ষপাতিত্ব করতে পারবেন না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য,

---

৪৯২. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ৪৭।

৪৯৩. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ৪৮।

৪৯৪. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৯, হাদিস নং ১৩২৭

৪৯৫. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা (৫) : ২।

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং বিচারগণের নিকট এর (ধন-সম্পদের) সাহায্যে জেনেশুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ গ্রাস করার নিমিত্তে প্রলোভন সৃষ্টি করো না।"[৪৯৬]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ

"রাসূলুল্লাহ (স.) বিচারকার্যে উৎকোচদাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন।"[৪৯৭]

পুলিশগণ ধর্ষিতাকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন এবং কোনমতেই ধর্ষণকারীকে আশ্রয়–প্রশ্রয় বা সাহায্য-সহযোগিতা দিবেন না।

আদালত আইনজীবীগণ ধর্ষিতাকে হেনস্তা করা থেকে বিরত থাকবেন এবং ধর্ষণকারীকে বাঁচানোর জন্য আইনের কূট-কৌশলের ব্যবহার করবেন না ।

সর্বোপরি ধর্ষণকারীর বাবা-মা, আত্মীয়–স্বজন ধর্ষণকারীকে আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকবেন। সমাজের সকল মানুষ ধর্ষণ প্রতিরোধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন এবং ধর্ষণকারীকে ধরে আইনের হাতে সোপর্দ করবেন। ধর্ষণকারীদেরকে ঘৃণা করবেন এবং সামাজিকভাবে এদেরকে বয়কট করবেন। পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন সহ প্রচারমাধ্যমসমূহে ধর্ষণকারীর ছবি এবং নাম-ঠিকানা এবং ধর্ষণের শাস্তি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নিতে হবে। এভাবে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্ষণ নামক এই জঘন্য অপরাধটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে আশা করা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
পতিতাবৃত্তি

পতিতাবৃত্তির পরিচয়

অবৈধ পন্থায় যৌনকার্য সমাধা করা গর্হিত কাজ। যৌনকার্য মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে অন্যতম। এর সমাধান না হলে মানুষ তার জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। নারীদের মধ্যে যারা দেহ ব্যবসায় কোনো প্রতিষ্ঠানিক বা মুক্তভাবে জড়িত তাদেরকে যৌনকর্মী বলে। আরবীতে এ অপর্মকে (**بغاء**) বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৪৯৮] **بغاء** শব্দের অর্থ ব্যভিচার, দুরাচার, চারিত্রিক স্খলন, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি।[৪৯৯]

পতিতাবৃত্তি হলো একটি ব্যবসা বা আচরণ যা অর্থের বিনিময়ে বা অপর কোনো সুবিধাদির বিনিময়ে যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ করে।[৫০০] পতিতাবৃত্তিকে অনেক সময় বলা হয় বাণিজ্যিক যৌনতা। যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে

---

৪৯৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ (২) : ১৮৮।

৪৯৭. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫, হাদিস নং ১৩৩৬।

৪৯৮. ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*,প্রাগুক্ত, খ.১৪, পৃ.৭৫

৪৯৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,*আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী], (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ,মে ২০০৯), পৃ. ২২৪

৫০০. *The Free Merriam-Webster Dictionary*,(Merriam-Webster. Retrieved 19 September 2013),P. 305

কাজ করবে তাকে পতিতা বলা হবে এবং এক ধরনের যৌন কর্মী বলা হবে। পতিতাবৃত্তি হলো যৌন শিল্পের একটি শাখা। দেশে দেশে পতিতাদের মর্যাদা ভিন্ন হয়ে থাকে, অনুমোদিত থেকে অনিয়ন্ত্রিত, শক্তি প্রয়োগ করে বা শক্তি প্রয়োগ না করে অপরাধ। পতিতাবৃত্তিকে অনেক সময় "the world's oldest profession বলা হয়ে থাকে।[৫০১] এক সমীক্ষায় দেখা যায় সারাবিশ্বে পতিতাবৃত্তি থেকে গড়ে আয় হয় ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

পতিতাবৃত্তি বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে থাকে। পতিতালয় (Brothels) বিশেষভাবে পতিতাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পতিতাবৃত্তির নিরাপত্তার স্বার্থে, যৌন কর্ম ক্লায়েন্টের বাড়িতে বা হোটেল কক্ষে (যাকে out-call বলা হয়ে থাকে), বা পতিতার আবাসনে বা হোটেল কক্ষে যা শুধুমাত্র যৌন কর্মের জন্য ভাড়া গ্রহণ (যাকে in-call বলা হয়ে থাকে) করা হয়। অপর একটি মাধ্যম হলো স্ট্রীট পতিতা। যদিও পতিতাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, তথাপি আমরা gay male prostitutes, lesbian prostitutes এবং heterosexual male prostitutes দেখতে পাই।[৫০২]

ইংরেজি Prostitute শব্দটি ল্যাটিন prostituta শব্দ থেকে উৎসারিত হয়েছে। কিছু উৎস মতে এটি একটি ক্রিয়াবাচক শব্দ যা দ্বারা বোঝায় "pro" অর্থ "up front" বা "forward" এবং "situere", যাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে "to offer up for sale"। অন্য এক বিশ্লেষণে বলা হয় ল্যাটিন prostituta শব্দ হলো pro এবং statuere এর একটি সম্মিলন যার অর্থ হলো to cause to stand, to station, place erect। আক্ষরিক অর্থে এর অনুবাদ হলো "to put up front for sale" বা "to place forward"। The online Etymology Dictionary এর মতে,"The notion of 'sex for hire' is not inherent in the etymology, which rather suggests one 'exposed to lust or sex indiscriminately offered"।[৫০৩] এভাবে শব্দটি পশ্চিমা বিশ্বে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার করা হচ্ছে। অধিকাংশ যৌন কর্মীদেও গোষ্ঠিসমূহ Prostitute শব্দটি ব্যবহার করতে চান না। তারা ১৯৭০ সাল থেকে নিজেদেরকে যৌন কর্মী হিসেবে পরিচিতি দিতে চান। তবে যৌন কর্মী বলতে যৌন শিল্পে কর্মরত সকলকে বোঝাবে বা যাদের কাজ প্রকৃতিগতভাবে যৌন সম্পর্কিত এবং শুধুমাত্র পতিতাবৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।[৫০৪]

যারা পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িত হন, তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, যা আবার বিভিন্ন ধরনের পতিতাদের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা হয় বা তাদের সম্পর্কে একটা মূল্যবোধ আরোপের জন্য ব্যবহার করা হয়। পতিতাদের সম্পর্কে একটি সাধারণ বিকল্প শব্দ হলো escort এবং whore তবে সকল escort পতিতা নয়। ইংরেজি শব্দ whore এসেছে প্রাচীন ইংরেজি শব্দ hora থেকে, যা আবার এসেছে প্রোটো-জার্মানিয় শব্দ kohoron (prostitute) থেকে, যা আবার এসেছে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয় শিকড় k• থেকে, যার অর্থ হলো "desire" বা আকাঙ্ক্ষা, যা আবার এসেছে ল্যাটিন শব্দ caritas থেকে যার অর্থ হলো ভালোবাসা, চ্যারিটি এবং ফরাসি শব্দ cher থেকে যার অর্থ হলো প্রিয়, ব্যয়বহুল। ইংরেজি এই whore শব্দটি দ্বারা নিন্দাবাচক বোঝায়, বিশেষভাবে এর আধুনিক অশালীন ভাষা হলো ho। জার্মানিতে অধিকাংশ পতিতাদের সংগঠনসমূহ hure (whore) শব্দটি ব্যবহার করে কারণ Prostitute শব্দটি একটি আমলাতান্ত্রিক প্রত্যয় বলে তারা মনে করে। যারা পতিতাবৃত্তির প্রতি সামাজিক স্থবিরতা ভাঙ্গতে চান তারা প্রায়শই কয়েকটি পরিবর্তিত প্রত্যয় ব্যবহার

---

৫০১. Ronald B. Flowers, *The prostitution of women and girls,*ibid, P. 5

৫০২. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১৭

৫০৩. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১৭; "prostitute", Online Etymology Dictionary, 2012

৫০৪. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১৮; "sex worker",Merriam-webster.com, 2012

করেন। যেমন, sex worker, commercial sex worker (CSW), tantric engineer (coined by author Robert Anton Wilson), বা sex trade worker। সঠিকভাবে হোক আর না হোক পতিতা বলতে সাধারণভাবে নারী যৌন কর্মীকে বোঝানো হয়ে থাকে, তবে পুরুষ পতিতা বোঝাতে শুধু পতিতা না বলে পুরুষ পতিতা শব্দটি বলা হয়ে থাকে। যেসব পুরুষ নারীদের কাছে তাদের যৌনতা বিক্রি করে তাদেরকে এক কথায় gigolos বলা হয়ে থাকে, hustlers বা rent boys বলা হয়ে থাকে। [৫০৫]

পতিতাবৃত্তির ইতিহাস

Zohar এবং the Alphabet of Ben Sira-এর মতে পবিত্র পতিতাবৃত্তির চারজন দেবদূত ছিল, যারা Archangel Samael এর সাথে মিলিত হয়েছিল। তারা হলো চার রানী Lilith, Naamah, Agrat Bat Mahlat এবং Eisheth Zenunim।

প্রাচীন কালে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অনেক তীর্থস্থান এবং মন্দির বা "houses of heaven" ছিল, যা দেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ছিল, যারা আবার পতিতা ছিল। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাঁর The Histories গ্রন্থে বলেন, পবিত্র যৌন কর্ম ছিল খুব সাধারণ বিষয়।[৫০৬] এটির সমাপ্তি ঘটে তখন যখন সম্রাট চতুর্থ শতাব্দীতে দেবীর মন্দির ধ্বংস করে সেখানে খ্রিস্ট ধর্মের স্থাপত্য নির্মাণ করেন। খ্রিস্ট পূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া নারীর সম্পত্তিগত অধিকার রক্ষণে প্রয়োজনীয়তাকে চিহ্নিত করে। হাম্বুরাবির কোডে, নারীদের উত্তরাধিকার অধিকার সংরক্ষিত করা হয় এমনকি পতিতাদের জন্য সম্পত্তিগত অধিকারও।

গ্রীস

প্রাচীন গ্রীসে নারী এবং বালক সকলেই পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িত ছিল। নারী পতিতারা ছিল আত্মনির্ভর এবং কখনও কখনও প্রভাবশালী। তাদেরকে স্বতন্ত্র পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে হতো এবং কর দিতে হতো। জাপানের oiran, ভারতের tawaif এবং গ্রীক hetaera এর মধ্যে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসের কিছু পতিতা, যেমন Lais তাদের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং কিছু নারী তাদের সেবার জন্য অসাধারণ কিছু ফিস গ্রহণ করতেন।

রোম

প্রাচীন রোমে পতিতাবৃত্তি ছিল বৈধ, সার্বজনিক এবং ব্যাপক বিস্তৃত। একজন রেজিস্টার্ড পতিতাকে বলা হতো meretrix এবং রেজিস্টার্ডবিহীন পতিতাকে বলা হতো prostibulae। গ্রীক ব্যবস্থার সাথে রোমের কিছু সামঞ্জস্যতা ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে, বিদেশি দাসরা পতিতা হতে থাকল, যাদেরকে ক্রয় করে, ধরে এনে, বা পতিতাবৃত্তির জন্য ছোট থেকে বড় করা হতো, কখনও কখনও ব্যাপক পতিতা খামারী (prostitute farmers) ছিল, যারা পরিত্যক্ত সন্তানদেরকে বড় করে পতিতা বানাত। প্রকৃতপক্ষে, পরিত্যক্ত শিশুদেরকে পতিতা বানাতে হতো।[৫০৭] ক্রেতারা নারী বা পুরুষ পতিতাদের ক্রয় করার সময় উলঙ্গ করে ব্যক্তিগতভাবে দেখার সুযোগ পেতো এবং পুরুষ ক্রেতা কর্তৃক পুরুষ পতিতা ক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল না।

এশিয়া

শিয়া মুসলিমদের মতে, নবী মোহাম্মদ (স.) অস্থায়ী-মেয়েদের বিবাহকে অনুমোদন করেছেন ইরাকে muta'a এবং ইরানে sigheh- যা যৌন কর্মীদের জন্য একটা বৈধতার মোড়ক হিসেবে ছিল, বিশেষ

---

৫০৫. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১৮

৫০৬. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, প্রাগুক্ত, ৩১৮; james Frazer, *The Golden Bough*,1922

৫০৭. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৩১৯

করে সেই সমাজে যেখানে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ।[৫০৮] সুন্নী মুসলমান, যারা সারা বিশ্বে মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিশ্বাস করে যে এই অস্থায়ী বিবাহ স্থগিত করা হয়েছিল এবং মোহাম্মদের (স.) দ্বারাই বা তাঁর অনুসারী ওমর (রা.) দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছিল। শিয়াদের মতো সুন্নীরাও পতিতাবৃত্তিকে নিষিদ্ধ এবং পাপ বলে জানে। সপ্তদশ শতাব্দির প্রথমভাগে, জাপানের কিয়োটো, ইডো, ওসাকা নগরীতে ব্যাপক সংখ্যক নারী এবং পুরুষ পতিতা ছিল। জাপানে oiran-রা ছিল বারবণিতা। তারা বিবেচিত হতো এক ধরনের yujo "woman of pleasure" or prostitute নামে। oiran দের মধ্যে উচ্চ পদের বারবণিতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যারা শুধুমাত্র সম্পদশালী এবং উচ্চ পদমর্যাদার পুরুষদের জন্য সেবা প্রদান করত। তাদের কিছু ক্লায়েন্টদের জন্য তারা নৃত্যকলা, সংগীত, কবিতা আবৃত্তি, এবং ক্যালিগ্রাফির পাশাপাশি বিভিন্ন যৌন সেবা প্রদান করত এবং শিক্ষাগত বোধশক্তি বা প্রাণময়তাকে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হতো স্পর্শকাতর কথোপকথোনের জন্য। অনেকে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। একজন tawaif ছিল বারবণিতা যারা দক্ষিণ এশিয়ার অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে সেবা দিত, বিশেষ করে মোঘল যুগে। এই বারবণিতারা নৃত্য করত, গান করত, কবিতা আবৃতি করত এবং মেহেফিলে তাদের পাণিপ্রার্থীদেরকে তারা বিনোদন দিত। সনাতন জাপানের geisha-দের মতে, তাদের প্রধান পেশা ছিল তাদের অতিথিদেরকে আপ্যায়িত করা, এখানে যৌনতা ছিল ঘটনাক্রমিক, যা সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হতো। তারা উর্দু সংস্কৃতির বা সাহিত্যের প্রথা অনুযায়ী গান, নৃত্য, নাটক, ফিল্ম করত।

মধ্য যুগ

মধ্যযুগে পতিতাদের সংজ্ঞা ছিল অস্পষ্ট, অনেক ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিধিসম্মত সংগঠনসমূহ বিবর্তিতভাবে পতিতাবৃত্তির সংজ্ঞায়ন করেছে। এমনকি মধ্যযুগের ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন, পতিতা কী সে সম্পর্কে তারা কোনো সংজ্ঞায়ন করেননি। কারণ, তারা মনে করতেন এটি করা অপ্রয়োজনীয় মনে করা হতো। পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে সর্বপ্রথম পরিচিত সংজ্ঞায়ন আমরা দেখতে পাই তৃতীয় শতাব্দির Marseille প্রণিত সংবিধি অনুযায়ী, যেখানে পতিতাদের উপর একটি অধ্যায় রয়েছে। তিনি পতিতাদেরকে "public girls" নামে অভিহিত করেন, যারা প্রতি দিন বা রাতে দুই বা ততোধিক পুরুষ তাদের বাড়ীতে গ্রহণ করত এবং নারী হিসেবে তাদের দেহকে নিয়ে ব্যবসা করত, একটি পতিতালয়ের সীমানার মধ্যে।[৫০৯] চতুর্দশ শতাব্দিতে ইংলিশ নিবন্ধে Fasciculus Morum বলেন, পতিতাবৃত্তি প্রত্যয়টি দ্বারা বুঝাবে, "must be applied only to those women who give themselves to anyone and will refuse none, and that for monetary gain."[৫১০]

বিংশ শতাব্দি

সাম্যবাদের প্রথমসারীর তাত্ত্বিকগণ পতিতাবৃত্তির পরিপন্থি। সাম্যবাদী সরকারসমূহ প্রায়শই এধরনের যৌন কর্মকে চাপে রাখতে চেয়েছেন তাদের ক্ষমতায় আরোহণের অব্যবহিত পরেই, যদিও এটিই বাস্তবায়িত হয়। সমসাময়িক সাম্যবাদী সমাজে, এটি অবৈধ রয়েছে কিন্তু এটি খুব প্রচলিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে অনেক সাম্যবাদী দেশসমূহে পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

---

৫০৮. lkkaracan, Pinar, *Deconstructing sexuality in the Middle East: challenges and discourses*,(Ashgate Publishing Ltd.), p. 36

৫০৯. Ruth Mazo Karras,*Handbook of Medieval Sexuality*,(New York: Garland Publishing, Inc. 1996), p. 243-260

৫১০. Ruth Mazo Karras, *Handbook of Medieval Sexuality*, ibid, p. 243-260

প্রকৃতপক্ষে, পতিতাবৃত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে বৈধ। তবে ১৯১০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে Woman's Christian Temperance Union-এর প্রভাবে পতিতাবৃত্তিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। অপরদিকে, পতিতাবৃত্তি দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে রেভিনিউ বয়ে আনে, সামরিক সরকার সেখানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর জন্য পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। ১৯৫৬ সালে, যুক্তরাজ্যে Sexual Offences Act ১৯৫৬ প্রবর্তন করা হয়, যা Sexual Offences Act ২০০৩-এ আংশিকভাবে পরিবর্তিত হয়। যদিও এই আইন পতিতাবৃত্তিকে অপরাধী কর্ম হিসেবে গণ্য করে না, বরং তা পতিতালয় বা কাউকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করাকে অবৈধ ঘোষণা করে। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্টেটে পতিতাবৃত্তিকে অবৈধ ঘোষণা করে যদি পতিতা নিশ্চিতভাবে এইচআইভি পজিটিভ আক্রান্ত থাকে। বিংশ শতাব্দিতে বিতর্কিত পশ্চিমা ট্যুরিজম এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে Sex tourism-এর বিস্তার ঘটে।[৫১১]

একবিংশ শতাব্দি

একবিংশ শতাব্দীতে, আফগানরা পতিতাবৃত্তির একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করে যেখানে বালকদেরকে পতিতা বানানো হয় যারা "Bacha Bazi" নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর হাজার হাজার পূর্ব ইউরোপীয় নারী প্রতি বৎসর চীনে, পশ্চিম ইউরোপে, ইসরাইলে এবং তুরস্কে পতিতাবৃত্তিতে জড়িত হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রায় দশ হাজার নারী দুবাইতে পতিতার কাজ করে। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পুরুষ দুবাইতে আসে যৌন উদ্দেশ্যে। হিন্দু মন্দিরে দেবী রেনুকার উদ্দেশ্যে দরিদ্র পরিবারের অভিভাবকেরা তাদের মেয়েদেরকে দেবদাসী হিসেবে উৎসর্গ করে থাকে। বিবিসি ২০০৭ সালে এক জরিপে বলে এসব দেবদাসীরা একপ্রকার "sancified prostitutes" ঐতিহাসিকভাবে, গির্জায় বর্তমানে পতিতাবৃত্তি চলমান, তা বৈধ হোক বা না হোক, তবে তা নির্ভর করে কোনো দেশ বা রাষ্ট্র বা প্রদেশের নিজস্ব প্রথার উপরে।[৫১২]

পতিতাবৃত্তির বিধান

যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থানের জন্য ব্যভিচারে উৎসাহ দানকারী সবকিছুকে সমাজ থেকে নির্মূল করা জরুরী এবং চিন্তা ও কর্মে দেওলিয়াত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমন সব পথ বন্ধ করা প্রয়োজন। এছাড়া মানুষের সঠিক পথে টিকে থাকা অসম্ভব। কোনো এক সময় অপবিত্র পথে তার পা পড়বেই।

এ উদ্দেশ্যে ইসলাম সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির নোংরামি থেকে পবিত্র করে। বৃক্ষের যে শাখে অলক্ষুণে পাখি নীড় রচনা করে ইসলাম সে শাখাই কেটে ফেলে।[৫১৩]

ক. পতিতাবৃত্তির উপার্জন সরাসরি অবৈধ

জাহেলী যুগে বেশ্যাবৃত্তির জন্য দাসীরা নির্দিষ্ট ছিল। এ কারণে কুরআন এবং হাদীসে তাদেরকে এ পেশা থেকে দূরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নবীন সভ্যতার আলো যদি অভিজাত ও সুশিক্ষিতা মেয়েদের দ্বারা এ জঘন্য কাজ করায় ইসলামের শিক্ষা তাকেও অপবিত্র ও হারাম বলে ঘোষণা করে। ইসলাম কোনো কাজ সম্পাদনকারীর দৈহিক গঠন ও আকৃতি, তার অবস্থান, পদমর্যাদা, বংশ ও গোত্র কি তা দেখে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) সবসময় পতিতাবৃত্তির উপার্জনকে সরাসরি অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

---

৫১১. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২০

৫১২. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২১

৫১৩. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত,পৃ.

হযরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، »

"রাসূলুল্লাহ (স.) কুকুরের মূল্য এবং বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৫১৪]

অন্য একটি হাদীসের ভাষা হলো,

«وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ » "ব্যভিচারিণীর আয় অপবিত্র ও নোংরা।"[৫১৫]

এ ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ইসলামি জ্ঞান গবেষক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত কত কঠোর ইমাম ইবনে তাইমিয়ার নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য থেকে তা অনুমান করতে পারা যায় :

فَأَمَّا إِذَا كَانَ هُوَ يُرْسِلُهَا لِتَبْغِيَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَهْرِ الْبِغَاءِ، أَوْ يَأْخُذُ هُوَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ: فَهَذَا مِمَّنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛ وَهُوَ فَاسِقٌ خَبِيثٌ؛ آذِنٌ فِي الْكَبِيرَةِ، وَآخِذٌ مَهْرَ الْبَغِيِّ؛ وَلَمْ يَنْهَهَا عَنْ الْفَاحِشَةِ. وَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُعَدَّلًا؛ بَلْ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ الْغَلِيظَةَ حَتَّى يَصُونَ إمَاءَهُ.

وَأَقَلُّ الْعُقُوبَةِ أَنْ يُهْجَرَ فَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُ إذَا أَمْكَنَتْ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِ، وَلَا يُسْتَشْهَدَ وَلَا يُوَلَّى وِلَايَةً أَصْلًا. وَمَنْ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ؛ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَكَانَ مُرْتَدًّا لَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ عُرِّفَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا.

"যদি কেউ তার দাসীকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য কিংবা নিজে ব্যয় করার জন্য অর্থ উপার্জন করতে পাঠায় এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। সে ফাসেক ও পাপী। কেননা সে একটি কবীরা গোনাহর অনুমতি দিয়ে রেখেছে। ব্যভিচারিণীর উপার্জন গ্রহণ করছে এবং ব্যভিচার থেকে বিরত রাখছে না। এ ধরনের লোককে আইনগত দিক দিয়ে অগ্রহণীয় ও অনির্ভরযোগ্য মনে করতে হবে বরং তাকে মুসলমানদের সমাজে থাকতে দেয়া যাবে না। এরূপ পাপী ও দুষ্কর্মশীল ব্যক্তি যদি তার দাসীকে একাজ থেকে বিরত না রাখে, তাহলে সে অত্যন্ত কঠোর শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।"

তার সর্বাপেক্ষা লঘু শাস্তি হলো তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, সালাম দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং অন্য কোনো ইমাম পাওয়া গেলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে না। তাকে সাক্ষী বানানো যাবে না এবং কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না। যদি সে এ কাজকে হালাল মনে করে তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাকে তাওবা করতে হবে। সে যদি তাওবা করে তাহলে সব ঠিক। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। মুরতাদ হওয়ার কারণে তার মুসলিম উত্তরাধিকারীরা তার ওয়ারিশ হবে না। এ কাজের হারাম হওয়া সম্পর্কে তার জানা না থাকলে দলীল বা হুজ্জত' পূরণ হওয়ার জন্য তাকে জানানো হবে (এবং তার সাথে ওপরে বর্ণিত আচরণ করা হবে)। কারণ, এটি এমন একটি কাজ যা হারাম হওয়া সম্পর্কে গোটা উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছে।"[৫১৬]

খ. পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার ওপর নিষেধাজ্ঞা

আরবের জাহেলী সভ্যতা ব্যভিচারের নিয়মিত আখড়া প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। এসব আখড়ায় যৌনাচারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ছিল। পুঁজিপতিরা সম্ভ্রম বিক্রি করতে দাসীদেও বাধ্য করতো। আর সে অর্থ দিয়ে তারা তাদের লালসা চরিতার্থ করতো। উপার্জনের এ লাঞ্ছনাকর পথ কুরআন মজীদ একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছে :

---

৫১৪. বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত,খ. ৩, পৃ. ৮৪, হাদিস নং ২২৩৭

৫১৫. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৬, হাদিস নং ৩৪২১

৫১৬. ইবনে তাইমিয়া, *আল-ফাতাওয়ার কুবরা*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪৫

وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

"পার্থিব জীবনের নগণ্য ভোগের উপকরণ লাভের জন্য নিজের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা, যদি তারা পবিত্র জীবনযাপন করতে চায়।"[৫১৭]

অনেক সময় দাসীর মালিক দাসীকে সরাসরি তার সম্ভ্রম বিক্রি করতে হুকুম দিতো না বটে কিন্তু এতো অধিক অর্থ প্রদান তার জন্য বাধ্যতামূলক করে দিতো যে, বেচারী কোনো বৈধ পথে তা উপার্জন করে দিতে পারতো না। তাই এজন্য সে দেহ বিক্রি করতে বাধ্য হতো। রাসূলুল্লাহ (স.) দাসীর মালিকের এ যুলুমমূলক অধিকার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, সে দাসীকে পবিত্রতার গণ্ডির মধ্যে রেখেই কেবল কোনো কাজ করাতে এবং তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে।[৫১৮]

রাফে ইবনে রিফা'আ বলেন,

لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَذَكَرَ أَشْيَاءَ " وَنَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا، وَقَالَ: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ "

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আজকে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন, এবং তিনি দাসীদের উপার্জন খেতে নিষেধ করেছেন। তবে তার হাতের উপার্জন খেতে নিষেধ করেননি। রাসূলুল্লাহ (স.) আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন : এভাবে অর্থাৎ রুটি পাকানো, সুতা কাটা এবং তুলা ধুনার উপার্জন।"[৫১৯]

রাফে ইবনে খাদীজ রা. বর্ণনা করেছেন :

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ»

"রাসূলুল্লাহ (স.) ততোক্ষণ পর্যন্ত দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যতোক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে সে কিভাবে তা উপার্জন করেছে।"[৫২০]

জাহেলী যুগে বেশ্যাবৃত্তির জন্য দাসীরা নির্দিষ্ট ছিল। এ কারণে উপরোক্ত আয়াতে এবং হাদীসে তাদেরকে এ পেশা থেকে দূরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নবীন সভ্যতার আলো যদি অভিজাত ও সুশিক্ষিতা মেয়েদের দ্বারা এ জঘন্য কাজ করায় ইসলামের শিক্ষা তাকেও অপবিত্র ও হারাম বলে ঘোষণা করে। ইসলাম কোনো কাজ সম্পাদনকারীর দৈহিক গঠন ও আকৃতি, তার অবস্থান, পদমর্যাদা, বংশ ও গোত্র কি তা দেখে না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স.) সবসময় বেশ্যাবৃত্তির উপার্জনকে সরাসরি অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

পতিতাবৃত্তি প্রতিরোধে ইসলামি আইন

কোন নারী স্বেচ্ছায় নিজেকে দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করতে পারবে না। এটা হারাম তথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অন্য কেউ তাকে দিয়ে দেহ ব্যবসায় পরিচালনা করতে চাইলে তাও হারাম। আল কুরআনে এসেছে,

(وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ)

"তোমরা যুবতীদের দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতে বাধ্য করো না।"[৫২১]

ইসলাম ব্যভিচার ও দেহ ব্যবসাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পর্ণোগ্রাফি তৈরি অশ্লীলতা ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচায়ক। তরুণ-যুব-শিশুর চরিত্র হনন করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম যে

---

৫১৭. আল-কুরআন, সূরা আন-নূর (২৪) : ৩৩

৫১৮. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*,প্রাগুক্ত,পৃ.

৫১৯. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৭, হাদিস নং ৩৪২৬

৫২০. আবু দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৬৭, হাদিস নং ৩৪২৭

৫২১. *আল-কুরআন*, সূরা নূর (২৪) : ৩৩

কোন প্রকার অশ্লীতার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন ঘোষণা করেন,

(وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)

"তোমরা কোন ধরনের প্রাকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়ো না।" ৫২২

উল্লেখ্য যে পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ইসলামি শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে।

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ،

আবু মাসউদ আল আনসারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ স. কুকুরের বিক্রয়মূল্য ও পতিতার উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।"[৫২৩]

এ হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ হারাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
অপবাদ আরোপ

'কায্ফ' বা যিনার অপবাদ

অসৎচরিত্রের মধ্যে অপবাদ একটি নিকৃষ্ট বিষয়। অপবাদ ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারকে কলুষিত করে। এর কারণে মানুষের সম্মানের হানি ঘটে। ফলে একজন সৎ মানুষ সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে যায়। এ জন্যই ইসলাম অপবাদের শাস্তির বিধান করেছে। যাতে মানুষ এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকে। যে কোন সমাজে কারও বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা জঘণ্য অপরাধ। এর অশুভ প্রতিক্রিয়া সমাজে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত ব্যক্তি জনগণের আস্থা থেকে চিরতরে বঞ্চিত হয়। তার বিরুদ্ধে সমাজে যে ব্যাপক প্রচারণা চলতে থাকে, তা মিথ্যা প্রমাণ করা ও তার খারাপ প্রতিক্রিয়া রোধ করা বা তার কু-প্রভাব মুছে ফেলা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভব হয়না।

অপবাদের পরিচয়

অপবাদ শব্দের আরবী প্রতিশব্দ 'কায্ফ' (قذف)। 'কায্ফ'-এর আভিধানিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা, সঞ্চার করা। কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৫২৪] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ-"তিনি তাদের অন্তঃকরণসমূহে ভীতি ঢেলে দিলেন।"[৫২৫] শব্দটি ছুঁড়ে মারা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন,فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ -"এরপর তুমি তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে।"[৫২৬] ইব্ন মানযূর আল-ইফরিকী বলেন, 'কায্ফ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো যে কোন বস্তুর সাহায্যে ছুঁড়ে মারা, পাথরের সাহায্যে 'কায্ফ' করার অর্থ হলো পাথর ছুঁড়ে মারা, আর মিথ্যা দ্বারা তাকে 'কায্ফ' করার অর্থ তার প্রতি মিথ্যাচার করা, সতী-সাধ্বী রমণীকে 'কায্ফ' করা অর্থ তাকে গালি দেয়া, দোষারোপ করা।'[৫২৭]

---

৫২২. *আল-কুরআন*, সূরা আন'আম (৬) : ১৫১

৫২৩ ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ.৮,পৃ.২৩২,হাদিস নং-২২৩৭

৫২৪. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ২৭৭

৫২৫. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩) : ২৬; সূরা হাশর (৪৯) : ২

৫২৬. আল-কুরআন, সূরা ত্বাহা (২০) : ৩৯

৫২৭. *লিসানুল আরব*,প্রগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৫।

ইসলামি শরিআতের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়াকে 'কায্ফ' বা অপবাদ বলা হয়।[৫২৮] আইনের পরিভাষায় অপবাদ বা 'কায্ফ' বলা হয় স্পষ্ট কিংবা ইঙ্গিতে যিনা বা ব্যভিচারের সাথে সম্পর্কের কথা বলা।[৫২৯]

অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার সাথে পায়ুপথে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও 'কায্ফ'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৫৩০]

ইব্ন 'আরাফা বলেন,

القذف هو نسبة أدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم وقال أيضا: نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء الزنا أو قطع نسب مسلم.

"অপবাদ হলো অপর লোককে যিনার সাথে সম্পৃক্ত করা কিংবা মুসলিম বংশের সম্পর্কচ্ছেদ করা। তিনি আরও বলেন, অপবাদ হলো অপর কোন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, চরিত্রবান, বালিগ মুসলমানকে কিংবা এমন ছোট মহিলাকে যে সহবাসের শক্তি রাখে, যিনার অপবাদ দেয়া, অথবা তার মুসলিম বংশ ছেদন করা।"[৫৩১]

অতএব 'কায্ফ' হলো বদনাম, কদার্যোক্তি ও নিষিদ্ধ মিথ্যাচার। এটা একবার করুক কিংবা কয়েকবার নিষ্কলঙ্ক পুরুষ সম্পর্কে করুক কিংবা সাধ্বী রমণী সম্পর্কে করুক, কিংবা শব্দদ্বারা করুক, কিংবা বংশ পরিচিতি অস্বীকার করে করুক, সচ্চরিত্রবানকে করুক বা চরিত্রহীনকে করুক, পুরুষ হোক কিংবা নারী, স্বাধীন কিংবা পরাধীন, দাসী হোক কিংবা স্বাধীন মহিলা, শরীফ হোক কিংবা ইতর, স্পষ্ট শব্দদ্বারা কিংবা ইঙ্গিতে, একে ফিরিয়া (فرية) তথা বদনামী হিসেবে নামকরণ করা হয়। কেননা তাতে অপবাদ ও মিথ্যাচার উভয়টাই রয়েছে।[৫৩২]

এটা স্পষ্টতঃ এক ধরনের মিথ্যাচার ও বদনাম। এ অপবাদেরই আর একটি রূপ হচ্ছে নিজের গুনাহকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

"যে ব্যক্তি কোন গুনাহ্ বা নাফরমানী করল এবং এরপর এক নিরাপরাধ ব্যক্তির উপর তার অপবাদ আরোপ করল, সে এক মহাক্ষতি এবং স্পষ্ট গুনাহকেই নিজের মাথায় চাপিয়ে নিলে।"[৫৩৩]

আল-কুরআন ও হাদীসে 'কায্ফ' বা অপবাদ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণের জন্য তিনি উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি আহ্বান করেছেন, আর সকল প্রকার ভর্ৎসনা, অভিসম্পাত ও অশ্লীলতা প্রকাশকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা অপবাদকে হারাম করেছেন। আর অপবাদ প্রদানকারীর জন্য কঠিন শাস্তি বেত্রাঘাত, সাক্ষ্য প্রত্যাখান ও ফাসিক বলে আখ্যায়িতকরণ নির্ধারণ

---

৫২৮. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত,২৮০; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ*,(বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; ইবনু নজীম, *আল-বাররুর রা'ইক শারহু কানযিদদাকা'ইক*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ,২০০২)৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯

৫২৯. আবদুর রহমান আল-জাযাইরী, *কিতাবুল-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*,(বৈরূত: দারুল-ফিক্র, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

৫৩০. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.), খ. ৪, পৃ. ৪৮৬, ৫০১; ইবনু কুদামাহ্, *আল মুগনী*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি), খ. ৮, পৃ.৭৯

৫৩১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত,২৮১; ইব্ন 'আরাফা, *আশ-শারহুল কাবীর 'আলা মুখতাসার খালীল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৫

৫৩২. *কিতাবুল ফিকহ 'আলা মাযাহিবিল আরবা'আ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

৫৩৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা (৪) : ১১২

করেছেন। সর্বোপরি সে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এ শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, সমাজের লোক যাতে সতী-সাধ্বীদের অপবাদ দেয়াকে ঘৃণা করে, অশ্লীলতা থেকে সমাজ যাতে পবিত্র থাকে, অশ্লীলতা বিস্তারে যাতে সবাই অনীহা বোধ করে, সমাজের লোক সকল প্রকার নাফরমানী ও ফাসিকী থেকে বাঁচতে পারে।

দুনিয়ার সকল দেশেই মানহানির বিচারের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। ইসলামি দণ্ডবিধিতেও এর সুবিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজে অনাচার সৃষ্টিকারী যে কোন অপপ্রচার ইসলাম নির্মূল করতে চায়। গুজব, পরনিন্দা, পরচর্চা আল-কুরআনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে ব্যভিচার সংক্রান্ত অপবাদ-দানকারী ব্যক্তিকে আশি বেত্রাঘাত ছাড়াও তার উপর লা'নত বর্ষণ করা হয়েছে। এ ধরনের লোককে বিশ্বাসের অযোগ্য ঘোষণা করে দুনিয়া এবং আখিরাতের কঠিন আযাবে পরিবেষ্টিত হওয়ার সংবাদ দিয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

যেসব লোক সচ্চরিত্র সরল সহজ ঈমানদার মহিলাদের উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য কঠোর আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।[৫৩৪] অপবাদ দানকারীর শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'যারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসিক।[৫৩৫]

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا – تَعْنِي – الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ، أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ»

"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, আমার পবিত্রতা বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ করেন। তারপর মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলা সম্পর্কে শাস্তির নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করেন।"[৫৩৬]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»

"তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু ত্যাগ কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি কি? তিনি বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, ৭. মু'মিন ও চরিত্রবতী সতী-সাধ্বী রমণীদের প্রতি যিনার অপবাদ দেয়া।"[৫৩৭]

এ উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সতী-সাধবী মুমিনা মহিলাদের অপবাদ দেয়া মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত- যা মানবজাতির মান-ইয্যত, গৌরব ও মর্যাদা বিনষ্ট করে।

---

৫৩৪. আল-কুরআন, সূরা নূর (২৪) : ২৩

৫৩৫. আল-কুরআন, সূরা নূও (২৪) : ৪

৫৩৬. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪. পৃ.১৬৩, হাদিস নং ৪৪৭৪

৫৩৭. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খণ্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ১৭৫, হাদিস নং ৬৮৫৭

‘কায্‌ফ’-এর সাধারণ বিধান

১.শুধু যিনার দোষারোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ এর অর্থ, যেসব লোক মিথ্যা দোষারোপ করে। কিন্তু এ আয়াতের পূর্বাপর আয়াতসমূহ লক্ষ করলে বুঝা যায় যে, এখানে দোষারোপ বলতে সব রকমের দোষারোপ বুঝানো হয়নি, বরং শুধু যিনার দোষারোপকেই বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আলিমগণের কোন মতপার্থক্য নেই। এ জন্যই ফকীহগণ এক্ষেত্রে ‘কায্‌ফ’ নামে স্বতন্ত্র পরিভাষা তৈরি করেছেন, যেন অন্য কোন দোষারোপ এ বিধানের আওতায় না আসে। ‘কায্‌ফ’ ছাড়া অন্য দোষারোপের শাস্তির জন্য বিচারক মানহানি বা অপমান এ ধরনের সাধারণ আইন রচনা করতে পারেন।[৫৩৮]

২. নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

আয়াতে যদিও يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (চরিত্রবতী সতী নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে) বলা হয়েছে। কিন্তু ফিকহবিদগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এখানে কেবল স্ত্রীলোকদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করার কথাই বলা হয়নি, পাক চরিত্রের পুরুষদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করলেও এ বিধান কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে দোষারোপকারী বলতে এখানে কেবল পুরুষদের বিষয়েই বলা হয়নি, স্ত্রীলোকও যদি ‘কায্‌ফ’-এর অপরাধ করে, তবে তার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য হবে। কেননা, এ অপরাধ এতই সাংঘাতিক যে, অপরাধকারী পুরুষ হোক বা নারী, তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। অতএব আইনের রূপটি হবে এই যে, কোন নারী বা পুরুষ অপর কোন পাক চরিত্রের নারী বা পুরুষের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিলে তাকে এ শাস্তি দিতে হবে।[৫৩৯]

৩. সচ্চরিত্রবান পুরুষ বা সচ্চরিত্রবতী মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

আল্লাহ্‌র বাণী, يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, এ বিধান কার্যকর হবে একমাত্র সচ্চরিত্রবান পুরুষ বা সচ্চরিত্রবতী মহিলার উপর অপবাদ দেওয়া হবে, খারাপ কাজে বহুল পরিচিত এমন চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করা হলে এ আইন কার্যকর হবে না। এর জন্যে বিচারক স্বতন্ত্র আইন তৈরি করবেন এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা নেবেন।[৫৪০]

৪. ‘কায্‌ফ’-এর মামলাকারী

যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে সে নিজেই ‘কায্‌ফ’ -এর মামলা চালাতে পারে। তার অবর্তমানে যাদের বংশ মর্যাদার উপর ‘কায্‌ফ’-এর কারণে আঘাত লেগেছে, তারাও মামলা করতে পারে। যেমন পিতা, মাতা, ছেলে, নাতি। এটা ইমাম আবু হানীফার অভিমত। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ-এর মতে উত্তরাধিকারসূত্রে সকল ওয়ারিস ‘কায্‌ফ’কারীর শাস্তি দাবী করতে পারে। তবে ইমাম শাফিঈ-এর মতে স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী বা স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামী এ দাবী করতে পারে না। কারণ মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামীত্ব এবং স্ত্রীত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া এদের একজনের উপর দোষারোপ করা হলে অপর জনের বংশ মর্যাদার ক্ষতি হয় না।

ইমাম আবু হানীফার অভিমতের পক্ষে যুক্তি এই যে, আল-কুরআন-তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যুতে অপরজনকে উত্তরাধিকার বানিয়েছে। এছাড়া কোন স্ত্রীর উপর দোষারোপ করা হলে স্বামীর সমস্ত সন্তানের বংশ মর্যাদা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে ‘কায্‌ফ’-এর শাস্তির দাবী উত্তরাধিকার সূত্রে

---

৫৩৮. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*,(বৈরূত: কিতাবুল ‘আরাবী, ১৩৫হি.),৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৫৩৯. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।

৫৪০. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, প্রাগুক্ত,২৮৫; সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিকহুস-সুন্নাহ*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল ‘আরবী), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫

ওয়ারিসগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে স্বামী-স্ত্রীও একজনের অবর্তমানে অন্যজন এ অধিকারপ্রাপ্ত হবে।[৫৪১]

৫. সরকার বাদী অপরাধ

'কায্ফ' সরকার বাদী অপরাধ (Cognizable offence) কিনা এ সম্পর্কে ফিকহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। ইবন আবি লায়লা-এর মতে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে। সে দাবী না করলেও প্রশাসনের দায়িত্ব 'কায্ফ' কারীর উপর শরী'আতের শাস্তি জারী করা।

ইমাম মালিকের মতে সরকারি দায়িত্বশীলদের সম্মুখে অপরাধ করে থাকলে শাস্তি দেয়া তাদের কর্তব্য হবে। অন্যথায় যার প্রতি অন্যায় করেছে, তার দাবীর প্রেক্ষিতে ফায়সালা হবে।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আওযাঈর মতে, অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি দান করা কর্তৃপক্ষের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু মামলা দায়ের না হলে সরকারের কিছু করার থাকবেনা।[৫৪২]

৬. রাযীনামাযোগ্য মামলা (প্রত্যাহারযোগ্য নয়)

'কায্ফ' অপরাধ রাযীনামাযোগ্য (Compoundable offence) মামলা। এ মামলা একবার আদালতে উঠলে 'কায্ফ'-কারীকে তার অভিযোগ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। প্রমাণ করতে না পারলে তার শাস্তি ভোগ করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না। তওবা, ক্ষমা, মীমাংসা কিছুই তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

"অপরাধের শাস্তিসমূহ তোমরা পারস্পরিকভাবে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে শাস্তির বিষয়টি আমার সম্মুখে উপস্থাপিত হবে, তা অবশ্যই কার্যকর হবে।"[৫৪৩]

মুহ্ছন ও মুহ্ছনাহ্ পরিচয়

মুহ্ছান ও মুহ্ছানাহ্ শব্দ দু'টো ইহ্ছন (إحصان) থেকে নিষ্পন্ন। ইহ্ছান-এর পারিভাষিক অর্থ সহিহ্ বিবাহের ভিত্তিতে জ্ঞানবান, বালিগা, মুসলিম পুরুষ, কোন বালিগা জ্ঞানবান আযাদ 'মুসলিম' নারীর সাথে সহবাস করা। এ জাতীয় পুরুষকে পরিভাষায় মুহ্ছান এবং নারীকে মুহ্ছানাহ বলা হয়।[৫৪৪]

ইহ্ছান (إحصان) এর শর্তাবলী

ইহ্ছান এর জন্যে ব্যক্তির মধ্যে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, যথা-

১.স্বাধীন ২. বালিগা, ৩. জ্ঞানবান, ৪. মুসলিম, ৫. সতী-স্বাধ্বী নারীকে বিবাহ করা, ৬. সহিহ্ বিবাহ।[৫৪৫] কোন পুরুষ বা নারীর মধ্যে সংগঠিত হওয়ার পরে বৈধ পন্থায় স্বামী-স্ত্রীর উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে সে মুহ্ছান বা মুহ্ছানাহ্ বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত শর্তাবলীর কোনো একটি বা সবগুলোর অবর্তমানে কোন ব্যক্তিকে মুহ্ছান বা মুহ্ছানাহ্ বলা যাবে না। সুতরাং গোলাম বা বালিগ, পাগল, অমুসলিম ও অবিবাহিত কিংবা অশুদ্ধ বিবাহিত ব্যক্তি ফাসিদ বিবাহের দ্বারা ইহ্ছান সাব্যস্ত হবে না। সহিহ্

---

৫৪১. মুহাম্মাদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (মিসর : মাতবাআতু সা'আদাহ, ১৩২৪হি.), পৃ. ৪০৫

৫৪২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*,প্রাগুক্ত,২৮৮

৫৪৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৩৩, হাদিস নং ৪৩৭৬

৫৪৪. মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারকাতী, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, (প্রথম প্রকাশ ১৪০৭ হি., ১৯৮৬ খৃ.),খ. ১, পৃ. ৪৭১

الْمُحصن هُوَ حر مُكَلّف مُسلم وطئ بِنِكَاح صَحِيح وَالْمُحصنَات المزوجات تصورا أَن زَوجهَا هُوَ الَّذِي أحصنها

৫৪৫. ইমাম যহীরুদ্দীন আবদুর রশীদ আল-ওলওয়ালিজী, *আল-ফাতাওয়াল ওলওয়ালিজিয়্যাহ*', (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপু, প্রথম সংস্করণ), অধ্যায়: কিতাবুল হুদুদ, পরিচ্ছেদ: ফি শারায়িতি সিহ্হাতিশাহাদাহ, খ. ১, পৃ. ২৪৩,

وأما الإحصان الذي يتعلق به الرجم: له شرائط ستة: البلوغ، العقل، الحرية، الإصابة بنكاح صحيح، وأن يكون كل واحد منهما بمثل صاحبه، وقت الإصابة في شرائط الإحصان، والإسلام أيضا شرط،

বিবাহের পর সঙ্গম ক্রিয়া না হলেও ইহ্ছান সাব্যস্ত হবে না। অনুরূপ স্বীয় পত্নীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলেও ইহ্ছান সাব্যস্ত হবে না। স্বীয় দাসীর সাথে সঙ্গম সম্পন্ন হওয়ার পরও ব্যক্তি মুহ্ছান রূপে পরিগণিত হবে না। ফাসিদ বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি সঙ্গম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় এর দ্বারাও ইহ্ছান সাব্যস্ত হবে না।[৫৪৬]

'কায্ফ' প্রমাণের পদ্ধতি

নিম্নের যে কোন একটি উপায়ে যিনার অভিযোগ উত্থাপনকারীর অভিযোগ আরোপ প্রমাণ করা যাবে।

১. স্বীকারোক্তি

অভিযোগকারী যদি নিজেই স্বীকার করে নেয় যে, সে যিনার অভিযোগ আরোপ করেছে, তাহলে 'কায্ফ' প্রমাণিত হবে। এ স্বীকারোক্তিতে চারবার স্বীকার করার শর্ত নেই; বরং বিচারকের এজলাসে একবার স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। কেউ স্বীকার করার পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫৪৭] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যে সব ক্ষেত্রে বান্দাহর হক জড়িত রয়েছে, তাতে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবার কোন সুযোগ নেই।

২. সাক্ষ্যপ্রমাণ

দু'জন সাব্যস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও 'কায্ফ' প্রমাণিত হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, এ ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সকলকেই পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে না।[৫৪৮]

৩. শপথ করতে অস্বীকার করা

যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি "অভিযোগ উত্থাপন করেনি" মর্মে শপথ করতে অস্বীকার করে, তাহলে এটা এ কথার প্রমাণ বহন করবে যে, সে অভিযোগ তুলেছে।[৫৪৯] এটা শাফি'ঈ ইমামগণের অভিমত।

---

৫৪৬. ফাতাওয়া ও মাসাইল, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯), পৃ. ৩০৬

৫৪৭. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৯),পৃ. ১৬৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ.৫, পৃ.৩২৮; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ.৫, পৃ.৩২

৫৪৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ. ৫, পৃ.৩২; ইবনু আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৪, পৃ.৪৪-৪৬

৫৪৯. শাফি'ঈ, আল-উম্ম, খ.৫, পৃ.১৪৪-৬; আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ,৪, পৃ.৪০৫

পঞ্চম অধ্যায়
সামাজিক সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান

প্রথম পরিচ্ছেদ : পর্দা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিবাহ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংযমশীলতা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যিনার শাস্তি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অপবাদ আরোপের শাস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ
পর্দা

ইসলামি হিজাব বা পর্দা অর্থ অবরোধ নয়। মুসলিম মহিলারা রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকেই ইসলামি পোশাক ও শালীনতাসহ ধর্মীয়, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এমনকি খ্রীষ্টান, ইহুদীসহ অন্যান্য ধর্মেও পর্দার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে হাজার হাজার অমুসলিম যুবতী ইসলাম গ্রহণ করে বোরকা বা স্কার্ফ পরিধান করে পুরো দেহ আবৃত করে চলা ফেরা করেন। তারা সকলেই বলছেন, ইসলামি পোশাকই নারী প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস। বেহায়াপনার মধ্যে রয়েছে মানসিক অস্থিরতা

ও অশান্তি । ইসলামি পর্দার মধ্যে নারী যে মানসিক তৃপ্তি, প্রশান্তি ও আনন্দ তারা লাভ করেছেন তা অতুলনীয়।[৫৫০]

আমাদের সমাজে এবং যে কোনো সমাজে অগণিত ধর্ষণ, অত্যাচার ও এসিডের ঘটনার দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, যে সকল মেয়ে পর্দার মধ্যে বেড়ে উঠেন, সাধারণত: তাঁরা মাস্তানদের বাজে কথা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকেন। সাধারণত সবচেয়ে কঠিন হৃদয়ের বখাটেও কোন পর্দানিশীন মেয়েকে উত্যক্ত করতে দ্বিধা করে। তার কঠিন হৃদয়ের এক নিভৃতকোনে পর্দানিশীন মেয়েদের প্রতি একটুখানি সম্ভ্রমবোধ থাকে।

কুরআন পর্দাকে ফরয বা অবশ্যকর্তব্য বলেছে। একে ঈমান ও ইসলামের সুস্পষ্ট দাবী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং এর গুরুত্ব ও নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত বলিষ্ঠ বর্ণনা ভংগি গ্রহণ করেছে। সূরায়ে নূর যাতে পর্দার আহকামসমূহ বর্ণিত হয়েছে তার ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য করলে তার প্রতিটি শব্দে এর শক্তিমত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব প্রতীয়মান হবে। ইরশাদ হয়েছে,

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"এ একটি সূরা, এ আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্যপালনীয় করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[৫৫১]

পর্দার পরিচয়

পর্দা আরবী 'হিজাব' শব্দের বাংলা ও উর্দু তরজমা।[৫৫২] আরবীতে বলা হয় 'হিজাব'(حجاب)। حجاب এর আভিধানিক অর্থ আবরণ, আচ্ছাদন, পর্দা, ঘোমটা, বোরকা, হেজাব ইত্যাদি।[৫৫৩] আর ইংরেজীতে 'ভেইল' (Veil)। যার আভিধানিক অর্থ অবগুণ্ঠন, মুখাবরণ নেকাব।[৫৫৪] ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক নারী-পুরুষের শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখাকেই পর্দা, হিজাব বা ভেইল বলে।[৫৫৫] কুরআন মজীদের যে আয়াতে মুসলমানদের আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলে করীম (স)-এর ঘরে নিঃসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে যাতায়াত করতে নিষেধ করেছেন, তাতে এই 'হিজাব' শব্দই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন যে, যদি ঘরের স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে তোমাদের কোন জিনিস নেয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা হিজাবের আড়াল থেকে চেয়ো। কুরআনের এ নির্দেশ থেকেই ইসলামি সমাজে পর্দার সূচনা হয়। এরপর এ প্রসংগে আর যত আয়াতই নাযিল হয়েছে, তার সমষ্টিকে 'আহকামে হিজাব' বা পর্দার বিধান বলা হয়েছে। সূরায়ে নূর ও সূরায়ে আহযাবে এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহিলারা যেন তাদের মর্যাদা সহকারে আপন ঘরেই বসবাস করে এবং জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো বাইরে নিজেদের রূপ সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করে না বেড়ায়। তাদের যদি ঘরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়, তবে আগেই যেন চাদর (কাপড়) দ্বারা তারা নিজেদের দেহকে আবৃত করে নেয়।[৫৫৬]

---

৫৫০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম*, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স,ডিসেম্বর ২০০৮), পৃ. ১৮৬

৫৫১. আন-কুরআন, সুরা আন-নূর (২৪) : ১

৫৫২. সাইয়েদা পারভীন রেজভী, *পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৩শ প্রকাশ, ২০০৫),পৃ. ৫

৫৫৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী], প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

৫৫৪. Bangla Academy English-Bangla Dictionary, ibid, P.811

৫৫৫. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৫৫৬. সাইয়েদা পারভীন রেজভী,*পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬

ইসলামি পর্দা একটি ব্যাপক ব্যবস্থা। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলী সমষ্টিকেই মূলত এককথায় 'হিজাব' বা 'পর্দা'-ব্যবস্থা বলা হয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন:

১. সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।

২. অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসারমূলক কাজে লিপ্তদেরকে শাস্তি প্রদান।

৩. সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়িমূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

৪. কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা।

৫. নারী ও পুরুষের শালীনতাপূর্ণ পোষাক পরিধান করা।

৬. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।

৭. সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া।

৮. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৫৫৭]

পর্দার উদ্দেশ্য

ইসলামে যে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, তৎসম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে আমরা তার তিনটি উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারি,

১.নারী ও পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হেফাযত করা এবং নর-নারীর অবাধ মেলাশের ফলে সমাজে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সবের প্রতিরোধ করা।

২. নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রকে পৃথক করা, যেন প্রকৃতি নারীর ওপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে, তা সে নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে।

৩. পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করা।[৫৫৮]

ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"আর তোমরা তার (রাসূলের) পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।"[৫৫৯]

উপরোক্ত আয়াতকে পর্দার আয়াত বলা হয়ে থাকে। এতে মুসলমানদেরকে পর্দার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পর্দার অন্তর্নিহিত রহস্য ও কল্যাণ বিধৃত হয়েছে।

এ আয়াত নাযিলের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বিনা বাধায় নবি করীম (স.)-এর গৃহে যাতায়াত করতেন। এ ব্যাপারে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর দারুণ আপত্তি ছিল এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট কয়েকবার আরযও করেন যে, আপনার গৃহে সকলের অবাধ যাতায়াত হচ্ছে। আপনি যদি পবিত্র সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ দিতেন, তবে ভাল হত। অবশেষে এ আয়াতটি নাযিল হলো যে, নবিগৃহে মুহাররম আত্মীয়গণ ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

নবি-এর পবিত্র পত্নীগণের সাথে কারো কোন প্রয়োজন হলে পর্দার অন্তরাল থেকে তা প্রার্থনা করতে হবে।

---

৫৫৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *খুতবাতুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৫৫৮. সাইয়েদা পারভীন রেজভী,*পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়*, প্রাগুক্ত,পৃ. ৮

৫৫৯. আল কুরআন, সুরা আহ্যাব (৩৩) : ৫৩

এ নির্দেশের পর মুসলিম রমণীগণ পর্দার সংগে গৃহে অবস্থান করতে থাকেন। সকল রমণী গৃহে পর্দা লটকিয়ে দেন এবং মুহাররম আত্মীয়গণ ব্যতীত অন্যদের গৃহে যাতায়াত বন্ধ করে দেন। মুসলিম সমাজে প্রবর্তিত এ পর্দা প্রথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও কল্যাণ বর্ণনা করে পবিত্র কুরআন বলছে-

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

"এ বিধান তোমাদের ও তাদের (নারীদের) হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র পন্থা।"

অর্থাৎ রমণীগণকে গৃহে পর্দা সহকারে অবস্থান, পুরুষের সম্মুখে কথা না বলা এবং তাদের থেকে পৃথক থাকা উভয়ের জন্য পছন্দনীয় পন্থায় যা উভয়ের হৃদয়কে অশ্লীল ধারণা ও অবৈধ চাহিদা থেকে পবিত্র থাকতে সহায়তা করে ।

সর্বজ্ঞাতা ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাআলার এ স্পষ্ট নির্দেশের পর যারা নারী ও পুরুষের সহশিক্ষা, যৌথ বৈঠক, স্বাধীন অবাধ মেলামেশার বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করছে, তাদের মতে উভয়ের অবাধ মেলামেশাতে অন্তরের পবিত্রতায় কোন পার্থক্য আসে না, মূলত তারা আল্লাহর ইলম ও হিকমতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।[৫৬০] (নাউযুবিল্লাহ)।

অন্তরকে পবিত্র রাখতে, সমাজকে যৌন অনাচার থেকে বাঁচাতে এবং পবিত্র ও যৌন পবিত্রতাকে সংরক্ষণের জন্য নিঃসন্দেহে সে পন্থাই সর্বোত্তম ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য, যা পবিত্র কুরআন 'কল্যাণকর' বলেছে। আর এর বিপরীত চিন্তা করা নিজের ঈমান নিয়ে খেলা করার নামান্তর।

পর্দার নির্দেশাবলি

ক. নারীদের প্রতি পর্দার নির্দেশনা

১.গৃহে অবস্থান করা

ইরশাদ হয়েছে যে-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ "এবং (রমণীগণ) তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর।"[৫৬১]

রমণীর কর্মক্ষেত্রের প্রকৃত সীমা হলো গৃহের চার দেয়াল। গৃহে শান্তি ও সম্মানের সাথে অবস্থান করে তার দায়িত্ব পালন করাই তার উচিত। সাধারণত গৃহের বাইরে তার যাওয়া উচিত নয়। নবি কারিম (সা.) বলেছেন-

«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا، إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»

"রমণীর তো আপাদমস্তকই পর্দা। যখন সে গৃহের বাইরে যায়, তখন শয়তান তাকে পেয়ে বসে আর যখন সে গৃহে ফিরে আসে, তখন আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হয়।"[৫৬২]

পবিত্র কুরআনের এ স্পষ্ট ও পরিষ্কার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মুসলমান কি করে কোন সাহসে স্ত্রীদেরকে গৃহের বাইরে নিয়ে যেতে চায় এবং জেদের বশবর্তী হয়ে নারীদেরকে সামাজিক ও গণ-কাজে অংশগ্রহণ করাতে চায়, কলেজে ছাত্রদের সহ-শিক্ষা দিতে চায় এবং কল-কারখানা, অফিস-আদালত ও সরকারী দফতরে পুরুষের পাশাপাশি বসিয়ে কাজ করাতে চায়?[৫৬৩]

---

৫৬০. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, অনু. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ,জুন ২০০৩), পৃ.৩৪৭

৫৬১. আল-কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৩৩

৫৬২. ইমাম আবু বকর ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯হি.), খ. ২,পৃ. ১৫৭, হাদিস নং-৭৬১৬

৫৬৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৮

২. মুখমণ্ডলের পর্দা

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৬৪]

সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রমণীগণ গৃহে শান্তি ও সম্মানের সাথে অবস্থান করে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাধা করবে। যদি বিশেষ কোন প্রয়োজনে অগত্যা তাদেরকে বের হতেই হয়, তবে তাদেরকে তাদের সমস্ত শরীর ও মুখমণ্ডল অতি যত্নসহকারে ঢেকে নিতে হবে।

আরব দেশে প্রচলন ছিল যে, যখন সম্ভ্রান্ত মেয়েরা ঘরের বাইরে যেত, তখন একটি বড় চাদর দ্বারা নিজেদের সম্পূর্ণ দেহ অবয়ব উত্তমভাবে ঢেকে নিত। সে চাদরকেই 'জিলবাব' (جلباب) বলা হয়ে থাকে। উপমহাদেশের পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ ও অন্যান্য এলাকায় এখনও সে ধরনের চাদরের প্রচলন দেখা যায় এবং একে 'ছীল' বলা হয়। এটা মোটা কাপড়ের একটি বড় ধরনের চাদর বিশেষ, যা দ্বারা শরীর অত্যন্ত সুন্দরভাবে ঢাকা সম্ভব। আমাদের এ যুগের 'বোরকা'কে তারই উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বোরকার 'নেকাব' দ্বারা মুখমণ্ডলকে পুরোপুরিভাবে ঢাকা সম্ভব, যা কুরআনের নির্দেশ।[৫৬৫]

কুরআনের উদ্দেশ্য এই যে, ভদ্র রমণীগণ যখন প্রয়োজনবোধে গৃহ থেকে বের হবেন, তখন নিজের হিফাযতের জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন কোন প্রকার কুদৃষ্টি তার উপর পড়তে না পারে। নিজের চাদর দ্বারা শরীর আবৃত করবেন এবং এর এক অংশ দ্বারা নিজের মাথা ও মুখমণ্ডল অতি উত্তমভাবে ঢেকে নেবেন। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে পরবর্তী সময়ের বড় বড় শ্রেষ্ঠ মুফাস্‌সিরগণ উপরোক্ত আয়াতের এ মর্মই বর্ণনা করেছেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী সাব্যস্ত রেছেন। আরবী অভিধানেও এ সব শব্দের ব্যবহার এভাবে পাওয়া যায় যে, যখন কোন রমণীর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরে যায়, তখন বলা হয়– أَدْنِيْ ثَوْبَكِ عَلَى وَجْهِكِ, "স্বীয় কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে নাও।" হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার মর্মও এই, তিনি বলছেন- "আল্লাহ্ তাআলা রমণীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যদি তারা কোন প্রয়োজনে শহর থেকে বাইরে যায়, তবে যেন স্বীয় চাদর দ্বারা নিজের মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করে নেয় এবং শুধু একটি চোখ খোলা রাখে।"

একদা মুহাম্মদ ইবন সীরীন (রা) হযরত উবায়দ সালমানীকে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুই না বলে নিজের চাদর দিয়ে নিজকে আবৃত করে দেখালেন, যাতে মাথা, মুখমণ্ডল ও শরীরের অন্যান্য অংশ ঢেকে গিয়েছিল, বাকী ছিল একটি চোখ।

আল্লামা যামাখশারী (রা) স্বীয় তাফসীর কাশশাফে এবং আল্লামা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহ্‌মাদ নাসাফী (রা) "মাদারিকুত্ তানযীল" (مدارك التنزيل) গ্রন্থে বলেছেন- "রমণীগণ নিজেদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করবে এবং এর এক অংশ দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ও তার আশপাশ উত্তমভাবে ঢেকে নেবে।"

হযরত ইব্‌ন জারীর (রা) বলেছেন- "ভদ্র রমণীগণ কখনো দাসীদের ন্যায় এমন পোশাক পরিধান করে ঘরের বাইরে যাবেন না যে, তাদের মুখমণ্ডল ও মাথার চুল উম্মুক্ত থাকবে। বরং তারা অবশ্যই নিজেদেরকে চাদর দ্বারা আবৃত করবেন, যাতে কোন বদমাশ তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস না করে।"

---

৫৬৪. আল-কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৫৯

৫৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

কুরআনের শব্দাবলী ও মুফাসসিরগণের ব্যাখা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুখমণ্ডলের পর্দা ফরয। রাসূল (স.)- এর যুগে যে পর্দা মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল তাতেও মুখমণ্ডলের পর্দা অবশ্যই ছিল।[৫৬৬]

৩. সুসজ্জিত হয়ে চলাফেরা না করা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াব না।"[৫৬৭]

আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম অনুধাবন করতে হলে **تبرج** ও **جاهليت** এ দুটি শব্দের স্বরূপ অবশ্যই জানতে হবে।

تبرج-এর মর্মে তিনটি কথা অন্তর্ভুক্ত-

১. নিজের মুখমণ্ডল ও শরীরের গঠন ও সৌন্দর্য লোকদেরকে প্রদর্শন করা।

২. নিজের উজ্জ্বল অলংকারদি ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও আরাম-আয়েশের সামগ্রী প্রদর্শন।

৩. নিজের চাল-চলন, গতি-বিধি ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব দ্বারা নিজকে অনন্য ও হৃদয়গ্রাহী করা।

جاهليت এর অর্থ হলো এমন রীতি-নীতি, কাজ-কর্ম যা ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইসলামি চরিত্র ও নিয়ম-কানুন এবং ইসলামি ধ্যান-ধারণার বিরোধী।

এর মর্ম এই যে, সুসজ্জিতা হয়ে বের হওয়া, পাতলা ফিন্‌ফিনে কাপড় পরে দেহ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন, চিত্তাকর্ষক অলংকারে সজ্জিত হয়ে হেলেদুলে ঘুরাফেরা করে পুরুষদের প্রলুব্ধ করা জঘন্যতম পাপাচার, যার মধ্যে প্রাক-ইসলাম যুগের লোকেরা ছিল। ইসলামি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানসিকতার সাথে এ ধরনের পাপাচারের সম্পর্ক নেই।[৫৬৮] ইসলামি সমাজনীতিতে শুধুমাত্র এর অবকাশই নেই বরং ইসলামি সমাজে এসবের চিন্তাও সুদূর পরাহত।

৪. পর-পুরুষের সাথে সুরেলা কণ্ঠে কথা না বলা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।"[৫৬৯]

ইসলাম বিনা প্রয়োজনে মহিলাদের কোন পর-পুরুষের সাথে কথোপকথন পছন্দ করে না। তবে হাঁ, যদি একান্ত প্রয়োজনে কথা বলতেই হয়, তবে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে এবং এ নির্দেশনা দিয়েছে যে, কণ্ঠস্বরে মধুরতা থাকতে পারবে না যাতে দুষ্ট লোকের মনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য উঁকি দেয় এবং সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির লোলুপ দৃষ্টি জাগ্রত হয়। বরং সরল, সাদাসিধে রীতিতে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলতে হবে।

বিনা প্রয়োজনে পর-পুরুষকে মহিলাদের কণ্ঠ শুনানো নবি কারিম (স.) পছন্দ করতেন না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স.) মহিলাদেরকে আযান দিতে নিষেধ করেছেন এবং যদি কোন মহিলা ইমামের পিছনে জামাআতে নামাযরত থাকেন এবং ইমাম কোন ভুল করে বসেন, তবে তাকে সুবহানাল্লাহ্' বলারও অনুমতি দেননি। বরং তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন যে, ইমামকে সতর্ক করার জন্য সে মহিলা হাত তালি দিয়ে শব্দ করবেন।

---

৫৬৬. ইউসুফ ইসলাহী, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯

৫৬৭. আল-কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৩৩

৫৬৮. ইউসুফ ইসলাহী, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫১

৫৬৯. আল কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৩২

৫. অলংকারের ঝংকার না শোনানো

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"তারা (নারীগণ) যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।"[৫৭০]

আয়াতের মর্ম এই যে, ভদ্র রমণীগণ যদি কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যান। তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যেন বের হন, যাতে তাদের কোন গতিবিধি কোন পর-পুরুষের যৌন চাহিদার উদ্রেকের কারণ না হয়। নবি করীম এ আদেশকে শুধুমাত্র অলংকারের হৃদয়গ্রাহী ঝংকার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং তিনি বলেছেন- যে রমণী সুগন্ধি মেখে রাস্তায় এই উদ্দেশ্যে বের হয় যে, তার সুগন্ধি লোকেরা উপভোগ করবে, তবে সে রমণী এরূপ, এরূপ। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন- নবি এমন রমণীদের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৬. নারীদের দৃষ্টি সংযত করা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

"আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।"[৫৭১]

"দৃষ্টি সংযত করা" উক্তিটির মর্ম এই যে, নারীরা সে সব বস্তু থেকে তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে, যেসব দেখা বৈধ নয়। ঘটনাচক্রে যদি পর-পুরুষের সম্মুখে পড়ে যায়, তবে সাথে সাথেই দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। যদি কোন পুরুষ কিংবা মহিলার গুপ্ত অংগে দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে একদম দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দৃষ্টির অসংযততা ফিত্নার সৃষ্টি করে। নবি কারিম (স.) চোখের নজরকে যিনার সাথে তুলনা করেছেন। মুহাররম পুরুষগণ ব্যতীত অপর পুরুষদেরকে মন ভরে দেখা কোন বেলাতেই বৈধ নয়। পথ চলতে কিংবা কোন প্রয়োজনে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে এতে কান দোষ নেই। তবে এ কথার মর্মার্থ কখনো নয় যে, নারীগণ তাদের দৃষ্টিকে সংযত করার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন।[৫৭২] নবি কারিম বলেছেন- "কোন পুরুষ কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গের প্রতি তাকাবে না এবং কোন মহিলাও কোন মহিলার গুপ্তাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।

৭. লজ্জাস্থানের[৫৭৩] হিফাযত করা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন-وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ "এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"[৫৭৪]

লজ্জাস্থানের হিফাযতের মর্ম শুধুমাত্র পাপাচার থেকে বেঁচে থাকাই নয়, বরং এর মর্ম হলো, সার্বিকভাবে আপন সতীত্বের হিফাযত বা সংরক্ষণ করা।

মহিলাদের 'সতর' মুখ ও হাত ব্যতীত পুরো শরীর। মুখ ও হাতের কব্জি ব্যতীত শরীরের অন্য কোন অংশ নিজ স্বামী ব্যতীত অপর কারো সম্মুখে কখনো খোলা যাবে না। এমনকি নিজ পিতা ও ভাইদের সম্মুখেও তা খোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। নবি কারিম (স.) রমণীদের এমন পোশাক পরতে অত্যন্ত কেঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যা এমন আঁটসাঁট, যা দ্বারা শরীরের গঠন পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়, অথবা এমন পাতলা ফিনফিনে পোশাক, যা দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিষ্কার দেখা যায়। একদা নবি এর শালিকা হযরত আসমা (রা) পাতলা কাপড় পরে তার সম্মুখে এলে তিনি সাথে সাথে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে

---

৫৭০. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

৫৭১. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

৫৭২. ইউসুফ ইসলাহী,*আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৩

৫৭৩. শরীরের যে সব স্থান ঢেকে রাখা অবশ্যকর্তব্য। মহিলাদের মুখ ও হাতের কব্জি ব্যতীত পুরো শরীর নিজ স্বামী ব্যতীত কোন পুরুষের সামনে তা খোলা বৈধ নয়। পুরুষের 'সতর' হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মহিলার সম্মুখে তা খোলা বৈধ নয়।

৫৭৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

নিলেন এবং বললেন- "আসমা, যখন রমণী বয়োঃপ্রাপ্তা হয়, তখন তার হাত ও মুখ ব্যতীত শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন জায়েয় নয়।" তবে হাঁ, গৃহস্থালীর কাজ-কর্ম করতে শরীরের যে সব অংশ খোলা অবশ্যই জরুরী যেমন- হাতের কব্জির উপর অংশ অথবা পায়ের গোঁড়ালির কিছু অংশ, তা ভাই ও পিতার সম্মুখে খুললে কোন দোষ নেই।

৮. নিজের সাজসজ্জা গোপন রাখা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"এবং তারা (নারীগণ) যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ (অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক ও প্রসাধনী) প্রদর্শন না করে।" [৫৭৫]

زينت আবরণ দ্বারা শরীরের সে সব অংশকেও বুঝায়, যা বিভিন্নভাবে সাজানো যেতে পারে বা সাজানো হয়ে থাকে। যেমন- মাথার চুল, চক্ষুদ্বয়, গ্রীবা, কান, হাত, পা ইত্যাদি এবং তাতে এসবও অন্তর্ভুক্ত, যার দ্বারা সাজসজ্জা করা হয়ে থাকে। যেমন- হাত, পা, নাক, কান, গ্রীবাদেশের অলংকার, সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক, সুরমা, দাঁতের মাজন, মেহেন্দী ইত্যাদি।[৫৭৬]

নারীর স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত দাবী অনুসারেই সাজ-সজ্জা করা বৈধ। সুন্দরী হওয়া ও সুন্দরী সাজা প্রত্যেক নারীর মজ্জাগত ইচ্ছা। সময়ের ব্যবধানে আকৃতিগতভাবে সাজ গোছের রকমফের হতে পারে, কিন্তু তার স্বভাবগত ও প্রকৃতিগতভাবে তা মূলত একই রকম। সেটা এই যে, প্রত্যেক নারীই পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে চায়, আর জন্মগত সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট না হলে সাজ সজ্জা দ্বারা সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করতে চায়।

ইসলাম এই সহজাত ইচ্ছাকে প্রতিহত করে না। সে শুধু একে সুশৃংখল ও পরিশীলিত করে। সে চায় প্রত্যেক নারী তার সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য শুধু একজন পুরুষকে দেখতে দিক, যে তার জীবন সংগী। কেননা এই জীবন সংগী তার জীবনের এমন অনেক কিছুই দেখবার অধিকারী, যা অন্য কেউ দেখবার অধিকারী নয়। তবে তার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জার কিছু অংশ জীবন সংগী ছাড়া মুহররম ও এই আয়াতের পরবর্তী অংশে বর্ণিত পুরুষরাও দেখতে পারে। কেননা তাতে এসব পুরুষের মধ্যে কামোত্তেজনার সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু এমনিতেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা হচ্ছে হাত ও মুখের সৌন্দর্য। এটুকু উন্মুক্ত করা জায়েয আছে। কারণ রসূল (স.) হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমাকে বলেছিলেন, হে আসমা, একজন বয়োঃপ্রাপ্তা মেয়ের হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া আর কিছু খোলা বৈধ নয়।[৫৭৭]

৯. মাথা ও বক্ষদেশ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن

"আর তাদের (নারীদের) গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[৫৭৮]

সাধারণভাবে শোভা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের নিষেধাজ্ঞার পর তাকীদ করা হয়েছে যে, দো'পাট্টা বা ওড়না দিয়ে থাকতে হবে এবং বক্ষদেশে আঁচল টেনে দিতে হবে –যাতে মাথার চুল, কান ও গলদেশের অলংকার ও বুকের বাড়তি অংশ দেখা না যায়।[৫৭৯] মূলত রমণীদের দেহের এ অঙ্গগুলোই বিশেষভাবে বিপরীত

---

৫৭৫. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

৫৭৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*, অনু. মুহিউদ্দীন খান, (মদীনা মুনাওয়ারা খাদেমূল হারামাইন কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প), পৃ. ৯৩৯

৫৭৭. সাইয়েদ কুতুব শহীদ,*তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ৪র্থ সংস্করণ,জুন ২০০৩), ১৪তম খন্ড, পৃ. ১২৯

৫৭৮. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

৫৭৯. ইবনে কাছীর, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, প্রাগুক্ত,খ.৮,পৃ. ৯৭; মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীর মা'আরেফুল কোরআন*), প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৪০

লিঙ্গের জন্য পরম আকর্ষণীয় হয়ে থাকে এবং ঐ সব অঙ্গ আবৃত না করলে বা অসতর্ক হলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে ঐ সব অঙ্গ আবৃত করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। এতে কোন প্রকার গাফলতি করা চলবে না।

তারপর ঠিক অনুরূপ শব্দই "নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না" পুনঃ বলা হয়েছে এবং ঐ সব মুহাররম আত্মীয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের মাঝে সৌন্দর্য প্রকাশ করা যেতে পারে। এই ধারাবাহিক বর্ণনা ও তাকীদ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও আইনত রমণীগণ মুহাররম আত্মীয়দের সম্মুখে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে তাদের অযথা কষ্টে ফেলা হয়নি, তথাপি মাথা, গ্রীবা ও বক্ষদেশের ব্যাপারে লজ্জা ও শালীনতার দাবী হলো যে, আইনের নমনীয়তা সত্ত্বেও তারা যেন সাধারণ অবস্থায়ও মুহাররম আত্মীয়দের সম্মুখে চাদর বা ওড়না আবৃত হয়ে যায়। হাঁ, যদি কখনো প্রয়োজনে কিংবা হঠাৎ দো'পাট্টা পড়ে যায় এবং সে সব আত্মীয়ের কারো সম্মুখে পড়ে যায়, তবে অহেতুক কষ্ট ও চিন্তার কারণ নেই। তবে হাঁ, সাধারণভাবে গৃহে ওড়না বা দো'পাট্টা না পরে, বে-পরোয়াভাবে মাথা, বক্ষদেশ ও গ্রীবা খোলা রেখে চলফেরা করা উচিত নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলেন- "রমণীগণ একমাত্র নিজের স্বামীর সম্মুখেই দো'পাট্টা খুলে আসতে পারেন।"[৫৮০]

প্রাক-ইসলামি যুগে রমণীগণ মাথার উপর এক ধরনের পট্টি বাঁধতেন, যার বাঁধন পিছন দিকে চুলের খোপার সাথে বাঁধা থাকত, সম্মুখ দিকের গ্রীবা উম্মুক্ত থাকত এবং বক্ষদেশে জামা ব্যতীত আর কোন কাপড় থাকত না, পেছনে দু'তিনটি চুলের খোঁপা ঝুলতে থাকত।

সূরা নূরের উপরোক্ত আয়াতসমুহ নাযিল হলে মুসলমান নারীগণ পর্দা প্রথার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হলেন, যার উদ্দেশ্য নারীগণ যেন তাদের সৌন্দর্য্য ভালভাবে আবৃত করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে নয় যে, তারা যেন আরো অধিক সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শনের সুযোগ পান।

১০. বৃদ্ধা রমণীগণের জন্য চাদর খোলার অনুমতি

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ

"আর বৃদ্ধা নারী- যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের চাদর খোলে।"[৫৮১] আয়াতের "القواعد من النساء"-এর মর্ম এমন সব মহিলা, যারা যৌবনকাল পার হয়ে বার্ধক্যে পৌঁছেছেন, যাদের যৌন চাহিদার মৃত্যু হয়েছে, যাদেরকে দেখে পুরুষদের কোন যৌন তাড়নার উদ্রেক হয় না, যারা সন্তান ধারণে অক্ষম, এবং যাদের কারো সাথে বিবাহের আশা নেই।

এমন বৃদ্ধা নারীগণ যদি তাদের চাদর বা দো'পাট্টা খোলে খালি মাথায় থাকেন, তবে এতে তাদের কোন অপরাধ নেই। তবে শর্ত তারা সেজেগুজে সৌন্দর্য প্রদর্শন করতে পারবেন না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ "যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী না হয়।"[৫৮২]

অর্থাৎ, চাদর খোলার অনুমতি একমাত্র এমন বৃদ্ধাদেরই জন্য, যাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ নেই। সাজসজ্জার প্রতি যাদের সামান্যতম আগ্রহ নেই। তবে যদি তাদের মধ্যে এখনও সৌন্দর্য প্রদর্শনের আকর্ষণ প্রবল থাকে, তাহলে তারা চাদর খোলার অনুমতির অধিকার পাবেন না।[৫৮৩]

---

৫৮০. ইমাম আলাউদ্দীন খাযেন, *লুবাবুত তাবীল ফি মা' আলিমিত তাবীল*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫হি.), খ. ৩, পৃ. ২৯২

৫৮১. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৬০

৫৮২. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৬০

৫৮৩. ইউসুফ ইসলাহী,*আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৬

১১. চাদর দিয়ে চলাই উত্তম

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ "তবে চাদর ভালো থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।"[৫৮৪]

বৃদ্ধা রমণীদের চাদর না পরে এবং উম্মুক্ত মাথায় থাকার অনুমতি থাকলেও যদি কেউ অতি সাবধানতা অবলম্বন ও পর্দার পূর্ণ হক আদায় করার লক্ষ্যে তা না করে অর্থাৎ চাদর পরিধান করে, তবে তাই তাদের জন্য উত্তম।

খ. পর্দার ব্যাপারে পুরুষদের প্রতি নির্দেশনা

পর্দার উপরোক্ত আহ্কাম বর্ণনার সাথে সাথে পবিত্র কুরআন পুরুষদেরকেও কিছু মৌলিক নির্দেশনা দিয়েছে, যার উপর আমল করলেই পর্দার সত্যিকার নৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে, যার জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে।

১.পুরুষগণ তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে

ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।"[৫৮৫]

দৃষ্টি সংযত রাখার মর্ম হল- কোন পুরুষ নিজের স্ত্রী ও মুহাররম রমণীগণ ব্যতীত অপরিচিত কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না, কারো সতরের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং এমন সব কুদৃষ্টি থেকে নিজকে বিরত রাখবে যা পাপাচারের প্রেরণা যোগায়।

নবি কারিম (স.) বলেছেন, "কোন মুসলমানের দৃষ্টি কোন মহিলার সৌন্দর্যের প্রতি পড়লে আর সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ্ তা'আলা তার ইবাদতসমূহে আনন্দ সৃষ্টি করে দেন।"[৫৮৬]

নবি কারিম (স.) হযরত আলী (রা)-কে উপদেশ দিলেন,

" يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ "

"হে 'আলী! একবার দেখার পর পুনরায় তাকাবে না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি ক্ষমার্হ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টি নয়।"[৫৮৭]

হযরত জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) একবার নবি কারিম (স.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে কি করব ? তিনি বললেন- সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।"

মূলত দৃষ্টির অসংযততা সকল পাপাচার ও অশ্লীলতার মূল। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে সকল মুসলমান পুরুষকে এই মৌলিক হিদায়াত দিয়েছে যে, "নিজের দৃষ্টি সংযত রাখ এবং দৃষ্টির ভ্রষ্টামি থেকে বিরত থাক।"

২. নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করা

ইরশাদ হয়েছে,

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

---

৫৮৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৬০

৫৮৫. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩০

৫৮৬. ইউসুফ ইসলাহী, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭

৫৮৭. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিছ, প্রথম সংস্করণ,১৯৯৫) হাদিস নং ২২৯৯১

"এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাযত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।"[৫৮৮]

উপরোক্ত নির্দেশের মর্ম শুধুমাত্র এতটুকুই নয় যে, অবৈধ যৌনাচার থেকে বেঁচে থাক, বরং উদ্দেশ্য এও যে, নিজের লজ্জাস্থান অপর কারো সম্মুখে খুলবে না। পুরুষের জন্য তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গকে নিজ স্ত্রী ব্যতীত কারো সম্মুখে খোলা জায়েয় নয়।[৫৮৯] লজ্জা, শালীনতা ও পবিত্রতার দাবী হলো- পুরুষ ও নারী তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত অবশ্যই করবে। উলঙ্গতা ও নগ্নতাকে সর্বাবস্থায় পরিহার করবে এবং এ কোন অসতর্কতা অবলম্বন করবে না, যা তাকে যৌন পাপাচারের দিকে ধাবিত করতে পারে।

পবিত্র কুরআন মু'মিন নর ও নারীর মৌলিক গুণাবলী এই বলেছে যে, তারা উলঙ্গপনা, নগ্নতা ও বেহায়াপনা থেকে নিজের লজ্জাস্থানসমূহকে হিফাযত করে থাকে। ইরশাদ হয়েছে-

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ... أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"আর যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী... তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।"[৫৯০]

পর্দার আহকাম ও সীমা

১.আত্মীয়–স্বজন থেকে পর্দা

পর্দার আহকাম ও সীমা জানতে হলে পুরুষ আত্মীয়–স্বজনের প্রকারভেদ ও সম্পর্কের বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞাত হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ তিন শ্রেণীর হতে পারে-

১. যাদের সাথে আদৌ কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এমন পুরুষ। এদের বিষয়ে নারীকে অবশ্যই পূর্ণ পর্দা করতে হবে। এমন পুরুষ থেকে নারী কেবল তার শরীরকেই গোপন রাখবে না, বরং বিনা প্রয়োজনে তাদেরকে নিজের কণ্ঠস্বরও শোনাবে না।

২. এমন মুহাররম আত্মীয়–স্বজন যাদেরকে বিবাহের বিষয়ে চিরস্থায়ী হুরমত (নিষেধাজ্ঞা) রয়েছে, তাদের সম্মুখে রমণীগণ তাদের সম্পূর্ণ সাজসজ্জা সহকারে স্বাধীনভাবে যেতে পারে। যেমন: পিতা, ভাই, পুত্র, শ্বশুর, ভাগ্নে, ভাতিজা, জামাতা, রেযাঈ আত্মীয় ইত্যাদি। এবং নিজ স্বামী থেকে শোভা-সৌন্দর্য গোপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৩. মুহাররম নয় এমন সব আত্মীয়–স্বজন যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনের হুরমত (নিষেধাজ্ঞা) চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ যাদের সাথে একজন কুমারী অথবা বিধবার বিবাহ জায়েয আছে। এরা সম্পূর্ণরূপে পর-ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় যে, তাদের সাথে পর-পুরুষের মত পর্দা করতে হবে এবং না তারা মুহাররম আত্মীয়–স্বজনের মত যে, তাদের সম্মুখে স্ত্রীগণ স্বাধীনভাবে নির্দ্বিধায় নিজের শোভা-সৌন্দর্য প্রদর্শন করে যেতে পারে। এদের বিষয়ে পর্দার সঠিক পরিসীমা কি হবে? এ বিষয়ে নবি কারিম (স.)-এর পূত-পবিত্র জীবন চরিত্রে আমরা পথ-নির্দেশনা পেয়ে থাকি যে, তাদের বিষয়ে পর্দার সীমা নির্ধারণে উভয়ের (পুরুষ ও মহিলার) অবস্থা, বয়স, আত্মীয়তার শ্রেণীভেদ, স্বভাব-চরিত্র এবং বংশীয় সম্পর্ক প্রভৃতির প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

---

৫৮৮. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩০

৫৮৯. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, *তফসীরে নুরুল কোরআন*, (ঢাকা: আল-বালাগ পাবলিকেশন্স,তৃতীয় প্রকাশ,মার্চ ২০০৮), ১৮তম খণ্ড, পৃ.২০৬

৫৯০. আল-কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৩৫

হযরত আসমা (রা) নবি কারিম (স.)-এর শালিকা ছিলেন। তবু তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত নবি (স.)-এর সম্মুখে আসতেন।

এমনিভাবে হযরত উম্মে হানী (রা) যিনি আবু তালিবের কন্যা এবং নবি (স.)-এর চাচাতো বোন ছিলেন, সদা-সর্বদা তিনি তার সম্মুখে আসতেন।

কিন্তু সাথে সাথে আমরা নবি কারিম -এর জীবনে এমন ঘটনাও দেখতে পাই যে, রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) স্বীয় পুত্র ফযলকে এবং নবি (স.) এর একজন চাচাত ভাই রাবী'আ ইব্ন হারিছ স্বীয় পুত্র আবদুল মুত্তালিবকে রাসূল (স.)-এর খিদমাতে একথা বলে পাঠাতেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়েছ, যখন পর্যন্ত তোমরা কোন উপার্জন না করতে পারবে, তখন পর্যন্ত তোমাদের বিবাহ হবে না। সুতরাং তোমরা রাসূল (স.)-এর খিদমাতে গিয়ে উপার্জনের কথা বল। তাঁরা উভয়ে হযরত যয়নাব (রা)-এর গৃহে নবি (স.)-এর খিদমাতে হাযির হতেন। হযরত যয়নাব (রা) ফযল-এর সাক্ষাত ফুফাত বোন ছিলেন এবং আবদুল মুত্তালিব-এর পিতা রাবী'আ ইব্ন হারিছ-এর সাথেও ঠিক তার সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

তবু হযরত যয়নাব (রা) উভয়ের সম্মুখে আসতেন না এবং নবি (স.)-এর উপস্থিতিতে তাঁদের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকেই কথা বলতেন।[৫৯১]

২. মুহাররম আত্মীয়–স্বজন

মুহাররম আত্মীয়–স্বজন হলেন তারা, যাদের সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ হারাম। পবিত্র কুরআন তাদের সাথে পর্দা না করার অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ রমণীগণ তাদের সম্মুখে স্বীয় শোভা-সৌন্দর্যসহ স্বাধীনভাবে আসতে পারেন। পবিত্র কুরআন এমন মুহাররম আত্মীয়দের যে তালিকা দিয়েছে তাতে- চাচা, মামা, জামাই ও রিযাঈ আত্মীয়দের উল্লেখ নেই। তবে নবি কারিম (স.) কুরআনের পেশকৃত তালিকার যে মর্ম বুঝেছেন এবং তা থেকে যে মৌলনীতি গ্রহণ করেছেন তা এই যে, যে সব আত্মীয়ের সাথে একজন মহিলার বিবাহ হারাম, তারা সকলেই সেই আয়াতের আদেশের অন্তর্ভুক্ত। তারা ব্যতীত অপর সকল পুরুষ চাই তারা পর-পুরুষ হোক কিংবা আত্মীয় হোক, তাদের সম্মুখে কোন মহিলা আপন সাজ-সজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না এবং না তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে। রাসূল (স.) তাঁর জীবনে কখনও কোন পর-মহিলার শরীরে হাত লাগাননি। তিনি মহিলাদের থেকে বায়আত নিতেন, তবে তা শুধুমাত্র কথা দ্বারা।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূর এর **৩১** নং আয়াতে মুহাররমদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে:

স্বামী

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

"এবং তারা যেন তাদের স্বামী ব্যতীত কারও নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে।"[৫৯২]

স্ত্রীলোকদেরকে যে সব আত্মীয়ের নিকট তাদের শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে স্বামীরও উল্লেখ আছে। তবে এর মর্ম কখনো এ নয় যে, এ বিষয়ে স্বামী ও অপরাপর আত্মীয়গণ সমান। উল্লেখ্য যে, স্ত্রীগণ তাদের যে সব সৌন্দর্য স্বামীর নিকট প্রকাশ করতে পারেন তা কখন অন্যদের সামনে করতে পারেন না। তদুপরি স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সকল প্রকার আবরণ, শোভা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারেন। ইসলামি শরীআত তাদেরকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর

---

৫৯১. ইউসুফ ইসলাহী,*আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*,প্রাগুক্ত,পৃ.৩৫৯

৫৯২. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

মুহাররম আত্মীয়দের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের যে অনুমতি দিয়েছে তার মর্ম শুধু এই যে, স্ত্রীগণ তাদের মাঝে নির্দ্বিধায় স্বাধীনভাবে থাকবে।

পিতা

ইরশাদ হয়েছে- أَوْ آبَائِهِنَّ "অথবা তাদের পিতাদের সম্মুখে।" পিতাদের অর্থে দাদা, দাদার পিতা, নানা, নানার পিতা তদূর্ধ্ব সবাই অন্তর্ভুক্ত।

শ্বশুর

ইরশাদ হয়েছে- أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ "অথবা তাদের স্বামীদের পিতাদের সম্মুখে স্বামীর দাদা (পিতামহ), দাদার পিতা (প্রপিতামহ) এবং নানা (মাতামহ) ও নানার পিতা (প্রমাতামহ) এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

পুত্র

পবিত্র কুরআনের বাণী- أَوْ أَبْنَائِهِنَّ "অথবা তাদের পুত্রদের সম্মুখে।" পুত্রদের মধ্যে পৌত্র, প্রপৌত্র এবং দৌহিত্র ও প্রদৌহিত্র শামিল রয়েছে এবং এ বিষয়ে নিজের ও সতীনের পুত্রের কোন পার্থক্য নেই। উপরন্ত জামাইও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

সতাই পুত্র

কুরআনের বাণী- أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ "অথবা নিজ স্বামীর পুত্রদের সম্মুখে।"

ভাই

কুরআনের নির্দেশ- أَوْ إِخْوَانِهِنَّ "অথবা আপন ভাইদের সম্মুখে।" ভাই বলতে আপন কিংবা বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় ভাইও অন্তর্ভুক্ত।

ভ্রাতুষ্পুত্র

ইরশাদ হয়েছে, أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ "স্বীয় ভ্রাতুপুত্রদের সম্মুখে।" ভাইয়ের পৌত্র, প্রপৌত্র এবং দৌহিত্র ও প্রদৌহিত্র সবাইর একই হুকুম।

ভাগ্নে

আল্লাহ্ বলেন, أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ "অথবা নিজ ভাগ্নেদের সম্মুখেও।" বোনের পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র, প্রদৌহিত্র সবাইর একই হুকুম। উপরন্ত ভাই ও বোনের পৌত্র ও দৌহিত্রগণও এ আদেশের মধ্যে শামিল। তিন প্রকারের ভাই ও বোন এই আদেশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

আত্মীয় নয়, কিন্তু গৃহ-জীবনে যাদের সাথে সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাত হয়

এমন লোকদের বিষয়ে বর্ণনা আসছে যারা মূলত আত্মীয় নয়, কিন্তু গৃহ-জীবনে তাদের সাথে সার্বক্ষণিক দেখা-সাক্ষাত মেলামেশা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন মহিলাদের অযথা কষ্টে ফেলে দেয়নি। বরং এমন ব্যক্তিদের সম্মুখে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেছে। কেননা, তাদের সম্মুখে এলে পর্দার অন্তর্নিহিত কল্যাণের কোন ক্ষতি হয় না। তারা হলেন-

একই সাথে উঠা-বসা নারীগণ

ইরশাদ হয়েছে- أَوْ نِسَائِهِنَّ "অথবা একই সাথে উঠা-বসা করে এমন নারীগণের সম্মুখে।"

"নিজের সাথে প্রায়ই উঠা-বসা করে এমন নারী" বলতে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, ভালভাবে যাদের বিষয়ে জানাশুনা বা পরিচিতি আছে, গৃহস্থালীর কাজকর্মে সাহায্যকারিণী, যারা শালীনতাবোধসম্পন্না, ভদ্র, পবিত্র, সচ্চরিত্র, তাদের সাথে মুসলিম রমণীগণ স্বাধীনভাবে নির্দ্বিধায় দেখা-সাক্ষাত করতে পারেন এবং যে সব মহিলা উদ্ভ্রান্ত, বেহায়া, অসচ্চরিত্র, অভদ্র, তাদের সাথে মুসলিম রমণীগণ অবশ্যই পর্দা করবেন এবং যে সব মহিলার স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে নিজেদের কোন জ্ঞান নেই, তাদের সাথেও মুহাররম নয় এমন আত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ হাত ও মুখমণ্ডল ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ও সৌন্দর্য তাদের থেকে গোপন করতে হবে।

স্বীয় মালিকানাধীন দাস-দাসী

ইরশাদ হয়েছে,

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ "অথবা স্বীয় মালিকানাধীনদের[৫৯৩] সম্মুখে।" অর্থাৎ সে সব দাস-দাসী, যার পর মালিকানাধীন।

যৌন কামনা রহিত সেবক

ইরশাদ হয়েছে,

أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

"অথবা এমন আশ্রিত পুরুষগণ যাদের যৌন কামনা রহিত- তাদের সম্মুখে।"

কুরআনের উপরোক্ত শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, মুহাররম পুরুষগণ ব্যতীত মহিলাগণ যেসব পুরুষের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্যসহ স্বাধীন ও নিঃসংকোচে যেতে পারেন তাদের মধ্যে অবশ্যই দুটি বিষয় পাওয়া একান্তই আবশ্যক।

১. সে হবে অধীনস্থ ও মালিকনাধীন।

২. যার মধ্যে যৌন কামনা ও লালসা নেই।

অর্থাৎ এমন সরল, সাদাসিধে বুদ্ধি-বিবেকহীন পুরুষ যে তার অধীনস্থ হওয়া, অপরের মালিকানাধীন হওয়া, দরিদ্রতা, বৃদ্ধাবস্থা, শারীরিক দুর্বলতা অথবা বুদ্ধিহীনতার কারণে ঘরের রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করারও হিম্মত রাখে না এবং কোন প্রকার কুখেয়াল অন্তরে রাখার অবস্থাও তার নেই।

নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক

ইরশাদ হয়েছে,

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ "অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালকদের সম্মুখে।"[৫৯৪]

অর্থাৎ সেসব অল্পবয়স্ক বালক যাদের মাঝে এখনো বিপরীত লিঙ্গের অনুভূতি ও আকর্ষণ জাগ্রত হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রমণীগণ একমাত্র এমন সব বালকের সম্মুখে নিজেদের শোভা ও সৌন্দর্য সহকারে যেতে পারেন, যাদের বয়স দশ কি বার বছরের বেশী নয়। এর চেয়ে বেশী বয়সের বালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হলেও তাদের মাঝে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হতে শুরু করে বিধায় তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়!

নারী ও প্রগতি

যখন 'নারী প্রগতি', 'নারী মুক্তি', 'নারী স্বাধীনতা' ইত্যাদি নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে বলা হয় এবং নারীদের ইসলামি পর্দা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলে ওঠে- এগুলো প্রগতি পরিপন্থী, এগুলো সেকেলে জিনিস, বিজ্ঞানের যুগে এসব অচল। এগুলো দিয়ে উন্নতি করা যাবে না, এভাবে আমাদের সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, মৌলবাদীরা দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। তারা বলে এবং বুঝাতে চায়, পশ্চিমা বিশ্বে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার যে কালচার এখন চালু হয়েছে তার ফলেই

---

৫৯৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী ও ইমাম আবু হানীফা (র) মালিকানাধীন বলতে শুধুমাত্র দাসীদের বুঝাতে চান। তাঁদের মতে স্বীয় দাসদের সম্মুখেও পর্দা করতে হবে। তবে হযরত আইশা (রা), উম্মে সালামা (রা) এবং কোন কোন আহলে বায়ত ইমামের মত এই যে, মালিকানাধীন *(مملوك)* বলতে দাস-দাসীদেরকেই বুঝায়। তাঁদের মতে, স্ত্রীগণ তাঁদের দাসদের সম্মুখে পর্দা ব্যতিরকে যেতে পারবেন।

৫৯৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩১

তারা উন্নতি করেছে। কাজেই আমাদেরকেও উন্নতি করতে হলে সে রকম খোলামেলা কালচার চালু করতে হবে। কিন্তু এ রকম অবাধ মেলামেশার দ্বারা কী আদৌ উন্নতি করা সম্ভব? তারা কী এসব কারণে উন্নতি করতে পেরেছে? বরং তাদের উন্নতির মূলে আছে সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, সময়ানুবর্তিতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী। কিন্তু এ সবই তো ইসলামের শিক্ষা।[৫৯৫]

ইসলাম মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করার দরুন নারীকে শুধু পুরুষের সমান মর্যাদাই দেয়নি; বরং কোন কোন পুরুষের চাইতেও বেশী মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু এটাকে আমরা প্রগতির অন্তরায় বলে উপেক্ষা করছি। আমাদের দাবি হচ্ছে নারী মাতৃত্বের গুরু দায়িত্বও পালন করবে, ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে জেলার শাসন কার্য পরিচালনা করবে এবং নর্তকী ও গায়িকা হয়ে আমাদের চিত্তবিনোদনও করবে। কী অদ্ভুত আমাদের খেয়াল!

বস্তুত আমরা নারীর ওপর দায়িত্বের এরূপ দুরূহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি, যার ফলে সে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারছে না। আমরা তাকে এমন সব কাজে নিযুক্ত করেছি, যা জন্মগতভাবেই তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয়, আমরা তাকে তার সুখের নীড় থেকে টেনে এনে প্রতিযোগিতার ময়দানে দাড় করাচ্ছি, যেখানে পুরুষের মুকাবিলা করা তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়াবে যে, প্রতিযোগিতামূলক কাজে সে পুরুষের পেছনে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে। আর যদি কিছু করতে সক্ষম হয় তবে তা নারীত্বের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়েই করতে হবে। তথাপি এটাকেই আমরা 'প্রগতি' বলে মনে করি, আর এই তথাকথিত প্রগতির মোহেই আমরা ঘর-সংসার ও পারিবারিক জীবনের মহান কর্তব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছি। অথচ এই ঘর সংসারই হচ্ছে মানব তৈরীর একমাত্র কারখানা। এ কারখানার সাথে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরির কারখানার কোন তুলনাই চলে না। কারণ এ কারখানা পরিচালনার জন্যে যে বিশেষ ধরনের গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা আবশ্যক, প্রকৃতি তার বেশীর ভাগ শক্তিই দিয়েছেন নারীর ভেতরে। এ কারখানার পরিসর বিস্তৃত কাজও অনেক। যদি কেউ পরিপূর্ণ দায়িত্বানুভূতি সহকারে এ কারখানার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তার পক্ষে বাইরের দুনিয়ায় নযর দেয়ার আদৌ অবকাশ থাকে না; বস্তুত এ কারখানাকে যতখানি দক্ষতা ও নৈপূণ্যের সাথে পরিচালনা করা হবে, ততখানি উন্নত ধরনের মানুষই তা থেকে বেরিয়ে আসবে। কাজেই এ কারখানা পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা ও ট্রেনিংই নারীর সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। এ জন্যেই ইসলাম পর্দা প্রথার ব্যবস্থা করেছে। নারী যাতে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথে চালিত না হয় এবং পুরুষও যাতে নারীর কর্মক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে প্রবেশ করতে পারে, তাই হচ্ছে পর্দার লক্ষ্য।[৫৯৬]

আমরা আজ তথাকথিত প্রগতির মোহে পড়ে পর্দার এ বিধানকে ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছি। কিন্তু আমরা যদি এ উদ্দেশ্যে অটল থাকতে চাই, তাহলে এর পরে দু'টি পথের যে কোন একটি আমাদের অবলম্বন করতে হবে, হয় ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থার সমাধি রচনা করে আমাদের হিন্দু কিংবা খৃষ্টানদের ন্যায় নারীকে দাসী ও পদসেবিকা বানিয়ে রাখতে হবে, নতুবা দুনিয়ার সমস্ত মানব তৈরীর কারখানা ধ্বংস হয়ে যাতে জুতা কিংবা পিস্তল তৈরীর কারখানা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ইসলামের প্রদত্ত জীবন বিধান ও সামাজিক শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে চুরমার করে দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং পারিবারিক ব্যবস্থাকে বিপর্যয়ের কবল থেকে বাচিয়ে রাখা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

---

৫৯৫. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৫৯৬. সাইয়েদা পারভীন রেজভী,*পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়*,পৃ. ১৪

আমরা প্রগতি বলতে যাই বুঝি না কেন, কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে আমাদের সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন যে, আমরা কি হারিয়ে কি পেতে চাই। প্রগতি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর কোন নির্দিষ্ট কিংবা সীমাবদ্ধ অর্থ নেই। মুসলমানরা এককালে বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্তা ছিল। সে যুগে ইতিহাস দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারাই ছিল দুনিয়ার শিক্ষাগুরু। সভ্যতা ও কৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন জাতিই তাদের সমকক্ষ ছিল না। আমাদের অভিধানে ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জল যুগকে প্রগতির যুগ বলা হয় কিনা? তবে সেই যুগ যদি প্রগতির যুগ হয়, তাহলে বলা যায় যে, পর্দার পবিত্র বিধানকে পুরোপুরি বজায় রেখেই তখনকার মুসলমানরা এতটা উন্নতি লাভ করতে সামর্থ হয়েছিল।

ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তানায়ক, আলেম ও দিগ্বীজয়ী বীরের নাম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেসব বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই তাদের মূর্খ জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত হননি। শুধু তাই নয়, ইসলামি ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বহু খ্যাতনামা মহিলার নামও দেখতে পাই। সে যুগে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে দুনিয়ায় অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তাদের এই উন্নতি ও প্রগতির পথে পর্দা কখনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং আজ যদি আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে প্রগতি অর্জন করতে চাই, তাহলে পর্দা আমাদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে কেন?[৫৯৭]

পর্দাহীনতার পরিণতি

অবশ্য পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের বল্গাহীন জীবনধারাকেই যদি কেউ 'প্রগতি' বলে মনে করি, তাহলে তার সে প্রগতির পথে পর্দা নিঃসন্দেহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা পর্দার বিধান মেনে চললে পাশ্চাত্য কায়দার প্রগতি অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত, এ তথাকথিত প্রগতির ফলেই পাশ্চাত্যবাসীদের নৈতিক ও পারিবারিক জীবন আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। সেখানে নারীকে তার নিজ কর্মক্ষেত্র থেকে টেনে এনে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে নারীও তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দিয়ে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে অফিস-আদালত ও কল-কারখানার কাজে কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়েছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে সেখানকার পারিবারিক জীবন থেকেও শান্তি-শৃঙ্খলা বিদায় নিয়েছে। তার কারণ, যে সকল নারীকে অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়, তারা কখনো পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধানের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না, আর তা সম্ভবও নয়।[৫৯৮]

এ জন্যেই আজ পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা পারিবারিক জীবনের চাইতে হোটেল, রেস্তোরা ও ক্লাবের জীবনেই বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সেখানে বহু মানব সন্তান ক্লাব-রেস্তোরাতেই জন্মগ্রহণ করে, আর ক্লাব-রেস্তোরাতেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। মাতা-পিতার স্নেহ-মমতা তারা কোনদিনও উপভোগ করতে পারে না। অপরদিকে দাম্পত্য অশান্তি, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং যৌন অনাচার সেখানে এরূপ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, আজ সেখানকার মনীষীরাই তাদের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আঁতকে উঠছেন। মোদ্দাকথা, পশ্চিমী সভ্যতা বাহ্যিক চাকচিক্যের পশ্চাতে মানুষের জীবনধারাকে এমনি এক পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছে, যেখানে মানবতার ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এরূপ বল্গাহীন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন ধারাকে যদি কেউ প্রগতির পরিচায়ক বলে মনে করেন, তবে তিনি তা সানন্দেই গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম এরূপ অভিশপ্ত জীবনকে আদৌ সমর্থন করেনা।

---

৫৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৫৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

বিভিন্ন ধর্মে পর্দার বিধান

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে যে, নারীর জন্য পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে যেন তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তাদেরকে উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। ইসলামে পর্দার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এমন কি খৃস্টান, ইহুদীসহ অন্যান্য ধর্মেও পর্দার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদিও খ্রীষ্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক, প্রটেষ্ট্যান্ট, অর্থোডক্স ইত্যাদি নানা রকম গ্রুপের ফলে এবং প্রগতির বৈরি হাওয়ায় ১৯৬০ এর দশক থেকে অনেক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। তারপরও তাদের অনেকে এখনও পর্দা মেনে চলে যদিও সেটা সীমিত আকারে।

খৃস্ট ধর্মে বলা হয়েছে, যে নারী পর্দা না করে মাথা খোলা রেখে চলাফেরা করে সে তার নিজের মাথাকে অসম্মান করে । ইহুদী ধর্মে বলা হয়েছে, শালীনতা, নম্রতা হচ্ছে এমন একটা মৌলিক বিষয় যে, আপনার বহিরাবরণ বলে দেয় যে আপনি ভেতরে কী? অর্থাৎ- আপনার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হলো আপনার পর্দা। এ ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেন্ট হলো, আপনি চোখ দিয়ে আমার বহিরাবরণ যা দেখেন আমি তার চেয়েও অনেক বেশি। আপনি যদি সত্যিকারভাবে আমাকে দেখতে চান তাহলে আপনার দৃষ্টিকে অনেক গভীরে নিতে হবে। বহিঃক্রিয়া অন্তরে সতর্কতা সৃষ্টি করে । এ চিন্তা থেকে পর্দা করা উচিত যেন সর্বদা আমার মনে থাকে যে সৃষ্টিকর্তা আমাকে দেখছেন।[৫৯৯]

বিখ্যাত আমেরিকান ইতিহাসবিদ উইল ডিউরান্ট বলেন, যদি কোন ইহুদী মহিলা তাদের আইন লঙ্ঘন করে মাথা না ঢেকে বাড়ির বাইরে বা কোন পুরুষের সামনে যায় অথবা তার কণ্ঠ যদি কোন পুরুষ বা তার প্রতিবেশী শুনতে পায় তবে তার স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাকে যৌতুক বাবদ কোন টাকা না দিয়েই তাকে তালাক দেয়ার।

খৃস্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয় অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ওল্ড টেষ্টামেন্টে পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। শুরুর দিকে বিভিন্ন চার্চের ফাদারগণও পর্দা প্রথার কথা বলেছিলেন এবং এ ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হার্মাস, ক্লিমেন্ট অব আলেক্সজান্দ্রিয়া, জেরোমী, অগাস্টিন অব হিপ্পো এবং টারটুলিয়ান। প্রাচীন খৃস্টীয়, গ্রীক এবং আরো হাজার হাজার বছরের পুরানো বিভিন্ন সভ্যতায় তাদের বিভিন্ন আর্ট, ড্রইং, ছবি এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোতেও নারীকে পর্দা পরা অবস্থায় দেখা যায়।

প্রটেষ্ট্যান্ট সংস্কারকদের মধ্যে মার্টিন লুথার এর স্ত্রী ক্যাথেরিন মাথা ঢেকে চলতেন এবং জন নক্স ও জন ক্যালভিন উভয়ই নারীদেরকে পর্দা করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। এছাড়াও যারা নারীদেরকে পর্দা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ম্যাথিউ হেনরী, এ আর ফসেট, এ টি রবার্টসন, হ্যারি এ আয়রনসাইড এবং চার্লস্ ক্যাডওয়েল রাইরি অন্যতম।

শিখদের ধর্মে নারী পুরুষ উভয়ের পর্দা করার বিধান রয়েছে। পুরুষেরা তাদের চুলকে পেঁচিয়ে মাথায় পাগড়ী বাঁধে আর নারীরা পড়ে লম্বা ধরণের স্কার্ফ, যাকে চুন্নি বলে। তারা নিজেদের পবিত্রতা এবং ধর্মীয় স্বকীয়তা প্রমাণের জন্য এভাবে পর্দা করে থাকে। বলা হয়েছে, মেয়েদেরকে সব সময় তাদের মাথা ঢেকে রাখতে হবে। ছোট মেয়েদেরকে এমনি এমনি রাখলে চলবে না, তাদেরকে শুরু থেকেই চুন্নি ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং এটা বাঁধা শেখাতে হবে যেন বড় হবার পর কোন সমস্যা না হয়। যখন তারা প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছবে তখন তাদের নারীত্বের শোভা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সব সময় চুন্নি বেঁধে রাখতে হবে।

আবার সনাতন হিন্দু ধর্মেও পর্দা করতে দেখা যায়। তাদের সবচেয়ে পবিত্র যে ধর্মগ্রন্থ বেদ - সেখানেও পর্দা করার কথা বলা হয়েছে। অপরিচিত পুরুষের সাথে দেখা তো দূরের ব্যাপার, কথা বলতেও নিষেধ

---

৫৯৯. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, *ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩; [Outside/Inside: A Fresh Look at Tzniut]

করা হয়েছে। পুরুষের পোশাক নারীদের এবং নারীর পোশাক পুরুষদেরকে পরতে বারণ করা হয়েছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক হিন্দু মহিলাদেরকে পর্দা করতে দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় তাদের এ পর্দাকে বলে 'ঘুঙ্কুট'।[৬০০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিবাহ

মানব সমাজে বিবাহের ভূমিকা

বিবাহ পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শুধুমাত্র একটি যৌন সম্পর্কই নয়, বরং একটি উন্নততর সামাজিক বন্ধন ও একটি পূত-পবিত্র চারিত্রিক সম্পর্কও বটে। এ দ্বারাই মানব সংস্কৃতির বুনিয়াদ স্থাপিত ও এর উপরই মানবতার স্থিতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

ইসলাম বিবাহ বন্ধন দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, একমুখিতা, সখ্যতা, পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতি এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সুদৃঢ়–মযবুত ভিত্তি তৈরির প্রয়াসী। এ কারণেই ইসলাম বিবাহের তাকীদ করেছে এবং বিভিন্নভাবে বিবাহে উৎসাহ দিয়েছে। বস্তুত পুরুষ ও মহিলার সঠিক বন্ধনের উপরই মানবতার সঠিক সংস্কৃতি ও সমাজ নির্ভর করে এবং তা নষ্ট হলে পুরো সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যায়। এ কারণেই ইসলাম বিবাহকে অতি সহজ ও গ্রহযোগ্য বানিয়েছে এবং বিবাহ সম্পর্কের সুদৃঢ়তা ও মাধুর্যকে মানবতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত বলে সাব্যস্ত করেছে।

মানব সংস্কৃতি ও সমাজের বুনিয়াদ নর ও নারীর পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সখ্যতার উপর স্থাপিত। ইসলামে নর ও নারীর সম্পর্ক স্থাপনের একটিই মাত্র উপায় আর তা হলো বিবাহের মযবূত ও পবিত্র বন্ধন। তা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক মিথ্যে ও অবৈধ্য। (তবে হ্যা, স্বীয় অধিকারভুক্ত দাসীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন বৈধ।)

১.বিবাহ নবিদের সুন্নাত

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"আর তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।"[৬০১]

দীন সম্পর্কে অজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি বিবাহ বন্ধনকে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে এবং চির কৌমার্য ও বৈরাগ্য জীবনকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বলে ধারণা করে। কিন্তু কুরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্য এই যে, রূহানী উন্নতির অধিকারী নবি ও রাসূলদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিল। আর বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া তাদেরই সুন্নাত।

২. বিবাহ একটি সুদৃঢ় চুক্তি

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

---

৬০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৬০১. আল-কুরআন, সুরা আর-রা'দ (১৩) : ৩৮

"আর স্ত্রী লোকগণ তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"[৬০২]

বিবাহকে 'দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বা চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করে কুরআন এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি ফিরাতে চাচ্ছে যে, এই বৈবাহিক চুক্তিকে সারা জীবনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় রাখার পুরো প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উন্নত মানসিকতা ও মহৎ মনের পরিচয় দিতে হবে। এমন কোন ভূমিকা কখনো নেওয়া উচিত হবে না যাতে এ সুদৃঢ় চুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পবিত্র চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ঠিক তখনি ছিন্ন করা যেতে পারে যখন তা প্রতিষ্ঠিত রাখার সকল সম্ভাবনা সত্যিকার অর্থে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায় না থাকে।

৩. বিবাহ একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ বন্ধন

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্য-ক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার।"[৬০৩]

স্বামী ও স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র যৌন সম্ভোগ তাড়িত সম্পর্কই নয়, বরং অতি পবিত্র ও উদ্দেশ্য সম্বলিত সম্পর্ক।

এতদুভয়ের উদাহরণ শস্যক্ষেত্র ও কৃষক সদৃশ। পুরুষ হলো মানব বংশের কৃষক এবং নারী হলো মানবতার শস্য-ক্ষেত্র। শস্য-ক্ষেত্রে একজন কৃষক শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগের জন্যই গমন করে না। বরং তাতে শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গমন করে। এ কারণে মানব বংশের এই কিষাণকে মানব বংশের ক্ষেত্রের নিকট এই উদ্দেশ্যেই যেতে হবে যাতে তা দ্বারা উৎপাদন লাভ করা যায়।

৪. সুসন্তান লাভের জন্য বিবাহ

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ "আর পূর্বাহ্নে তোমরা তোমাদের জন্য কিছু করবে।"[৬০৪]

উপরোক্ত শব্দগুলো অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। এর মর্ম হলো, বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে নিজেদের বংশ স্থায়ী রাখার চেষ্টা কর, যাতে তোমরা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও তোমাদের স্থলে কাজ করার মত লোকের জন্ম হয় এবং এ খেয়ালও রাখ যে, ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন দীন, সচ্চরিত্র ও মানবতার অলংকারে অলংকৃত হয়।

৫. বিবাহ্ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলভিত্তি

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[৬০৫]

---

৬০২. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ২১

৬০৩. আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা (২) : ২২৩

৬০৪. আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা (২) : ২২৩

৬০৫. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩২-৩৩

পবিত্র কুরআন প্রত্যেক নর ও নারীকে বিবাহের তাকীদ দিয়েছে এবং নির্দেশ দিয়েছে যে, মানুষ যেন নিজের যৌন চাহিদা শুধুমাত্র সেই নির্ধারিত, সর্বজ্ঞাত ও সৎপন্থায় পূর্ণ করে। বিবাহ ব্যতীত পুরুষ ও নারীর যে কোন যৌন সম্পর্ক হারাম এবং মানবতার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কারণেই কুরআন সমাজে পুরুষ কিংবা নারীকে চিরকুমার বা কুমারী দেখতে চায় না এবং পুরো সমাজকে বিবাহের বিষয়ে আগ্রহান্বিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে। যদি কেউ আর্থিক অভাবের কারণে বিবাহে সমর্থ না হয়। তবে তাকে এ নির্দেশ দিচ্ছে যে, সে যেন তার মানবতার মূল্যবান উপাদানের হিফাযত করে। যৌন উপভোগের উন্মুক্ত ময়দানে বিচরণ করে যেন নিজের নির্মলতা ও পবিত্রতাকে কলুষিত না করে এবং মানব সংস্কৃতির মূল যেন কেটে না দেয় বরং যেন অপেক্ষা করে যে, আল্লাহ তার অপার মহিমায় তাকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। যাতে সে সৎপথে পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করে নতুন সংসার ও বংশের বুনিয়াদ স্থাপন করতে পারে।

বৈবাহিক সম্পর্কই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। কেননা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি জন্মলাভ করে এক নর ও নারীর সম্মিলিত বসবাসে, এক পরিবার ও বংশের অস্তিত্ব দানে, এবং বংশের মধ্যে সম্পর্ক ও সম্বন্ধ সৃষ্টিতে। যদি নর ও নারী এই স্বাধীনতা পেয়ে যায় যে, তারা পরিবার ও বংশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া নিছক ভোগ ও আনন্দের জন্য মিলিত হবে, তারপর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তবে গোটা মানবতা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যাবে এবং সেই বুনিয়াদও ধ্বংস হয়ে যাবে যার উপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট প্রাসাদ রচিত হয়েছে।

৬. বিবাহ মানব জাতির স্থায়িত্বের একমাত্র উপায়

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَا

"হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"[৬০৬]

নর-নারীর পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্কজনিত নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে সুদৃঢ়ভাবে স্থির ও মযবূত থাকার উপরই মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এ সম্পর্ক শুধুমাত্র ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ ও তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নয়। কেননা, নর-নারীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক ব্যতীত মানব বংশ একদিনও চলতে পারে না।

৭. বিবাহ স্নেহ, ভালবাসা ও মায়া-মমতার বুনিয়াদ

মহান আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[৬০৭]

৮. বিবাহ প্রশান্তির কারণ

ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

৬০৬. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ১

৬০৭. আল-কুরআন, সুরা রূম (৩০) : ২১

"তিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।"[৬০৮]

মূলতঃ এখানে 'শান্তি'র অর্থ ভোগজনিত শান্তি। তবে এ এক বাস্তব সত্য যে, বৈধ উপভোগজনিত শান্তি পুরো জীবনের শান্তি ও প্রশান্তিরই নামান্তর। আর এই বৈধ শান্তি থেকে বঞ্চিত থাকার অর্থ পুরো জীবনটা অশান্তি ও দুঃখময় হওয়া।

৯. বিবাহ সতীত্ব রক্ষার উপায়

ইরশাদ হয়েছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"(তারা নারীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের (নারীদের) পোশাক।"[৬০৯]

পোশাক মানুষের যেমনি দেহকে আচ্ছাদিত করে এবং সকল দিক থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি একজন নারী পুরুষের জন্য আচ্ছাদন বলে গণ্য। সে তার মূল্যবান যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে। পুরুষ নারীর পর্দা বলে গণ্য এবং সে তার সতীত্বের রক্ষাকারী হয়ে থাকে। এ জন্য নবি কারিম (স.) প্রত্যেক যুবককে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন- "যে সব যুবক বিবাহে সক্ষম, তারা যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে এবং মানুষের সততা ও সচ্চরিত্র রক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।" অন্যত্র নবি (স.) ইরশাদ করেছেন- "সে ব্যক্তির সাহায্য আল্লাহর যিম্মায়, যে ব্যক্তি পবিত্র থাকার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে।"

১০. বিবাহ মানুষকে গৃহমুখী করে

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

"এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ্য করা হলো যদি তোমরা তাদের মাহ্র প্রদান কর বিবাহের জন্য। প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপ-পত্নী গ্রহণের জন্য নয়।"[৬১০]

বিবাহ মানুষের অতি মূল্যবান যৌন পবিত্রতা রক্ষার জন্য একটি সুদৃঢ় মযবূত দুর্গ বিশেষ এবং তার উদ্দেশ্য মানুষকে গৃহমুখী করে তার যৌন শক্তিকে সংযত করার মাধ্যমে গৃহে আবদ্ধ করা। আর সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরাফেরা ও অশ্লীতা থেকে তাকে সংযত করে তার ভবিষ্যত প্রজন্মের ভিত্তি স্থাপন করা।

১১. ইসলাম বিবাহের উৎসাহ প্রদান করে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"এবং তোমাদের যারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৬১১]

" الْأَيَامَى " শব্দটি "الْأَيِّمُ " - এর বহুবচন। যারা অবিবাহিত, বিপত্নীক অথবা বিধবা তাদেরকেও "الْأَيِّمُ " বলা হয়ে থাকে। " الْأَيِّمُ" অর্থ, যে সমস্ত পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে সব নারীর স্বামী নেই।

---

৬০৮. আল-কুরআন, সুরা আ'রাফ (৭) : ১৮৯

৬০৯. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ১৮৭

৬১০. আল-কুরআন, সুরা মায়িদা (৫) : ৫

৬১১. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩২

পবিত্র কুরআন সকল অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীকে বিবাহের উৎসাহ দিয়েছে এবং সমাজে কোন পুরুষ কিংবা নারীকে কৌমার্য জীবন গ্রহণ করতে নিরুৎসাহিত করেছে। এমনকি দাস-দাসীদেরকে অবিবাহিত থাকতে নিরুৎসাহিত করেছে। কুরআনের এই আদেশ শুধুমাত্র যুবক ও যুবতীদের জন্য নয়, বরং সকল মুসলমান নর ও নারীর জন্য। যার মর্ম হলো বংশের লোকদের- দোস্ত ও প্রিয়জন, আত্মীয় ও প্রতিবেশী সবাইর এ বিষয়ে আগ্রহ থাকতে হবে। এবং যার বিবাহের আর্থিক সংগতি নেই স্বয়ং সরকার তাকে সাহায্য করবে।

আল্লাহ্ তাআলা বিবাহের উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ করছেন- "যদি তোমরা অভাবগ্রস্ত হও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সম্পদশালী করে দেবেন।" এ কথার মর্ম এই নয় যে, প্রত্যেক বিবাহকারী অবশ্যই সম্পদশালী হয়ে যাবে। বরং এর মর্ম হলো, এ বিষয়ে লোক অতিশয় হিসাবী হয়ে বসে থাকবে না। এ কথা দ্বারা বিবাহকারী পুরুষ ও নারীর মানসিকতা সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেমন-

যুবতীদের অভিভাবকদেরকে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যদি তাদের কাছে কোন ভদ্র ও সৎ ছেলের বিবাহের প্রস্তাব আসে, তবে তারা যেন শুধুমাত্র তার দীনতা দেখেই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করেন। যুবকদের অভিভাবকদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেন যুবককে শুধুমাত্র বেশী বেশী উপার্জনের জন্য বিবাহের অপেক্ষায় বসিয়ে না রাখেন। আর স্বয়ং যুবকদেরকে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা অধিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অপেক্ষায় অযথা যেন তাদের বিবাহের কাজকে বিলম্বিত না করে। বরং যে সামান্য রোযগার হয় তা দ্বারা আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করেই বিবাহ করা উচিত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিবাহ মানুষের অবস্থার পরিশুদ্ধির উপায় সৃষ্টি করে। স্ত্রীর সাহায্যে বিভিন্ন উপায় ও অবলম্বন তার হস্তগত হয়। যিম্মাদারী অর্পিত হলে মানুষ নিজেই পূর্বের চেয়ে বেশী মেহনত করতে তৎপর হয়। সবচেয়ে বাস্তব কথা এই যে, কে জানে ভবিষ্যতে তার ভাগ্যে কি লেখা আছে? এবং কাকে আল্লাহ্ তাআলা কি জিনিসের অধিকারী করবেন? এ কারণেই মানুষকে বিবাহের বিষয়ে একটা সীমাবদ্ধ উপার্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, তবে অতিশয় হিসাবী হওয়া থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে।

১২. বিবাহে ঈমান ও ইসলামের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"এবং মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। আর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দেবে না; মুশরিক পুরুষ তোমাদের মুগ্ধ করলেও মু'মিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"[৬১২]

কুরআন কোন মুশরিক নারীকে কোন মু'মিন পুরুষ বিবাহ করতে কখনো অনুমতি দেয় না। এমনিভাবে কোন মু'মিন নারী কোন মুশরিক পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুক তার অনুমতি দেয় না। কেননা,

৬১২. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২২৩

বিবাহ শুধুমাত্র একটি যৌন সম্পর্কই নয় বরং তা একটি উন্নততর সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক ও আত্মিক বন্ধনও বটে। একজন মু'মিন এ আত্মিক সম্পর্ক একমাত্র মুমিনের সাথেই গড়ে তুলতে পারে।

১৩. পবিত্র নরের জন্য পবিত্রা নারী

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; আর সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।"[৬১৩]

অর্থাৎ পবিত্র বা সচ্চরিত্র পুরুষের বিবাহ সচ্চরিত্রা নারীর সাথেই সম্পাদিত হতে পারে। কোন সচ্চরিত্র পুরুষের সাথে কোন দুশ্চরিত্রা ও অসতী নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। এমনিভাবে কোন সতী-সাধ্বী নারীর সাথে কোন দুশ্চরিত্র অসৎ পুরুষের সাথে দাম্পত্য জীবন-সম্পর্ক হতে পারে না। উপরন্তু এরকম দাম্পত্য সম্পর্কে কখনো সেই কল্যাণ ও বরকতের আশা করা যেতে পারে না যার জন্য ইসলাম বিবাহের তাকীদ প্রদান করেছে।

১৪.ব্যভিচারিণী নারীকে বিবাহ করা যাবে না

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"আর ব্যভিচারিণী তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেউ বিবাহ করে না এবং মু'মিনদের জন্য তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"[৬১৪]

১৫. ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা যাবে না

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতীত বিবাহ করে না।"[৬১৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য যিনা বা অসৎ কাজে লিপ্ত, তার সাথে সতী নারীর কখনো সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া উচিত নয়। মুমিনদের জন্য নিষিদ্ধ জেনে-শুনে তাদের মেয়েকে যিনাকারীর কাছে বিবাহ দেওয়া এবং এমনিভাবে সৎ পুরুষের সাথে ও সে সব নারীর বিবাহ নিষিদ্ধ যারা অসৎ কাজে লিপ্ত।

যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম

মানব বংশের স্থায়িত্ব ও পুরুষ-নারীর স্বাভাবিক শান্তি উভয়েরই পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআন এই সম্পর্কের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সম্পর্ক প্রয়োজনীয় বলে সাব্যস্ত করেছে। উপরন্তু এ থেকে নির্লিপ্ত থাকাকে অপসন্দ করেছে। তবে পবিত্র কুরআন এ পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনে মানুষকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়নি। বরং এতে কিছু কর্তব্য স্থির করে দিয়েছে এবং কিছু সীমারেখাও নির্ধারিত করে দিয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা ও কর্তব্যসমূহ বংশ এবং আত্মীয়তার প্রতি সম্মান ও হিফাযত, বংশীয় সম্পর্কের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা, পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বোপরি সঠিক সামাজিক বন্ধনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। সামাজিক বন্ধনের স্থায়িত্বের জন্য যেমনিভাবে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে কুরআনের নিষিদ্ধ সীমারেখা মেনে চলাও জরুরী। পবিত্র কুরআন যে সব আত্মীয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হারাম স্থির করেছে তার তিনটি কারণ বর্ণনা করেছে। যেমন- ১. বংশ ২. স্তন্যপান ৩. বৈবাহিক সম্পর্ক।

---

৬১৩. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ২৬

৬১৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩

৬১৫. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩

এ মর্মে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাদেরকে, কন্যাদেরকে, বোনদেরকে, ফুফুদেরকে, খালাদেরকে, ভাতিজিদেরকে, ভাগ্নিদেরকে, দুধমাতাদেরকে, দুধবোনদেরকে, শাশুড়ীদেরকে ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাদেরকে, যারা তোমাদের পোষ্যরূপে রয়েছে, তবে যদি তাদের সাথে সহবাস না হয়ে থাকে, তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই এবং তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই বোনকে একত্র করা, পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬১৬]

নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো,

১. বংশ : প্রকৃত মাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা মূলত সাত- (১) মা, (২) কন্যা, (৩) বোন, (৪) ফুফু, (৫) খালা, (৬) ভাতিজী, (৭) ভাগ্নী। এদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হারাম। আর এই হারামের কারণ হলো বংশ।

২. স্তন্যপান : ছেলে অথবা মেয়ে যদি কোন স্ত্রীলোকের স্তন্যপান করে, তবে সেই স্ত্রীলোক স্তন্যপানকারীর দুধ-মা ও তার স্বামী দুধ-পিতা হিসেবে সাব্যস্ত হয়। রেযায়ী মাতা-পিতার সাথে এমনিভাবে বিবাহ হারাম হয়ে যায়, যেমনিভাবে প্রকৃত মাতা-পিতার সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যায়। তাছাড়া এই রেযায়ী সম্পর্কের কারণে সেই সব আত্মীয় হারাম হয়ে যায়, যা প্রকৃত মাতা-পিতার সম্পর্কের কারণে হয়ে থাকে।

নবি কারিম (স.) বলেছেন-

" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ،

"স্তন্যপানের কারণে সেই সব আত্মীয় হারাম হয়ে যায় যা বংশের কারণে হারাম হয়ে যায়।"[৬১৭]

৩. বৈবাহিক সম্পর্ক : বৈবাহিক সম্পর্কের কারণেও কোন কোন আত্মীয় হারাম হয়ে যায়। বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারামকৃত আত্মীয় দু'প্রকার-

ক. যাদের নিষিদ্ধতা চিরস্থায়ী

যেমন- স্ত্রীর মাতা অর্থাৎ শাশুড়ী, পুত্রের স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রবধূ এবং সেই স্ত্রীর কন্যা যার সাথে মিলন হয়েছে। উপরোক্ত আত্মীয়গরে পরস্পর বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম।

খ. সে সব আত্মীয় যাদেরকে বিবাহ করা চিরস্থায়ীভাবে হারাম নয়

যেমন- স্ত্রীর বোন ও মিলন হয়নি এমন স্ত্রীর কন্যা। উপরোক্ত নারীগণকে বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান থাকতে বিবাহ করা হারাম। তবে স্ত্রীর মৃত্যু হলে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে পরে তাদেরকে বিবাহ করা যেতে পারে।

১.সতাই মা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

---

৬১৬. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনুদিত, তাফসীরে জীলানী ২য়, পৃ. ১২১

৬১৭. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, মুসনাদে আয়িশা সিদ্দীকা, খ. ৪১, পৃ. ২৪০ হাদিস নং ২৪৭১২

"আর নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। পূর্বে যা হয়েছে, তা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[৬১৮]

উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতে (২৩ নং আয়াতে) সেই সব নারীর তালিকা বর্ণিত হয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম এবং তাদের সর্বশীর্ষে মায়ের কথা বলা হয়েছে। 'মা' বলতে আপন ও সতাই মা উভয়কেই বুঝায়। তবে উপরোক্ত আয়াতে সতাই মায়ের কথা বিশেষভাবে বলার কারণ এই যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন কোন বেহায়া ও বে-শরম লোক পিতৃপুরুষের বিবাহিতাদেরকেও বিবাহ করত।

যে সব স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম তাদের সাথে বিবাহ কিংবা যৌন সম্পর্ক স্থাপন ইসলামের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণ্য ও অশ্লীল কাজ। নবি কারিম এর এ রকম অপরাধে লিপ্তদেরকে হত্যা ও তাদের বিষয়–সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের শাস্তি প্রদান করেছেন। ইমাম ইবন মাজাহ (রা) হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে বুঝা যায় যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন "যে ব্যক্তি মুহররামাত-এর কারো সাথে অসৎ মিলন করে, তাকে হত্যা কর।"

২. সতাই কন্যা

ইরশাদ হয়েছে,

وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

"এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে সংগত হয়েছ তাদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাদের গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে।"[৬১৯]

"অভিভাবকত্বে আছে" একথা দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই আদেশ হচ্ছে স্বাভাবিক শালীনতার প্রকৃত চাহিদা এবং সুস্থ বিবেকের প্রকৃত ভাষ্য। সত্য কথা! ভদ্র ও শালীন ব্যক্তির সুস্থ বিবেক কিভাবে একথা মেনে নেবে যে, সে সেই কন্যার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, যে তার অভিভাবকত্বে তার কন্যার মত লালিত হয়েছে ?

৩. পুত্রবধূ

ইরশাদ হয়েছে,

وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ

"তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের বধূরাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।"[৬২০]

"তোমাদের ঔরসজাত এ শর্ত আরোপের কারণ এই যে, পোষ্য বা দত্তক পুত্রের তালাক দেওয়া বউ বিবাহ করা বৈধ। পুত্রের বউ-এর আদেশে পৌত্র ও দৌহিত্রের বধূও শামিল।

৪. দু'বোন একত্রে

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

"এবং দু'বোনকে এক সাথে বিবাহ করাও তোমাদের জন্য হারাম।"[৬২১]

বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবে এক বোন জীবিত থাকতে অপর বোনকে বিবাহ করা হারাম। তবে হ্যাঁ, যদি বিবাহিতা বোন মরে যায় কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর বিবাহ করা যাবে।

---

৬১৮. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২২

৬১৯. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৩

৬২০. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৩

৬২১. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৩

বোনের মত স্ত্রীর খালা, ফুফু, বোনের মেয়ে, ভাইয়ের মেয়েরও ঠিক একই হুকুম ! অর্থাৎ স্ত্রীর বর্তমানে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। ইসলামের ফকীহ্গণ এ কারণে একটি উসুল বর্ণনা করেছেন যে, "এমন দু'স্ত্রীলোককে এক সাথে বিবাহ করা হারাম যাদের একজনকে যদি পুরুষ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, তবে অপরজনের সাথে তার বিবাহ হারাম হবে।"

৫. অপরের বিবাহিতা স্ত্রী

ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

"এবং সে সব স্ত্রীলোকও তোমাদের জন্য হারাম যারা অপরের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।"[৬২২]

যেসব নারীকে বিবাহ করা হালাল

১.যুদ্ধবন্দী স্ত্রীলোকগণ

ইরশাদ হয়েছে,

إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"তবে সে সব স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য হালাল, যারা (যুদ্ধে) তোমাদের অধিকারে এসেছে।"[৬২৩]

যে সব রমণী যুদ্ধে বন্দী হয়ে এসেছে এবং তাদের কাফির স্বামী দারুল হারবে রয়েছে এমন স্ত্রীলোকদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ। যেহেতু দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। এমন রমণীরা যাদের অধিকারভুক্ত হবে তাদেরকে বিবাহ ব্যতীতই তাদের সাথে যৌন সম্ভোগ করা যাবে।

২. মুহাররামাত ব্যতীত সকল স্ত্রীলোক

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ

"এবং মুহাররাম নারীগণ ব্যতীত অন্য সব নারী তোমদের জন্য হালাল।"[৬২৪]

৩. কিতাবী স্ত্রীগণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারী। তোমাদের জন্য বৈধ।"[৬২৫]

পবিত্র কুরআন কিতাবী রমণীগণকে অবশ্য বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে এই অনুমতি থেকে ফায়দা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, কুরআন বিবাহের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে দীন ও ঈমানের অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মুশরিক নারীকে কোন অবস্থাতেই বিবাহ করা যাবে না চাই সে সুন্দরী, ধনী, বুদ্ধিমতী, চাল-চলনের দিক থেকে পসন্দসই হোক না কেন।

---

৬২২. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৪

৬২৩. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৪

৬২৪. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৪

৬২৫. আল-কুরআন, সুরা মায়েদা (৫) : ৫

ইয়াহুদী ও খৃস্টান রমণীগণ নিঃসন্দেহে হালাল। তবে তাদেরকে বিবাহ করলে দীন ও ঈমানের ক্ষতির আশংকা থাকলে তাদের থেকে বিমুখ থাকাই উত্তম। কেননা, অনুমতির মর্ম এই নয় যে, সর্বাবস্থায় তাদেরকে বিবাহ করতে হবে।

৪. মুসলমান দাসীগণ

ইরশাদ হয়েছে,

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"আর তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করবে।"[৬২৬]

মর্ম হলো এই যে, যদি কেউ এমন গরীব ও নিঃস্ব হয় যে, স্বাধীনা উচ্চবংশীয় নারীর মাহ্‌র ও ভরণ-পোষণ আদায়ে সমর্থ নয়, তবে তার জন্য মুসলমান দাসী বিবাহের অনুমতি রয়েছে।

৫. সতাই কন্যা- যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস না হয়ে থাকে

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"আর যদি তোমরা স্ত্রীদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।"[৬২৭]

কোন রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে এবং যে কোন কারণে তার সাথে মিলনের পূর্বে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে এমন স্ত্রীর কন্যাগণকে বিবাহ করাতে কোন অপরাধ নেই।

৬. পোষ্য পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

"এরপর যায়দ যখন তার (যয়নবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম। যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ-সূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।"[৬২৮]

উপরোক্ত ঘটনা হযরত যয়নব (রা) ও হযরত যায়দ (রা) সম্পর্কিত। হযরত যায়দ (রা) মহানবি (স.)-এর পোষ্যপুত্র ছিলেন। মহানবি তাঁকে যয়নব (রা)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বনিবনা হলো না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়দ (রা) যয়নব (রা)-কে তালাক দেন। যখন ইদ্দত শেষ হলো, তখন মহানবি (স.) তাকে বিবাহ করেন। পবিত্র কুরআন রাসূল (স.) এর এই বিবাহের মর্ম ও যথার্থতা এই বর্ণনা করেছে যে, মুসলমানদের আল্লাহর এই নির্দেশ জানা আবশ্যক যে, যদি তাদের পোষ্যপুত্র তাদের স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তবে নির্ধিধায় তাকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করা যেতে পারে। মুখে বলা পুত্র কখনো প্রকৃত পুত্র হয় না যে, তার স্ত্রী চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

বিবাহের আহকাম

১.বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া উচিত

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

---

৬২৬. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৫

৬২৭. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৩

৬২৮. আল-কুরআন, সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৭

"সুতরাং তাদেরকে বিবাহ কর তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়, তাদেরকে তাদের মাহ্র ন্যায়সংগতভাবে দেবে।[৬২৯]

গোপন অভিসার ও ব্যভিচার থেকে বাঁচার জন্য পবিত্র কুর'আন বিবাহের পবিত্র পদ্ধতির তাকীদ প্রদান করেছে। সুতরাং এই পবিত্র সম্পর্ক সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে হওয়া আবশ্যক। সেহেতু বিবাহ খোলাখুলি জনসমক্ষে হওয়া চাই। এ কারণে ফকীহগণ বিবাহ জনসমক্ষে বা জনসাধারণ্যে হওয়া পসন্দ করেছেন। যাতে অধিকতর লোক তাতে শরীক হতে পারে এবং জনগণ তা জানতে পারে।

২. বিবাহে মাহ্র অত্যাবশ্যক

ইরশাদ হয়েছে,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

"(উল্লিখিত হারাম নারীগণ ব্যতীত) অন্য সব নারী অর্থ ব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।"[৬৩০]

৩. বিবাহের জন্য রমণী নির্বাচনে স্বাধীনতা

ইরশাদ হয়েছে,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"সুতরাং নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে তাকে বিবাহ করবে।"[৬৩১]

অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে জীবন সাথীকে নির্বাচনের মৌলিক অধিকার একমাত্র তারই আছে, যে বিবাহ করবে। এ অধিকার পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই রয়েছে। অভিভাবকদের এই অধিকার নেই যে, তারা বর ও কনের ইচ্ছা ও মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবেন এবং অযথা এ আশা করবেন যে, তারা তাদের পসন্দের প্রতিকূলে জীবনভর তা মেনে নেবে বা চলবে।

৪. একের অধিক বিবাহের অনুমতি

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

"সুতরাং তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দু' তিন অথবা চার।"[৬৩২]

পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে একের অধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করেছে এবং এই অনুমতি একান্তভাবে মানুষের ফিত্রাত সংগত। কোন কোন অবস্থায় স্ত্রীর সংখ্যা সভ্যতার চাহিদা ও চারিত্রিক প্রয়োজনে বর্ধিত হয়ে থাকে। যদি একের অধিক বিবাহের অনুমতি না থাকে, তবে যে লোক এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট না হতে পারে, সে বিবাহের সীমা থেকে বের হয়ে চারিত্রিক অধঃপতন ও গোপন অভিসার ছড়াতে পারে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে এমন সব লোককে একের অধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে যারা সত্যিকার অর্থেই তার প্রয়েজনীয়তা অনুভব করে। এ সকল লোক নিজেদের চাহিদা ও পসন্দ মুতাবিক একের অধিক বিবাহ করতে পারে।

৫. সুবিচার করতে সক্ষম না হলে এক বিবাহই উত্তম

ইরশাদ হয়েছে,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে।"[৬৩৩]

---

৬২৯. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৫

৬৩০. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ২৪

৬৩১. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ৩

৬৩২. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ৩

একথা অনস্বীকার্য যে, কুরআন চারজন স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তবে যদি কেউ আশংকা করে যে, সে একের অধিক স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচারে সক্ষম হবে না, তবে তার একজন স্ত্রীর উপরই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

৬. স্ত্রীদের মাঝে প্রার্থিত সুবিচার

ইরশাদ হয়েছে,

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৬৩৪]

একের অধিক বিবাহে কুরআন সুবিচার ও সাম্যের যে শর্তারোপ করেছে এর মর্ম কখনো এই নয় যে, পুরুষ সর্বাবস্থায় সকল দিক থেকে স্ত্রীদের মধ্যে সমব্যবহার করবে। স্বামীর চরম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব নয় যে, সে সকল দিকের সমতা রক্ষা করবে। যদি তাই হয়, তবে আল্লাহ্ তাআলা কেন এই অসম্ভব আদেশ করলেন ? না, আসলে তা নয়। বরং আল্লাহর নির্দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এই যে, মানুষ নিজের সাধ্যানুযায়ী যতটুকু সম্ভব স্ত্রীদের অধিকার, পোশাক, ভরণ-পোষণ, বাসস্থান ও রাত্রি যাপনে পরিপূর্ণ ইনসাফ ও সমতা রক্ষা করবে। মানুষের যিম্মাদারী তার সাধ্য ও শক্তির সীমা পর্যন্ত। যদি সে ইচ্ছাকৃত কোন বাড়াবাড়ি না করে, সবাইকে সমান। দৃষ্টিতে দেখে এবং সবার সাথে একই ব্যবহার করে, তবে মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা ও ছোট-খাট, দোষ-ত্রুটি হলে আল্লাহ্ তাআলা তা ক্ষমা করবেন। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার না করলে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন না। তবে অনিচ্ছাকৃত কিছু হলে তা ক্ষমা করবেন।

হযরত আইশা সিদ্দিকা (রা) বর্ণনা করেন- "রাসূলুল্লাহ্ তার স্ত্রীদের মাঝে অধিকার আদায়ে পরিপূর্ণ সুবিচার করতেন এবং দু'আ করতেন, হে আল্লাহ্! এই আমার বন্টন, যা আমার সাধ্যে আছে। তুমি আমাকে সে বিষয়ে লজ্জিত করো না যা একমাত্র তোমার অধীনে, এবং আমার সাধ্যের অতীত।"

৭. স্ত্রীদের সংখ্যার সীমারেখা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

"সুতরাং তোমরা বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দু' তিন অথবা চার।"[৬৩৫]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মুসলিম মিল্লাতের সকল ফকীহ-ই এ বিষয়ে একমত যে, একই সময়ে শুধুমাত্র চার জন স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। হাদিসে উপরোক্ত আয়াতের সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "তায়েফের সরদার গীলান যখন ইসলাম কবুল করলেন, তখন তার নয়জন স্ত্রী ছিল। নবি কারিম (স.) তাঁকে আদেশ করলেন শুধুমাত্র চারজন স্ত্রী রেখে অন্যদেরকে ছেড়ে দাও।"

৮. ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ না করা

وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"এবং ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহকার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।"[৬৩৬]

---

৬৩৩. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ৩

৬৩৪. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ১২৯

৬৩৫. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৩) : ৩

অর্থাৎ ইদ্দত চলাকালে বিবাহের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে না। তবে হাঁ, যদি ইশারা ও ইংগিতে নিজের ইচ্ছা স্ত্রীলোকের নিকট পৌঁছানো হয়, তবে এতে দোষ নেই।

ইদ্দতের মধ্যে স্পষ্ট বিবাহের পয়গাম না দেওয়া

ইরশাদ হয়েছে,

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"এবং স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইংগিতে বিবাহ প্রস্তাব করলে অথবা তোমাদের অন্তওে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের বিষয়ে আলোচনা করবে, কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাদের নিকট কোন অংগীকার করো না।"[৬৩৭]

অর্থাৎ, স্ত্রীলোকদের ইদ্দতকালে তাদের নিকট প্রকাশ্যভাবে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবে না এবং কোন ওয়াদাও নেবে না। তবে হাঁ, যদি অন্তরে ইচ্ছা রাখ, কিংবা ইংগিতে নিজের ইচ্ছা তাদের নিকট পৌঁছাও তাতে দোষ নেই। কিন্তু ইদ্দতকালে প্রকাশ্যভাবে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

মাহ্‌র-এর আহকাম

১.মাহ্‌র দেওয়া ফরয

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"তারপর তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করেছো তাদের নির্ধারিত মাত্র অর্পণ করবে।"[৬৩৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য হালাল করা হলো যদি তোমরা তাদের মাহ্‌র প্রদান কর বিবাহের জন্য।"[৬৩৯]

২. প্রদত্ত মাহ্‌র ফেরত না নেওয়া

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবু তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে ? এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"[৬৪০]

---

৬৩৬. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৫

৬৩৭. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৬

৬৩৮. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ২৪

৬৩৯. আল-কুরআন, সুরা মায়েদা (৫) : ৫

৬৪০. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ২০-২১

বিবাহ একটি পাকাপোক্ত চুক্তি। একজন নারী এ ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হয়েই নিজকে একজন পুরুষের নিকট সঁপে দেয় যে, তারা উভয়েই জীবনভর সেই চুক্তি পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তারপর যদি দাম্পত্য জীবনের আনন্দ ও সুখ ভোগ করার পর পুরুষ লোকটি স্বেচ্ছায় সেই চুক্তি ভংগ করতে চায়, তবে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সময় দেওয়া মালামাল ফেরত লওয়ার তার কি অধিকার থাকে? এবং কোন মুখে সে দেওয়া মালামাল ফেরত চাইতে পারে?

২. সম্ভোগ হয়নি এমন মহিলার মাহ্‌র

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"আর যদি তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথচ মাহ্‌র ধার্য করে থাক, তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক।"[৬৪১]

৪. মাহ্‌র আদায়ে উদারতা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় এবং মাফ করে দেওয়াই তাক্ওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[৬৪২]

সমাজ জীবনে আইনের অধিকারেরও বড় গুরুত্ব রয়েছে। তবে সমাজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আইনের অধিকারের উপর নির্ভর করে থাকাই ঠিক নয়, বরং মানুষের সম্পর্ক ও সমাজ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পরস্পর দয়া-দাক্ষিণ্য ও উদারতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৫. মাহ্‌র ক্ষমা করা নারীর অধিকার

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- إِلا أَنْ يَعْفُونَ "যদি না স্ত্রী মাফ করে দেয়।"[৬৪৩]

মাহ্‌র যেহেতু স্ত্রীর হক, তাই তা তখনই মাফ হতে পারে যখন স্ত্রী স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয়।

৬. মাফ করে দেওয়া মাহ্‌র স্বামীদের সম্পদ

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"যদি সন্তুষ্ট চিত্তে তারা (স্ত্রীগণ) মাহ্‌রের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।"[৬৪৪]

স্ত্রীদের সদা-সর্বদা এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তাদের মাহ্‌র স্বামীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। স্ত্রী ইচ্ছা করলে আংশিক কিংবা পুরো মাহ্‌রই ক্ষমা করে দিতে পারে। স্ত্রীর ক্ষমা করা মাহ্‌র স্বামীর সম্পদ। সুতরাং স্বামী যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারে।

৭. স্বেচ্ছায় ও খুশী মনে যে মাহ্‌র মাফ করা হয়েছে তা মাফ

ইরশাদ হয়েছে,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

---

৬৪১. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৭

৬৪২. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৭

৬৪৩. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৭

৬৪৪. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ৪

"এবং তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে, সন্তুষ্টচিত্তে তারা মাহ্রের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।"[৬৪৫]

মাহ্র ক্ষমা করার একমাত্র অধিকার স্ত্রীদের। এ কারণে যদি তারা ক্ষমা করে তবে ক্ষমা হবে। তবে কুরআনের ভাষায়,

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا

"যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে মাহ্রের কিয়দংশ ছেড়ে দেয়।"

বুঝা যায় যে, এতে স্ত্রীদের সন্তুষ্টির প্রতি পুরোপুরি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গৃহের পরিবেশ কিছুতেই এমন করা যাবে না যে, যাতে কোন লোভ কিংবা স্বার্থের কারণে স্ত্রী বাধ্য হয়ে মাহ্র ক্ষমা করে অথচ প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী মাহ্র ক্ষমার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ কারণেই হযরত উমর ফারূক (রা) ও কাযী শুরায়হ (রা)-এর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন স্ত্রীলোক মাহ্রের কিয়দংশ কিংবা পুরো মাহ্র ক্ষমা করে দেয় এবং পরবর্তীতে যদি সে তা দাবী করে, তবে স্বামীকে অবশ্যই মাহ্র আদায় করতে হবে। যদি স্বামী স্বেচ্ছায় তা প্রদানে রাযী না হয়, তবে তাকে আইন প্রয়োগ করে মাহ্র আদায়ে বাধ্য করতে হবে। স্ত্রীর মাহ্র দাবী করার মর্ম হলো, সে স্বেচ্ছায় তা ক্ষমা করেনি। বরং কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে তা ক্ষমা করতে বাধ্য হয়েছিল।

৮. বিবাহকালে যার মাহ্র নির্ধারিত হয়নি তাকে কিছু দেওয়া

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

"যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মাহ্র ধার্য করেছ, তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করো, বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সামর্থানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে, এ সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।"[৬৪৬]

উপরোক্ত বিধান সে স্ত্রীলোকের জন্য যাকে তার স্বামী হাত লাগায়নি। তবে যাকে তার স্বামী ব্যবহার করেছে, তাকে তার বংশীয় অপরাপর মেয়েদের মাহ্রের সমপরিমাণ মাহ্র প্রদান করতে হবে।

৯. স্ত্রীর মাহ্র আত্মসাৎ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

"তোমরা তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) যা দিয়েছ তা থেকে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না।"[৬৪৭]

বিবাহ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর পরিশেষে বলতে চাই, বিবাহ বন্ধন তাকওয়াহ বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম; বরং তা তার প্রকৃত মালিক ও মাবুদের নৈকট্য লাভ ও তাক্ওয়ার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার এক উৎকৃষ্ট পন্থা। হাদীসের ভাষায় বিবাহ হচ্ছে ইমানের অর্ধেক। বিবাহের মাধ্যমে বান্দাহ তার অর্ধেক ইমান হিফাজতের নিশ্চয়তা লাভ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৬৪৫. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ৪

৬৪৬. আল-কুরআন, সুরা বাকারা (২) : ২৩৬

৬৪৭. আল-কুরআন, সুরা নিসা (৪) : ১৯

সংযমশীলতা

যুবকদের জন্য সংযমশীলতা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ও সংযমশীলতার দ্বারা উভয়ের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। তারা সমাজসেবা করে উচ্চ মর্যাদা লাভে সক্ষম হতে পারে। তবে এটাও সত্য যে, চারিত্রিক পবিত্রতা ও যৌন সংযমের জন্য যুবকদের কেবলমাত্র উপদেশ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। এজন্যে প্রয়োজন রয়েছে সুস্থ-সুন্দর সমাজ গঠন এবং ভালো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংস্কারমূলক সুদূর প্রসারী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যার মধ্যে রয়েছে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এমন বই, পত্র-পত্রিকা, ছায়াছবি ও পোশাক বর্জন করা। সময়মত দাম্পত্য জীবন আরম্ভ করার পথে সৃষ্ট বাধাবিঘ্ন যেমন অর্থাভাব, বাসস্থানের সংকট, মাতাপিতার পক্ষ হতে বাধা সৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে সংযমশীলতা

মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা সম্পর্কে ইসলাম বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। তাই ইসলাম বিবাহ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত সহজ করার এবং যেসব নারী-পুরুষ অবিবাহিত তাদের বিবাহে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছে। যদি তারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তাআলা অচিরেই তাদের সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যদি তারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে চায়। যুবক-যুবতীদের বিবাহ সম্বন্ধে অভিভাবকদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।"[৬৪৮]

অতঃপর যেসব লোক স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম, দরিদ্র বা বিবাহের খরচ বহনে অপারগ, তাদেরকে আয়াতে কুরআনের বিধান মতে আল্লাহর পক্ষ হতে যত দিন পর্যন্ত বিবাহের ব্যয়ভার বহন করার মত শক্তি না হয় ততদিন সংযম রক্ষা করে চলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।"[৬৪৯]

অনুরূপভাবে আমরা কুরআনুল কারীমে দেখি যে, কোন গরীব লোক যখন বিবাহের ইচ্ছা করে, তাকে সচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে যাতে সে বিবাহ করার সুযোগ পায়। এর দ্বারা সংযমশীলতার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এবং তার মঙ্গলজনক দিক বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সা) রোযাকে যুবকদের জন্য সংযমশীলতার সহায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের ব্যয় বহনে সক্ষম তারা যেন অবশ্যই বিবাহ করে। কারণ এটা দৃষ্টিকে সংযত এবং লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখার সহায়ক। আর যারা এতে অক্ষম তারা যেন রোযা রাখে। কারণ তা প্রবৃত্তিকে সংযত রাখে।"[৬৫০]

---

৬৪৮. আল-কুরআন, সুরা আন-নূর (২৪) : ৩২

৬৪৯. আল-কুরআন, সুরা আন-নূর (২৪) : ৩৩

৬৫০. মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০১৮, হাদিস নং ১৪০০; ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত খ. ৭, পৃ. ৩, হাদিস নং-৫০৬৬; ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, *মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ*, (প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.) খ. ৭, পৃ. ১৮৪, হাদিস নং ৪১১২

ইসলামে সংযমশীলতার মর্যাদা

সংযমশীলতার পথ অতি সম্মানিত ও উন্নত পথ । আর তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অধিক। যারা সংযমশীলতা অবলম্বন করেছেন এবং তার দরুন আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক হাদীসে তাদের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

" سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ:

"সাত প্রকার এমন লোক রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।"

ঐ সাত প্রকার লোকের মধ্যে এক প্রকার লোকের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ،

"আর ঐ ব্যক্তি যাকে একজন অতীব সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণী (তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য) আহ্বান করে, তখন উত্তরে সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি সকল বিশ্বের প্রতিপালক।"[৬৫১]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

" بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا ،

এক সময় তিনজন লোক ভ্রমণে বের হলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড়–তুফানে তারা আক্রান্ত হলেন। নিরুপায় হয়ে তাঁরা পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। ইত্যবসরে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড উপর হতে গুহার মুখে পতিত হয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। নিরুপায় হয়ে তারা এর সমাধানকল্পে পরস্পর বলাবলি করতে আরম্ভ করলো। একজন বললো, "কে কোন নেক কাজ করেছে তার উছিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর।" এরপর সকলে নিজ নিজ নেক আমল উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে লাগলো এবং প্রত্যেকের দু'আর শেষে ঐ প্রস্তর খণ্ড কিছু কিছু সরে যেতে আর করলো। তিনজনের দু'আর শেষে দেখা গেল ঐ প্রস্তর খণ্ড সম্পূর্ণ সরে গেছে। এ ব্যক্তির মধ্যে একজনের দু'আ ছিল নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةُ عَمٍّ، مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ، إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ المِائَةَ دِينَارٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا "

"হে আল্লাহ! তুমি জানো, আমার এক চাচাতো বোন ছিল যাকে আমি পৃথিবীর সকল লোক হতে অধিক ভালবাসতাম। এক সময় আমি তাকে তার দেহ ভোগের বাসনা জানালাম। কিন্তু সে একশ দীনার ব্যতীত একাজে রাযী হলো না। আমি অনেক চেষ্টা করে তা যোগাতে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে দান করলাম। তাতে সে রাযী হলো। এরপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মধ্যস্থলে উপবেশন করলাম, তখন সে আমায় বললো, আল্লাহকে ভয় কর। হক আদায় ব্যতীত এই মহর উন্মোচন করো না অর্থাৎ হালাল উপায় ব্যতীত এ কাজে লিপ্ত হয়ো না। শুনে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। একশ দীনার ছেড়ে দিলাম। যদি তুমি জানো যে আমি একমাত্র তোমার ভয়েই তা পরিত্যাগ করেছি, তাহলে আজ আমাদের হতে এ প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে নাও। অতঃপর আল্লাহ্ প্রস্তর সরিয়ে নিলেন এবং তারা বেরিয়ে পড়লো।"[৬৫২]

---

৬৫১. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রথম প্রকাশ ১৪২২ হি., খ. ২, পৃ. ১১১, হাদিস নং-১৪২৩

৬৫২. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৩, হাদিস নং-৫৯৭৪

তার দু'আ কবূল হওয়ার একমাত্র কারণ হলো আল্লাহর ভয়। কেননা সে আল্লাহকে ভয় করলো এবং নিজের প্রবৃত্তিকে বাঁচিয়ে রাখলো আল্লাহর ভয়ে। ঐ কাজের সুযোগ পেয়েও তা পরিহার করলো। আর ঐ মেয়েটির কথায় অনুপ্রাণিত হলো। যখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাপ ত্যাগ করলো তখন আল্লাহ্ও তার মুসীবত দূর করলেন।

সংযমশীলতার সওয়াব উল্লেখ করে রাসূলুল্রাহ্ (সা) বলেন,

«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ»

"যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থান সম্বন্ধে আমার কাছে কথা দিতে পারে আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব।"[৬৫৩]

কুরআনে সংযমশীলতার দৃষ্টান্ত

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইউসূফ (আ)-এর উল্লেখ করেছেন, তিনি সংযমশীলতার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে তাঁর মালিকপত্নী যৌন কাজের প্রতি আহ্বান করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করেন। তিনি তার আহ্বানে সাড়া দেন নাই অথচ এ কাজের সর্ব প্রকার উপকরণই তাঁর আয়ত্বে ছিলো।

সংযমশীলতা রক্ষার সহায়ক

১. দৃষ্টিকে সংযত রাখা

যে সকল কাজ সংযমশীলতায় সহায়ক হয় তা সাধনে দৃষ্টি নীচু রাখা ও কামভাব না রাখা অন্যতম। কেননা মানুষের মধ্যে কামভাবকে উত্তেজিত করতে দৃষ্টির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামের এক দূরদর্শিতা যে, ইসলাম এ ব্যাপারকে মানুষের মনস্তত্ত্ব ও স্বভাব-চরিত্রের পারদর্শী একজন বিজ্ঞ সুবিবেচক ব্যক্তির ন্যায় এ ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে, যাতে কামভাব চরিতার্থের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে একটা নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর আওতায় এনে তার দ্বারা সুফল লাভ করা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম, তারা যা করে আল্লাহ যে বিষয়ে অবহিত।

মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ যারা তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষের মধ্যে যৌন কামনারহিত পুরুষ এবং নারীদের কারো গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আবরণ প্রকাশ না

---

৬৫৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ১০০, হাদিস নং-৬৪৭৪

করে। তারা যেন তাদেও গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সকলে সফলকাম হতে পার।"[৬৫৪]

অতএব, কুরআন নারী-পুরুষ সম্পর্কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় উচ্ছৃংখলতার চিকিৎসা করে। তাই মানুষের জন্য চারিত্রিক অধঃপতন ও পাপানুষ্ঠান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাই শুধু যথেষ্ট নয়। বরং তাকে ঐ সকল আনুষঙ্গিক কার্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যা মানুষকে পাপের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর তা হলো কামোদ্দীপক জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। কেননা, কামভাবকে উত্তেজিত করতে দৃষ্টির বুনিয়াদী ভূমিকা রয়েছে।

অতএব, কুরআন প্রত্যেক নারী-পুরুষকে তাদের চক্ষু নিচু রাখতে এবং যৌন অঙ্গকে সংযত রাখতে আদেশ করে। আর যৌন অঙ্গকে সংযত রাখাও চক্ষু নিচু রাখার স্বাভাবিক ফল। অতঃপর এ আদেশের কারণ বর্ণনা করে বলেন,

ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ "এটাই তাদের জন্য উত্তম।"

অর্থাৎ এটা নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং চরিত্রকে পবিত্রকারী ।

একদিকে নারী জাতির আকর্ষণীয় ও মনোরম অঙ্গগুলো রক্ষা করা যেমন জরুরী অপরদিকে সেগুলোর দ্বারা পুরুষকে পথভ্রষ্ট না করাও জরুরী। এদিকে লক্ষ্য করে কুরআনুল করীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

"তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"

'খিমার' হচ্ছে ঐ ওড়না যা দ্বারা মেয়েরা তাদের মস্তক আবৃত রাখে আর 'জাইব' বলা হয় কাপড়ের খোলা অংশ যা বক্ষদেশের সাথে মিলিত থাকে। বলা হচ্ছে যে, মেয়েরা খিমার বা ওড়না দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ঢেকে রাখবে, যে অংশ সাধারণত প্রকাশ থাকে, যেমন হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল। হস্তদ্বয় উন্মুক্ত রাখা বৈধ, যদি তাতে কোন ফেতনার আশংকা না থাকে। কারণ রাসূল (সা) আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)-কে বলেছিলেন,

يَا أَسْمَاءُ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا، وَهَذَا " وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"হে আসমা! নারী যখন বালেগা হয়, তখন তার অঙ্গের এ অংশ ব্যতীত অন্য কিছু দেখা যাওয়া অনুচিত।"[৬৫৫]

এ অংশ বলতে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নারী জাতির স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম তাদের জন্য সৌন্দর্যচর্চা বৈধ রেখেছে। আর প্রত্যেক নারীই সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আসক্ত, যেন তাকে রূপসী দেখায়। ইসলাম তাদের এ স্বাভাবিক আকর্ষণে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। তবে তাকে সুশৃঙ্খল ও কতিপয় নীতিমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। তাই সৌন্দর্য প্রকাশ কেবলমাত্র স্বামী ও যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ এরূপ নিকটাত্মীয়দের বেলায় জায়েজ রাখা হয়েছে। যাদের মধ্যে তাদের সৌন্দর্য দৃষ্ট হওয়ার পর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না।

কুরআন এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরও ইরশাদ করেছে,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

"তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরো পদক্ষেপ না করে।"

অঙ্গভঙ্গী বা শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়াদি ইশারা-ইঙ্গিতও কামভাবকে উত্তেজিত করতে সহায়তা করে। আর তা ক্রমান্বয়ে ব্যভিচার ও অপকর্মের দিকে নিয়ে যায়।

---

৬৫৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

৬৫৫. ইমাম বায়হাক্বী রহ. *শু'আবুল ঈমান*, (রিয়ায : মাকতাবাতুর রুশদি লিন্নাশরি ওয়াত্তাওযী, প্রথম প্রকাশ: ২০০৩) খ. ১০ , পৃ. ২১৯, হাদিস নং ৭৪০৯

মানুষ নানা স্বভাবে বিজড়িত থাকে। অনেক সময় তার সভ্যতা সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়। অতএব নারীর কোন আকর্ষণীয় অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি পড়লে বা চারিত্রিক পবিত্রতা ও তার কামোদ্দীপক দৃষ্টির সম্মুখীন হলে এমন কোন অঙ্গভঙ্গী যাতে যৌন কামভাব উত্তেজিত হয়, তখন সে নিজেকে আয়াত্ত রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ সকল অবস্থার প্রতি ইসলাম পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করেছে। তাই সে সব অবস্থা থেকে বাঁচার পন্থা উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনেক উপদেশ রয়েছে, যেমন তিনি আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে বলেছেন,

" يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ "

"হে আলী! একবার দৃষ্টি পড়ার পর পুনঃ দৃষ্টি করো না, প্রথম দৃষ্টি তো তোমার জন্য বৈধ হলেও পুনঃদৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়।"[৬৫৬]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নারী ও পুরুষের একে অন্যের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিকে চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ، "চক্ষুদ্বয় ব্যভিচার করে, আর এদের ব্যভিচার হলো দৃষ্টি।"[৬৫৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোভনীয় দৃষ্টিকে ব্যভিচার বলে আখ্যায়িত করেছেন কারণ তাও অবৈধভাবে কামভাবের পরিতৃপ্তি এবং উপভোগের এক প্রকার।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, "আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অকস্মাৎ দৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি আমাকে এ অবস্থায় চক্ষু সরিয়ে নিতে বলেছেন।"[৬৫৮]

আর হঠাৎ দৃষ্টি হলো যা দর্শকের অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রথম দৃষ্টিতেই দৃষ্টিকে অনেক্ষণ ধরে রাখে বা দ্বিতীয়বার ইচ্ছা করে দৃষ্টি দেয়, তবে নিশ্চয়ই পাপ হবে।

২. নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা

মানুষের শরীরের যে সকল অঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজিব এবং যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ অবৈধ ঐ সকল অঙ্গকে শরীয়াতের ভাষায় 'আওরাত' বলা হয়।

একজন গায়রে মাহরাম বা পর পুরুষের সম্মুখে নারীর সর্বাঙ্গই আওরত চেহারা এবং হস্তদ্বয়ের পাতা ব্যতীত। কিন্তু কোন পুরুষের জন্য প্রয়োজন ব্যতীত পর নারীর চেহারা বা মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করার অভিপ্রায় বৈধ নয়। যদি হঠাৎ কোন সময় অনিচ্ছায় তার প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সে চক্ষু নিচু করে নেবে। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন উপস্থিত হয় (মুখোমুখি কথা বলা অথবা ক্রয়–বিক্রয়) তখন তার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করা বৈধ। যেন লেনদেনের ব্যাপারে তাকে চেনা যায়। যেরূপ একজন মুসলমান বিশ্বস্ত চিকৎসকের জন্য নারীর শরীরের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ বৈধ। অনুরূপভাবে যখন কোন নারী স্রোতে পড়ে পানিতে ডুবে যাচ্ছে তখন উদ্ধারকারী পুরুষের জন্য তার শরীরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া বৈধ; যেন তাকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করা যায়।

আর এক নারীর সঙ্গে অন্য নানা আওরত হলো-তার শরীরের একটি বিশেষ অংশের প্রতি নিষ্প্রয়োজনে তার বোনের দৃষ্টি নিক্ষেপও বৈধ নয়, আর তা হলো- নাভী এবং হাটুর মধ্যবর্তী অংশ।

---

৬৫৬. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ, মুয়াস্সাতুর রিসালাহ,* (প্রথম প্রকাশ, ২০০১ খৃ.) খ. ২৮, পৃ. ৯৫, হাদিস নং ২২৯৯১; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান,* (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রকাশকাল, ১৯৯৮ খৃ.) খ. ৪, পৃ. ৩৯৮।

৬৫৭. ইমাম বায়হাক্বী রহ., *আস-সুনানুল কুবরা,* প্রাগুক্ত, খ. ৭. পৃ. ১৪৩, হাদিস নং ১৩৫১১

৬৫৮. মুসলিম, *আস-সহিহ,* প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৬৯৯, হাদিস নং ২১৫৯।

এতো হলো ইসলামের বিধান, কিন্তু ঐ সকল নারী এবং মুসলিম নন্দিনীদের সম্পর্কে বলা যায়, যারা মিনিস্যুট পরিধান করে রাস্তাঘাটে সভা-সমিতিতে তাদের উরু উন্মুক্ত করে এবং পরপুরুষেরা তা দেখে অথচ তাদের ঈমান ও লজ্জাশীলতা তাদেরকে এসব পরিধান করতে বাধা দেয় না এবং তাদের পরিজন একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, তদুপরি তারা এ সকল পোশাককে সৌন্দর্যের উপকরণ ও সময় উপযোগী বলে বর্ণনা করে থাকে। এ সকল অর্ধ পোশাকের ধারক-বাহক কারা? লন্ডন, নিউইয়র্ক ও ফ্রান্সের শয়তানি পোশাক নির্মাতা এবং পরিধানকারীরাই তো এর ধারক-বাহক। তারাই লজ্জা ও চারিত্রিক ন্যায়নীতির কোন তোয়াক্কা না করে এ সকল পোশাক তৈরি করে থাকে। এর দ্বারা নৈতিক ও সামাজিক যে ক্ষতি হবে সেদিকে তারা নজর দেয়নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাদের পণ্যের বিক্রি এবং দোকানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

অতএব, কোন সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বা মানবতায় বিশ্বাসী লোক কি এটা মেনে নেবে যে, সমাজ এ সকল অশ্লীলতা গ্রহণ করুক? এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও সেই ফাসিকদের মতো হোক, আর ইসলাম আমাদেরকে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। তা পরিত্যাগ করবো –যার মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

"হে পাশ্চাত্য পোশাক অন্বেষণকারী, কত স্বল্প তোমাদের জ্ঞান!" আমরা উত্তম কার্যে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করবো, আর অনুকরণ করবো যা আমাদের বিরোধী না হয়, আর আমরা নিশ্চয়ই তাদের অশ্লীল কার্যাবলী ও শালীনতা বিবর্জিত আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করবো।

৩. সৌন্দর্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা

কুরআন নারী জাতিকে পর পুরুষদের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করে এবং একে অন্ধকার যুগের ঘৃণিত কাজ বলে উল্লেখ করেছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

"প্রাচীন অজ্ঞতা যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না।"[৬৫৯]

সৌন্দর্য প্রকাশ করা এবং চক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরাকে কুরআনে 'তাবারুজ' বলা হয়েছে। এরূপ প্রদর্শনকে ইসলাম নিষেধ করেছে। কেননা এর দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নারী অপহরণ জাতির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এদেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এ সকল দেশের পত্র-পত্রিকা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদেরকে এমন মিহি কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, যে মিহি কাপড় পরিধান করার পর ভিতরের সব কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় এবং দর্শকের চক্ষু হতে ঐ সকল অঙ্গ ঢাকা হয় না। কিয়ামতে এ প্রকারের দূষণীয় কথা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন,

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

"অনেক নারী আছে যারা উলঙ্গ, আল্লাহর অবাধ্য, পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী, তাদের মাথা-মুখ উটের পিঠের কুঁজের মতো। তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং তার ঘ্রাণও পাবে না; বেহেশতের সুঘ্রাণ বহুদূর থেকেও অনুভূত হয়।"[৬৬০]

অর্থাৎ তারা বস্তুত বস্ত্র পরিধান করেও উলঙ্গ। কেননা তাদের পরিধেয় কাপড় ঢেকে রাখার কাজ করে না অর্থাৎ কাপড় পাতলা হওয়ার দরুন কাপড়ের নিচের অংশগুলো প্রকাশিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নারীদেরকে ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় কড়া ঘ্রাণের আতর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন যা কামভাবকে উত্তেজিত করে।

---

৬৫৯. আল-কুরআন, সুরা আহযাব (৩৩) : ৩৩

৬৬০. হাফিজ মুনযিরী, *মুখতাসারুস-সহিহ*, (বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ষষ্ট প্রকাশ: ১৯৮৭) খ. ২, পৃ. ৩৬৮, হাদিস নং ১৩৮৮।

৪. অশ্লীল সিনেমা থেকে বিরত থাকা

সংযমশীলতা রক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চলচ্চিত্রের সংস্কার সাধন এবং যৌন ফিল্ম দেখা থেকে বেঁচে থাকা। সিনেমা যেমন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সহায় হয়, তদ্রূপ তা নৈতিক অবক্ষয়েরও কারণ হয়। শুরুতে সিনেমার প্রতি কতকগুলো বিশেষ শর্ত আরোপ করা হতো। যাতে সিনেমা নৈতিক অধঃপতনের কারণ না হয়। কিন্তু বর্তমানে সিনেমা চরিত্র ধ্বংসের অপরাধ প্রবণতার প্রধান কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। সিনেমা বর্তমানে শয়তানি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগে সিনেমা ব্যবসায়ীগণ পূর্ণমাত্রায় ব্যবসায়ী। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন। নৈতিকতার হিফাজতের প্রতি তারা আদৌ দৃষ্টি দেয় না। দীন ও দীনী রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে তারা যুব সমাজের মন জয় করে, তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করে, চরিত্র ধ্বংসকারী চলচ্চিত্র ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ তৈরি ও প্রদর্শনের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতায় নামে। তাই এসব কুরুচিশীল সিনেমার দ্বারা যুবক ও যুবতীদের সামনে বিপথগামিতার পথ উন্মুক্ত করেছে। এসব বাজে সিনেমার দ্বারা তারা যুব সমাজের চারিত্রিক অবক্ষয় সাধন করে তাদের জীবনকে কলুষিত করেছে। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাগৃহগুলো হয়েছে ফাসাদের কেন্দ্রে। মানবতার প্রতি অবমাননাকর চরিত্র প্রদর্শনের মাধ্যম। যেগুলিতে প্রদর্শিত হয় যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, চুরি, রাহাজানি, হত্যা, দাম্পত্য জীবনের খেয়ানত ইত্যাদি অপরাধের আপত্তিকর ছবি-এসব ছবি হয় লজ্জা ও ভদ্রতার পরিপন্থী। সিনেমার অপকারিতাকে অনেকে ছোট করে দেখে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অপকারিতা মারাত্মক। এসব ক্ষতিকর সিনেমার প্রভাব দর্শকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পড়ে থাকে। তবে দর্শকের বয়স ও রুচির পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দুর্বলচেতা স্বল্পবুদ্ধি কুরুচিপূর্ণ যুবক যখন সিনেমার পর্দায় যৌন অপরাধ, হত্যা ও অন্যান্য আপত্তিকর চিত্র দেখে তখন সে এসব অপরাধের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এসব অপরাধ নিজেও করতে চেষ্টা করে। সে সমাজের জন্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমরা অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ করছি যে, তারা যেন এসব যৌন ফিল্ম দেখা থেকে নিজেদের সন্তানদেরকে বিরত রাখেন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তব্য হচ্ছে এসব ফিল্ম দেখা থেকে বিরত থাকার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং এসব ফিল্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা।

আজকাল শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের প্রচলন নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই ছবি দেখা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন।

৫. অশ্লীল পত্রপত্রিকা প্রকাশ না করা

চরিত্র ও মন্দকাজে উৎসাহিত করার আরেকটি উপকরণ হচ্ছে উলঙ্গ ছবি সম্বলিত অশ্লীল পত্রপত্রিকা যা কোন কোন আরব রাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। নব্য সমাজে এর প্রতিক্রিয়া খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। এতে যে সব ছবি থাকে তা শুধু যে উলঙ্গ ছবি তাই নয় বরং ব্যভিচারের প্রতি উত্তেজিত করে এমন ছবিও এসব পত্রপত্রিকায় থাকে। এসব ছবি দেখার পর যুব সমাজ নৈতিক অবক্ষয়ে পতিত হয় এবং খারাপ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এসব পত্রিকার আপত্তিকর ও উত্তেজক ছবি এবং দৃশ্য দেখে যুব সমাজ সময়ের পূর্বে যৌন ক্ষুধা মিটানোর জন্য তৎপর হয় এবং অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয়।

৬. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রোধ করা

খারাপ কাজে উৎসাহ দানকারী এবং সংযমশীলতা বিনষ্টকারী আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ নয় এরূপ মহিলাদের সাথে অবাধ মেলামেশা। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ মহিলাদের সাথে আলিঙ্গন নৃত্য ও সাঁতার ইত্যাদি নানা কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ ভিন্ন মহিলাদের সাথে অনেকক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেলামেশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এরূপ মেলামেশার দ্বারা উত্তেজনার চরম মুহূর্তে পৌঁছে যৌন ক্ষুধা মিটানোর এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যেখান থেকে ফিরে আসা এবং অপকর্ম থেকে

নিজেদের রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বরং চাহিদা ও উত্তেজনার সামনে উভয়কেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নৈতিকতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অবৈধ পথে একবার পা বাড়ালে পরে অভ্যাসে পরিণত হয়। এ মন্দ পথ থেকে ফিরে আসা তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। চারিত্রিক পবিত্রতাই হচ্ছে মানুষের জন্য মূল্যবান সম্পদ। চরিত্র ধ্বংস হলে মানুষের আর কোন মূল্য থাকে না।

নারী-পুরুষের নির্জন মেলামেশায় আরেকটি ক্ষতিকর বস্তু হচ্ছে মদ্যপান। নেশা করার পর প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাই নেশাগ্রস্ত হওয়ার পর তারা এমন অপকর্ম করে বসে যদ্দরুন তাদের পরে লজ্জিত হতে হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার অপকারিতার দিকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»،

"কোন মহিলার সাথে তার মাহরমের অনুপস্থিতিতে যেন কোন পুরুষ নির্জনে না বসে। কোন মাহরম ব্যতীত কোন মহিলা যেন সফরে না যায়।"[৬৬১] অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ،

"কোন পুরুষ মহিলার সাথে নির্জনে গেলে তাদের মধ্যে তৃতীয় জন হয় শয়তান।"[৬৬২]

কতকগুলো ব্যাপারে মেয়েদের অসতর্কতা ও অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। সে সব ব্যাপার হচ্ছে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য চর্চা ও সাজসজ্জাসহ আপন ও স্বামীর এমন আত্মীয়দের সাথে অবাধ মেলামেশা যাদের সাথে বিবাহ অবৈধ নয়। মেয়েরা সাধারণত আত্মীয়তার উসিলায় এসব পুরুষের সাথে মেলামেশায় অসতর্ক থাকে। অথচ এতে দুর্ঘটনার সমূহ আশংকা রয়েছে। কারণ অনাত্মীয় পুরুষের সাথে মেলামেশার তুলনায় আত্মীয়ের মেলামেশা অধিক বিপর্যয়ের আশংকা রাখে। অনাত্মীয়-পুরুষ মেয়েদের সাথে সম্পর্কের দুর্বলতার দরুন কথাবার্তা ও মেলামেশায় সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে, পক্ষান্তরে আত্মীয়-পুরুষ আত্মীয়তার অসিলায় মেয়ের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা নির্জনতার সুযোগ পায়। এটাই অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্টতা ও পাপে লিপ্ত হওয়ার পথ সুগম করে।

তাই ইসলাম নারী সমাজকে আত্মীয়দের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আত্মীয়দের সাথে মেলামেশাকে মৃত্যুর মত আশংকাজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»

"তোমারা মেয়েদের কাছে গমন করাতে সাবধানতা অবলম্বন কর।" জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন,"দেবর সম্পর্কে আপনার কি মত?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "দেবর হচ্ছে মৃততুল্য।"[৬৬৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
যিনার শাস্তি

যিনা ব্যভিচার একটি ঘৃন্য নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ। তা যেমন বাহির চরিত্র ও মর্যাদাকে কলুষিত করে তদ্রুপ সমাজ ও সভ্যতাকেও ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। এই অপকর্মের ফল স্বরূপ জন্মগ্রহণকারী একটি নিষ্পাপ ও নিরপরাধ মানুষকে সরা জীবনের জন্য কুপরিচয় বহন করতে হয় এবং হীনমন্যতার গ্লানি ভোগ করতে হয়। এটা ব্যাপকভাবে সমাজে প্রসার লাভ করলে যুবক-যুবতীরা সনাতন

---

৬৬১. মুসলিম, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: মাহরামের সাথে নারীর সফর, খ. ২, পৃ. ৯৭৮, হাদিস নং ১৩৪১।

৬৬২. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৫। হাদিস নং ১১৭১

৬৬৩. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৭, হাদিস নং- ৫২৩২; ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৬৫। হাদিস নং ১১৭১

বিবাহ পদ্ধতিতে জড়িত না হয়ে পশুদের মত চরম পাশবিক যৌনতায় মেতে ওঠে। বর্তমানে পশ্চিমা সমাজে যৌন স্বাদ আস্বাদনের কোন সীমা বা নৈতিক বিধি-নিষেধের পরোয়া করা হয় না। যিনা সে সমাজে নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপাররূপে গণ্য। এ কারণেই সেখানে পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তদুপরি এ অবৈধ যৌনকর্ম এইড্স নামক মারাত্মক ঘাতক ব্যাধির জন্ম দিয়েছে। এর ফলেই আজ বিশ্বের সচেতন জনসমাজ যিনা পরিহার করে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী বিবাহের মাধ্যমে যৌনকর্ম সমাধার জন্য প্রতিনিয়ত আহবান জানাচ্ছে। সকল ধর্মেই অভিন্নভাবে যিনাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে; তবে ইসলামি আইনে এর বীভৎস কদর্যতাকে অত্যন্ত প্রকট করে তুলেছে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। এর নিকটে যেতেও কঠিন ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

"তোমরা যিনার কাছেও যেয়ো না। কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জতা ও খুব বেশ্লি খারাপ পথ।"[৬৬৪]একজন ঈমানদারের জন্য তা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»

"কোন ব্যক্তি যখন যিনায় লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। সেটি তার উপর ছায়ার মত ঝুলে থাকে। সে এহেন কর্ম থেকে বিরত হয়, তখন আবার তার কাছে ঈমান চলে আসে।"[৬৬৫]

যিনার সংজ্ঞা

যিনার আভিধানিক অর্থ হল পাপকর্ম করা। সাধারণ অর্থে যিনা বলতে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌনমিলনকে বুঝানো হয়। ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় বিশুদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন কিংবা সন্দেহজনিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া বালিগ ও সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন দুজন নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে নারীর সামনের যৌনাঙ্গ দিয়ে পুরুষের সঙ্গমক্রিয়াকে যিনা বলা হয়। এটা হানাফী ইমামগণের প্রদত্ত সংজ্ঞার সার কথা। আল্লামা কাসানী বলেন,

أَمَّا الزِّنَا: فَهُوَ اسْمٌ لِلْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْلِ، مِمَّنْ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ الْعَارِي عَنْ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ وَعَنْ شُبْهَتِهِ، وَعَنْ حَقِّ الْمِلْكِ وَعَنْ حَقِيقَةِ النِّكَاحِ وَشُبْهَتِهِ.

শাফি'ঈগণের মতে, যিনা হলো.**وَهُوَ إِيلَاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ ذَكَرٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ مُشْتَهًى طَبْعًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ.**
"স্বভাবগতভাবে যৌনকামনাময়ী নিষিদ্ধ কোন লজ্জাস্থানের মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ ছাড়াই পুরুষাঙ্গ কিংবা তার মাথা প্রবিষ্ট করা।"

হাম্বলীগণের মতে,.**فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِيْ قُبُلٍ أَو ْدُبُرٍ** "সামনে কিংবা পেছনের দিকে অশ্লীল কাজ করাকে যিনা বলা হয়।"[৬৬৬]

যিনার শাস্তি

ক. পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে যিনার শাস্তি

---

৬৬৪. *আল-কুরআন*, সুরা বনী ইসরাইল (১৭) ঃ ৩২

৬৬৫. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯; ইমাম তিরমিযি, আস-*সুনান* (মিশর: মুসত্বাফা আল-বাযী আল-হালাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.,১৯৭৫ খৃ.), খ. ৫, পৃ. ১৫, হাদিস নং-২৬২৫

৬৬৬. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

ইসলামে বিবাহিত নর-নারীর ব্যভিচারের শাস্তি হল রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা)। কিন্তু এ শাস্তি নতুনভাবে ইসলামে প্রবর্তন করা হয়নি; বরং তাওরাতেও এ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে।[৬৬৭] হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারীর যিনা করার অপরাধের শাস্তির কথা জানতে চাইল। রাসূলুল্লাহ (স.) জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের তাওরাতে রজমের শাস্তি দেখতে পাও কি?" জবাবে তারা বললো, "এ রূপ অপরাধে আমরা তো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করি এবং তাদের দুররাও মারা হয়।" এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, "তোমরা মিথ্যা বলছো। তাওরাতে তো বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনার অপরাধে রজমের কথা বর্ণিত রয়েছে।" অতঃপর তাওরাত আনা হলো ও খুলে ধরা হলে একজন রজমের নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রাখল ও তার পূর্বের ও পরের অংশ পাঠ করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বললেন, তোমরা হাত তুলে ফেল। হাত তুলে নিতেই আয়াতটি সকলে দেখতে পেলেন। তখন ইয়াহুদীরা স্বীকার করল যে, তাওরাতে রজমের নির্দেশ স্পষ্ট ভাষায় লিখিত রয়েছে। অতঃপর তদনুযায়ী রজম করার নির্দেশ জারী করা হলো।

আর তাওরাতের যে বিধানগুলো রহিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তীতে অবতীর্ণ ইঞ্জিলের বিধানরূপেও গণ্য হয়ে থাকে। তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, তা সত্ত্বেও আজকের তাওরাতে সেই রজমের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।[৬৬৮] তবে বর্তমানে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা এ শাস্তি কার্যকর করে না। তাতে অবশ্য এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

খ. ইসলামে যিনার শাস্তির ক্রম বিবর্তন

ইসলামের আর্বিভাবের সময় আরব সমাজে যিনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এ অবৈধ যৌনচর্চায় কলুষিত সমাজকে সফলভাবে সংশোধন করার দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামে প্রথমবারেই তার চূড়ান্ত শাস্তির বিধান জারি করা হয়নি; বরং তা ক্রমে ক্রমে জারি হয়েছে, যাতে জনগণের পক্ষে তা গ্রহণ করা সহজ হয়। ইসলামের প্রথম দিকে বিবাহিতের ব্যভিচারের শাস্তি ছিল গৃহবন্দী করে রাখা। আর অবিবাহিতের শাস্তি ছিল কথা ও কাজের সাহায্যে কিংবা বেত্রাঘাত করে কষ্টদান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا.

"তোমাদের যেসব মহিলা নির্লজ্জতার কাজ করবে, তোমাদের মধ্য থেকে তাদের এ অপকর্মের চারজন সাক্ষী কায়িম করো। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখ, যতক্ষণ না তারা মৃত্যুবরণ করবে অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন উপায় বের করে দেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দুজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদেরকে কষ্ট দাও। তবে তারা যদি তাওবাহ করে নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে আর কষ্ট দিওনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে তাওবাহ কবুলকারী ও অতিশয় মেহেরবান।"[৬৬৯]

এখানে প্রথম আয়াতে "مِنْ نِسَائِكُمْ" বলে বিবাহিতাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে "وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا" দ্বারা অবিবাহিত নারী-পুরুষদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ দু'আয়াতে দু'ধরনের শাস্তির

---

৬৬৭. *সহিহ আল বুখারী*, (কিতাবুল মানাকিব), প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৩৪৩৪

৬৬৮. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; পুরাতন নিয়ম, দ্বিতীয় বিবরণ, সূত্র- ২১, ২২ ও ২৩

৬৬৯. *আল-কুরআন*, সুরা আন-নিসা (৪) : ১৫-১৬

কথা বলা হয়েছে। এ দু'ধরনের শাস্তির মধ্যে একটি ছিল অধিকতর কঠোর। আর তা বিবাহিতের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অপর শাস্তিটি ছিল হালকা। আর তা অবিবাহিতের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

এ আয়াতে ব্যভিচারিণীদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য অন্য কোন বিহিত ব্যবস্থা নির্দেশ করেন। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এ বিষয়ে অচিরেই একটি চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হবে। পরে সে বিধান নাযিল হয়েছে। হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।"[৬৭০]

এ হাদিস থেকে জানা যায়, যিনাকারীর অবস্থার পার্থক্যের কারণে যিনার শাস্তির মধ্যেও তারতম্য হবে। বিবাহিতের যিনার শাস্তি অবিবাহিতের তুলনায় অত্যন্ত কঠিন ও অধিকতর মর্মন্তুদ। এর কারণ এটা হতে পারে যে, অবিবাহিতদের হালাল পথে যৌনস্পৃহা পূরণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা যায় না। অপরদিকে বিবাহিত নারী-পুরুষের যেহেতু হালাল পথেই তাদের যৌন বাসনা পূরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে, তাই সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে বাইরে গিয়ে যিনা করার মানে হল তাদের মনের মধ্যে অন্যায় প্রবণতা বাসা বেঁধেছে, যা মূলোৎপাটন করা একান্তই জরুরী। তদুপরি তারা নিজেদের মান-মর্যাদা এবং তা লঙ্ঘনের পরিণতি ও বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত। এ কারণেই তাদের শাস্তি তুলনামূলক অধিকতর কঠিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক।

গ. যিনার শাস্তির প্রকারভেদ ও কার্যকর করার শর্ত

যিনার শাস্তি দু'প্রকার:

১. জালদ বা বেত্রদণ্ড

২. রজম বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

উভয় প্রকার শাস্তি ওয়াযিব হওয়ার কারণ হলো যিনা। তবে শর্তের দিক থেকে উভয়টিতে পার্থক্য রয়েছে। রজমের শাস্তি ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধীর মুহ্ছান হওয়া শর্ত পক্ষান্তরে জালদ বা বেত্রদণ্ড ওয়াজিব হওয়ার জন্য মুহ্ছান হওয়া জরুরী নয়।[৬৭১]

ঘ. অবিবাহিতের যিনার শাস্তি

অবিবাহিত বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম, নারী হোক বা পুরুষ- যদি যিনা করে, তার শাস্তি হল একশতটি বেত্রাঘাত।[৬৭২] আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

"ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী- তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর।"[৬৭৩] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন,

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ. "অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত।"[৬৭৪]

---

৬৭০. *সহিহ মুসলিম*, (কিতাবুল হুদূদ), প্রাগুক্ত, হা.নং: ১৬৯০

৬৭১. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

৬৭২. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪

৬৭৩. *আল-কুর'আন*, সুরা আন-নূর (২৪) ঃ ২

৬৭৪. *আবু দাউদ*, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হা.নং-৪৪১৫

এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে বেত্রাঘাত করার পরও এক বছরের জন্য নির্বাসিত করতে হবে কি না- তা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীগণের মতে, ব্যভিচারীকে নারী হোক বা পুরুষ- এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে বিচারক যদি রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর মনে করেন, তাহলে হদ্দের অংশ হিসেবে নয়; তা'যীরী শাস্তির আওতায় এক বছরের জন্য নির্বাসন দিতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, পবিত্র কুরআনে তাদের শাস্তি হিসেবে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় খবরে ওয়াহিদের ভিত্তিতে এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেয়ার মানে হলো কুরআনের অকাট্য দলীলের ওপর অতিরিক্ত বৃদ্ধি সাধন, যা যুক্তিযুক্ত নয়।[৬৭৫]

শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, ব্যভিচারী -পুরুষ হোক বা নারী- তাকে এক বছরের জন্য অবশ্যই নির্বাসিত করতে হবে। তাদের প্রধান দলীল হল, ইতঃপূর্বে বর্ণিত হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর হাদিস, যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অবিবাহিত ব্যভিচারী -নারী হোক বা পুরুষ- প্রত্যেককে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে হবে।[৬৭৬] মালিকীগণের মতে, কেবল ব্যভিচারী পুরুষকেই এক বছরের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দেয়া ওয়াজিব। মহিলাদের জন্য নির্বাসন দণ্ড প্রযোজ্য নয়। তাঁদের বক্তব্য হলো, মহিলাদেরকে দূরে নির্বাসন দেয়া হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে। সে কোথায় থাকবে, কিভাবে দিন কাটাবে, তা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। তদুপরি তাকে একাকী অবস্থায়ও পাঠানো সম্ভব নয়। কোন অমাহরামের সাথে নির্বাসনে পাঠানো হলে, তাকে চরম ব্যভিচারের পথে ঠেলা দেয়া হবে। আর কোন মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে, যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি দান করা।[৬৭৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বিচারক প্রয়োজন ও কল্যাণকর মনে করলে এক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দিতে পারবে - এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের যে পরিবেশ-তাতে তাদেরকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নির্বাসনে পাঠানো হলে সংশোধনের পরিবর্তে তাদের আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে বেশি। যদি একান্ত প্রয়োজনই হয়, তাহলে তাদেরকে নির্বাসনের পরিবর্তে এক বছরের জন্য কারাগারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আটক রাখা যেতে পারে। এতে নির্বাসনের উদ্দেশ্যও অর্জিত হবে। সম্ভবত এ ধরনের অবস্থা বিবেচনা করেই হযরত আলী (রা) দু'জন অবিবাহিত নারী-পুরুষ যখন যিনা করল, তখন রায় দিলেন যে, তাদেরকে বেত্রাঘাত করতে হবে, নির্বাসন দেয়া যাবে না। কেননা, তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।[৬৭৮]

বেত্রাঘাত দণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি

বেত্রাঘাত দণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এগুলো হলো ঃ

১. প্রহারের ছড়িটি মাঝারি আকারের হতে হবে। অর্থাৎ বেশি মোটাও হবে না এবং বেশি সরুও হবে না। তদুপরি তাতে কোন গিরা থাকতে পারবে না।

২. প্রহারও মধ্যম মানের হতে হবে। বেশি জোরেও মারা যাবে না, যাতে তার প্রাণনাশ কিংবা কোন অঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে এবং এমন হালকাভাবেও মারা যাবে না, যাতে সে কোন কষ্টই অনুভব করবে না।

৩. শরীরের এক জায়গায় প্রহার করা যাবে না; বরং বিভিন্ন অঙ্গে ভাগ করে করে প্রহার করতে হবে, যাতে ত্বক ফেটে না যায় এবং কোন অঙ্গের ভীষণ ক্ষতি সাধিত না হয়।

---

৬৭৫. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৪৪

৬৭৬. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ.১৭১

৬৭৭. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৫০৪

৬৭৮. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৫

৪. মাথা, চেহারা, বক্ষ, পেট, গুপ্তাঙ্গ ও কটিদেশ প্রভৃতি স্পর্শকাতর অঙ্গে প্রহার করা জায়িয নেই।

৫. প্রহার করার জন্য মাটিতে শোয়ানো যাবে না। অনুরূপভাবে কোন কিছুর সাথে বেঁধে কিংবা গর্ত খুঁড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রহার করাও বিধেয় নয়। পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীকে বসা অবস্থায় প্রহার করতে হবে।[৬৭৯] হযরত আলী (রা) বলেন, "পুরুষদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং নারীদেরকে বসা অবস্থায় হদ্দের বেত্রাঘাত করতে হবে।" তবে ইমাম মালিকের মতে, মহিলাদের মতো পুরুষদেরকেও বসা অবস্থায় প্রহার করা হবে।[৬৮০]

৬. প্রহার করার জন্য সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা যাবে না। হানাফী ও মালিকীগণের মতে, পুরুষের ইজার বা শরীরের নিম্নাংশ আবৃতকারী বস্ত্র ছাড়া অন্যান্য কাপড় খুলে নেয়া হবে। তবে মহিলার কাপড় খোলা যাবে না। তবে তার গায়ে যদি কোন অতিরিক্ত কাপড় কিংবা চামড়ার কোন বস্ত্র থাকে, তাহলে তা খুলে নিতে হবে। শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, পুরুষ হোক বা নারী- কারো স্বাভাবিক বস্ত্র খুলা যাবে না। তবে চামড়ার কোন বস্ত্র থাকলে কিংবা মোটা কাপড়ের জুব্বা থাকলে তা খুলে নিতে হবে।

৭. বেত্রাঘাত করার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা হদ্দের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো- লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা, যাতে তারা অপরাধে লিপ্ত হতে সাহস না পায়। আর এ উদ্দেশ্য তখনই অতীব উত্তমভাবে অর্জিত হতে পারে, যখন তা প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে কার্যকর করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. "এক দল ঈমানদার যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৬৮১]

৮. ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাসের পর নিফাস[৬৮২] শেষে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৬৮৩]

ঙ. বিবাহিতের যিনার শাস্তি

বিবাহিত (মুহ্ছান)[৬৮৪] পুরুষ হোক বা নারী- যিনা করলে তার শাস্তি হল রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা)।[৬৮৫] এ শাস্তির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা ও কাজ - উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া গেছে। ইতঃপূর্বে হযরত 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে,

وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"বিবাহিতের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম।"[৬৮৬]

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত উনায়স আল-আসলামী (রা)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

---

৬৭৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৩২-২৩৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১০

৬৮০. আল-বাজী, *আল-মুন্তকা*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪২

৬৮১. আল-কুর'আন, সুরা আন-নূর (২৪) : ২

৬৮২. স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর তার যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নিফাস বলে। নিফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন।

৬৮৩. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৫-২৭৬; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৭৩; যায়ল'ঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ,৩, পৃ. ১৭৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৪৮

৬৮৪. 'মুহ্ছান' শব্দটি আরবী ইহ্ছন (إحصان) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহ্ছন শব্দের অর্থ কিল্লায় প্রবেশ করা। বলা হয় আহ্ছান (أحصن) অর্থাৎ সে কিল্লায় প্রবেশ করেছে। তাই (محصن) মুহ্ছন শব্দের অর্থ কিল্লায় প্রবেশকারী। পরিভাষায় মুহ্ছান (محصن) বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার সাথে সাতটি গুণ পাওয়া যায় ১. বুদ্ধিমান হওয়া, ২. বালিগ হওয়া ৩. স্বাধীন হওয়া, ৪. মুসলমান হওয়া ৫. সহিহ্ বিবাহ সম্পন্ন হওয়া এবং ৬. সহিহ্ বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সঙ্গম সংগঠিত হওয়া। কোন ব্যক্তির মাঝে এ শর্তগুলো পাওয়া গেলে সে মুহ্ছানরূপে পরিগণিত হবে।[৬৮৪] -*ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮২

৬৮৫. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪

৬৮৬. *আবু দাউদ*, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হা.নং: ৪৪১৫

فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে রজম কর।"

মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।[৬৮৭] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (স.) নিজেই যে কয়েকটি রজমের দণ্ড প্রদান করেছেন, তাও বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি রজম; কিন্তু তার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কি না - তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হলো- বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত নয়। রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফা রাশিদিনের যুগে বিবাহিতদের যিনার কিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফা রাশিদিন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন- এ ধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, বিবাহিতদের শাস্তি-রজমের ওপর ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬৮৮]

রজম কার্যকর করার পদ্ধতি

১. রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তাকে শক্তভাবে বাঁধার কিংবা গর্ত খুড়ে তার মধ্যে তাকে দাঁড় করানোর প্রয়োজন নেই। হযরত আবু সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হযরত মা'ইয (রা)-কে রজম করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন আমরা তাকে বাকী'র দিকে নিয়ে গেলাম। তাঁর জন্য আমরা গর্তও খনন করিনি, তাঁকে বাঁধিও নি।[৬৮৯] রজমের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মেয়ে হয়, তাহলে তাকে বসা অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। তার জন্য গর্ত খনন করা জরুরী কি না- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, গর্ত খনন করা আর না করা বিচারক কিংবা শাসকের ইখতিয়ার। বিচারক কিংবা শাসক অবস্থানুপাতে যা ভাল মনে করবেন, তা-ই করতে পারবেন। ইমাম আবু ইউসুফ (রা) ও অন্যান্যের মতে, তাকে গর্তের মধ্যে দাঁড় করানোই উত্তম। কেননা গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হলে, তা হবে মহিলাদের পর্দার জন্য অধিকতর উপযোগী। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গামিদিয়্যাকে রজম করার জন্য তার বুক পর্যন্ত একটি গভীর গর্ত খনন করেছিলেন।[৬৯০] তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ) প্রমুখের মতে, গর্ত খনন না করাই উত্তম। তবে তার দেহ যাতে কোনভাবে প্রকাশ পেয়ে না যায়, এ জন্য কাপড় দিয়ে শরীরকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখা প্রয়োজন।

২. যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে শাস্তিদানের অনুষ্ঠানে সাক্ষীদের উপস্থিত থাকতে হবে এবং তারাই সর্বাগ্রে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করবে। যদি তারা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, তা হলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। অন্যান্যদের মতে, সাক্ষীদের উপস্থিতি জরুরী নয়।[৬৯১]

৩. প্রস্তর নিক্ষেপের সময় কেউ পালিয়ে যেতে থাকলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করতে হবে। কারো কারো মতে, যদি পালানোর আশঙ্কা থাকে, তা হলে তাকে কোন কিছুর সাথে বেঁধে রেখে কিংবা গর্ত খুড়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যাবে। তবে সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারী ব্যভিচারী

---

৬৮৭. *মুসলিম*, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, হা.নং: ১৬৯৭

৬৮৮. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৬৮৯. *মুসলিম*, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, হা.নং: ১৬৯৪

৬৯০. *মুসলিম*, *আস-সহিহ*, প্রাগুক্ত, হা. নং: ১৬৯৫

৬৯১. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৯-১০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১২

হলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা যাবে না; তার ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ স্থগিত রাখতে হবে। কেননা তার এ পলায়ন তার স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয়ার ব্যাপারে সন্দেহের জন্ম দেয়।

৪. বিশাল খোলামেলা জায়গায় রজম কার্যকর করা দরকার, যাতে কারো গায়ে কোন চোট লাগা ছাড়াই সহজে প্রস্তর নিক্ষেপ করা যায়। এ সময় বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনতার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। শাসক কিংবা তাঁর কোন প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত থাকবেন। লোকজন নামাযের কাতারের মতো বিভিন্ন সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়াবে। একদল প্রস্তর নিক্ষেপ করার পর পেছনে সরে যাবে আর অন্য এক দল এগিয়ে এসে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। এটা হানাফীগণের অভিমত। হাম্বলী ও শাফি'ঈগণের মতে, যিনা যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগে প্রমাণিত হয়, তাহলে তারা অপরাধীকে বৃত্তাকারে চারদিক থেকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে, যাতে সে কোনভাবে পালাতে না পারে। তবে হাম্বলীগণের মতে, স্বেচ্ছায় স্বীকৃতিদানকারীর ক্ষেত্রে এরূপ না করাই উত্তম। যাতে সে পালিয়ে শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।[৬৯২]

৫. পাথরের আকার মাঝারি অর্থাৎ সহজে হাতে বহনযোগ্য হতে হবে। তার আকার খুব বড়ও হবে না, যাতে সে খুব দ্রুত মারা যায়। আর তাতে প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড দানের উদ্দেশ্যই ক্ষুন্ন হবে। আবার এমন ছোটও হবে না, যাতে মৃত্যু খুবই বিলম্বিত হয় এবং পীড়ন দীর্ঘায়িত হবে।

৬. মালিকীগণের মতে, নাভী থেকে দেহের ওপর পর্যন্ত সহজে আক্রান্ত হয়–এরূপ দেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয়। তবে চেহারা ও গুপ্তাঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করা সমীচীন নয়। হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, চেহারার একটি বিশেষ মর্যাদা থাকার কারণে প্রস্তরের আঘাত থেকে তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৭. ব্যভিচারিণী গর্ভবতী হলে গর্ভ খালাসের পর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

যদি সন্তানকে স্তন্যদান করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে দুধ পানের মেয়াদ শেষ হবার পরেই শাস্তি কার্যকর করা হবে।[৬৯৩]

রজমের পরবর্তী কার্যক্রম

প্রস্তর নিক্ষেপে সংশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সাথে একজন মৃত মুসলিমের মত আচরণ করতে হবে। তাকে গোসল করাতে হবে, কাফন পরাতে হবে, তার জানাযা পড়তে হবে এবং যথারীতি মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। হযরত মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

اِصْنَعُوْا بِه مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ.

"তোমরা তোমাদের মৃত মুসলিমদের সাথে যেরূপ আচরণ করে থাকো, তার সাথেও সে একই রূপ আচরণ কর।"[৬৯৪] তদুপরি তিনি নিজেই গামিদিয়্যার জানাযা পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মালিকীগণের মতে, মুসলিম শাসক নিজে তার জানাযা পড়বে না। অন্যরা পড়বে। তাঁর কথার দলীল হল, হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মা'ইযের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন বটে, তবে তার জানাযা পড়েন নি।[৬৯৫]

চ. যিনার শাস্তির শর্তাবলী

---

৬৯২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২২৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৪০

৬৯৩. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭৪-২৭৫; ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৬৯৪. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, প্রাগুক্ত, হা.নং: ১১০১৪

৬৯৫. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

১. মুসলিম হওয়া

যিনার অপরাধে লিপ্ত নর-নারীকে মুসলিম হতে হবে। যদি কাফির পুরুষ কাফির নারীর সাথে যিনা করে, তাহলে তাদের ওপর শরী'আতের হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয় শাস্তি কিংবা তাদের ধর্মীয় শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি কোন কাফির কোন মুসলিম নারীর সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে, তাহলে মালিকীগণের মতে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে না; তবে মুসলিম মহিলার ওপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করা হবে। যদি সে মুসলিম নারীকে জোরপূর্বক যিনা করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ)-এর মতে, মুসলিম হোক কিংবা যিম্মি (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) সকলের ওপর হদ্দের বিধান কার্যকর করা হবে।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন (মুকাল্লাফ) হওয়া

যিনার অপরাধে লিপ্ত নর বা নারীকে মুকাল্লাফ (শরী'আতের নির্দেশাবলী পালনে আদিষ্ট) অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক নর বা নারী কিংবা পাগলরা যদি যিনা করে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না; তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং তা'যীরের আওতায় আদালত তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবে।[৬৯৬]

৩. পুরষাঙ্গ নারীর জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করা

পুরষাঙ্গ পুরোই কিংবা পুরুষাঙ্গের কর্তিত সম্পূর্ণ অগ্রভাগ যদি নারীর যোনীতে প্রবিষ্ট করে, তবেই হদ্দের বিধান কার্যকর করা হবে। চাই বীর্যপাত হোক বা না হোক, পুরুষাঙ্গ সম্প্রসারিত হোক বা না হোক- সর্বাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি পুরুষাঙ্গ মোটেই প্রবেশ করানো না হয় কিংবা মাথার সামান্য অংশই প্রবেশ করানো হয়, তাতে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এ ধরনের অবস্থা যৌন সঙ্গম বলা হয় না।[৬৯৭]

৪. যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অবগত থাকা

হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনাকারীর যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। হযরত উমার, উসমান ও আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেছেন,

لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ. "হদ্দ কেবল সে ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে, যে তা জানে।[৬৯৮]

যদি সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী কিংবা মুসলিম সমাজ থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী অথবা যিনার বৈধতায় বিশ্বাসী জনসমাজের সাথে বসবাসকারী কোন ব্যভিচারী যিনার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞতার দাবী করে এবং এর সুস্পষ্ট প্রমাণও মিলে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি হওয়ায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।[৬৯৯]

৫. নারীর জননেন্দ্রিয়ে সঙ্গম করা

যদি নিজের স্ত্রী নয় এমন কোন নারীর সম্মুখভাগের জননেন্দ্রিয় দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তা হলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যদি পশ্চাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা হয়, তাহলেও অধিকাংশ ইমামের মতে যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। কেননা পশ্চাদ্বারও সম্মুখভাগের মতই যৌনলিপ্সা পূরণের একটি গুপ্তাঙ্গ। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে, এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা হবে না; বরং তা'যীর করা হবে। শাফি'ঈগণের

---

৬৯৬. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৬৯৭. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২৪৮

৬৯৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৫৬

৬৯৯. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.২২৫

মতে, এমতাবস্থায় কেবল পুরুষের ওপরই হদ্দ কার্যকর করা হবে। নারীকে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত-বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে।

যদি কোন স্বামী নিজের স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে, তাহলে তাদের ওপর হদ্দ জারি করা যাবে না। তবে স্বামীকে এ অযাচিত কাজে লিপ্ত হবার দরুন তা'যীর করা যাবে। শাফি'ঈগণের মতে, যদি সে বারংবার করে, তবেই তাকে তা'যীর করা যাবে।[৭০০]

৬. স্বেচ্ছায় সঙ্গম করা

যদি নারী-পুরুষ দুজনেই সম্মত হয়ে সঙ্গম করে তাহলেই হদ্দ কার্যকর হবে। যিনা অবস্থায় নারী যদি অনড় ও শান্ত থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে এ কাজে সম্মত রয়েছে। যদি কোন মেয়েকে বলাৎকার করা হয় কিংবা জোরপূর্বক ছিনতাই করে ধর্ষণ করা হয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"আমার উম্মাত থেকে ভুল-ত্রুটি ও জোরপূর্বক যে সব কাজ করা হয় তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৭০১]

৭. ইসলামি রাষ্ট্রে যিনা সম্পন্ন হওয়া

হানাফীগণের মতে, হদ্দ কায়েমের জন্য যিনা ইসলামি রাষ্ট্রেই সম্পন্ন হতে হবে। কোন মুসলিম যদি দারুল হারবে (অমুসলিম শত্রু রাষ্ট্র) যিনা করে দেশে ফিরে আসে এবং বিচারকের কাছে নিজের যিনার কথা স্বীকার করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন,

مَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَأَصَابَ بِهَا حَدًّا ثُمَّ هَرَبَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

"যে ব্যক্তি দারুল হারবে চুরি কিংবা যিনা করে হদ্দের শাস্তি ভোগের উপযোগী হল। এরপর সে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসল, তাহলে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না।[৭০২]

আরো বর্ণিত রয়েছে যে,

إِذَا لَحِقَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَدُوَّ فَقَتَلَ فِيهِمْ، أَوْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ، ثُمَّ أَخَذَ أَمَانًا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا أَصَابَ، فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ، لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ فِي الشِّرْكِ، وَإِذَا أَصَابَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَى نَفْسِهِ أَمَانًا، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ مَا فَرَّ مِنْهُ.

"যদি কোন ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের পালিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়, এরপর সেখানে গিয়ে কাউকে হত্যা করে, অথবা যিনা করে অথবা চুরি করে, এরপর উক্ত অপরাধের কারণে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চলে আসে। আর তাকে সে নিরাপত্তা দেওয়াও হয়, তাহলে শিরকের অবস্থায় কৃত অপরাধের দণ্ড তার উপর প্রয়োগ করা হবে না। অবশ্য কেউ যদি মুসলমান অবস্থায় এমন কোন অপরাধ করে। এরপর মুশরিক হয়ে যায়। এরপর নিজের নিজের নিরাপত্তা নেয়, তাহলে সে দণ্ড থেকে পালিয়েছিল সেই দণ্ড তার উপর প্রয়োগ করা হবে।"[৭০৩]

৮. ব্যভিচারে লিপ্ত নারী-পুরুষ বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া

---

৭০০. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৭৭-৭৮

৭০১. আবু হাতেম ইবনে হিব্বান আল বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খৃ.), খ.১৬, পৃ.২০২, হা.নং ৭২১৯

৭০২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৬৬

৭০৩. আবু উসমান সাঈদ ইবনে মানসূর আল খোরাসানী, *সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর*, (ভারত: দারুস সালাফিয়্যা, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩ হি./১৯৮২ খৃ.), খ.২, পৃ.৩৩৭, হা.নং ২৮০৫

যিনার হদ্দ কায়েমের জন্য যিনাকারীকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। ইশারা ও লিখিতভাবে স্বীকার মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো। তবে বোবাদের স্বীকারোক্তি হানাফীগণের মতে আমলযোগ্য নয়। অন্য তিন ইমামের মতে বোবার লিখিত ও ইশারায় স্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য হবে, যদি ইশারা দ্বারা যিনা বোঝায়।

৯. জীবিত মহিলার সাথে সঙ্গম করা

অধিকাংশ ইমামের মতে, অবৈধ যৌনকর্মকে হদ্দের উপযোগী যিনার আওতায় ফেলতে হলে নারী-পুরুষ দুজনকেই জীবিত হতে হবে। যদি কোন পুরুষ কোন মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করে, তা যিনা রূপে গণ্য হবে না এবং এ জন্য তাকে হদ্দের শাস্তি দেয়া যাবে না।

১০. দুজনের এক জন পুরুষ এবং অপরজন নারী হওয়া

যিনার হদ্দ ওয়াজিব হবার জন্য যিনাকারীদের দুজনের একজনকে পুরুষ আর অপরজনকে নারী হতে হবে। যদি দুজনই সমজাতীয় হয় কিংবা একজন পশু হয়, তাহলে কারো ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না।

ক. পুরুষদের সমকামিতার শাস্তি

যদি দুজন পুরুষ পরস্পর সমকামিতায় লিপ্ত হয়, তাহলে হানাফীগণের মতে, তাদের ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে না; তবে তাদেরকে তা'যীর করা হবে এবং বন্দী করা হবে, যতক্ষণ না তারা তাওবা করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন ধারায় ফিরে আসে কিংবা মৃত্যুবরণ করে। যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। তবে যেহেতু এ সমকামিতা যিনার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, তাই এ প্রকার অপরাধীর জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না।[৭০৪]

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এবং হাম্বলীগণের মতে, সমকামী দুজনের ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে। যদি তারা অবিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। মালিকীগণের মতে, তারা বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত- সর্বাবস্থায় তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। শাফি'ঈগণের মতে, সমকামী কর্তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা হবে আর অপরজনকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দণ্ড দেয়া হবে, বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত।

খ. মহিলাদের সমকামিতার[৭০৫] শাস্তি

মহিলাদের সমকামিতাও একটি গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

السِّحَاقُ زِنَى النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ. "মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।"[৭০৬]

ইবনু হাজর আল আসকালানী (রহ) এ কাজকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেন। তবে এ বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, এ কাজ যেহেতু যিনা নয়, তাই এ কাজের জন্য যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না। তবে তা একটি গুনাহের কাজ হওয়ায় এর জন্য তা'যীর করা ওয়াজিব হবে।[৭০৭]

১১. সন্দেহমুক্ত হওয়া

---

৭০৪. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৭০৫. শরীআতের পরিভাষায় একে 'সিহাক' বলা হয়। এর অর্থ হল, দুজন নারী মিলে পরস্পর নারী পুরুষের মিলনের মতো আচরণ করা।

৭০৬. আবুল কাসেম আত-ত্বাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (কায়রো: মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ), প্রাগুক্ত, খ.২২, পৃ. ৬৩, হা.নং ১৫৩

৭০৭. *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, পঞ্চম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৯, পৃ. ৫৮

যিনার হদ্দ কার্যকর করার জন্য যৌন মিলনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারবে না। কেউ যদি কোন সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কারো সাথে সঙ্গম করে, তাহলে একে যিনা হিসেবে বিবেচনা করে তার ওপর হদ্দ কায়েম করা যাবে না; তবে ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আদালত প্রয়োজন মনে করলে তাকে যথোপযুক্ত তা'যীরী শাস্তি দিতে পারবে।[৭০৮]

যিনা প্রমাণের পদ্ধতি

নিম্নোক্ত তিনটি উপায়ের যে কোন একটি দ্বারা যিনা প্রমাণ করা যায়:

১. মৌখিক স্বীকৃতি

২. সাক্ষ্য-প্রমাণ

৩. লক্ষণ-প্রমাণ

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. মৌখিক স্বীকৃতি

যিনাকারী পুরুষ বা নারী যদি নিজেই মুখে স্বীকার করে যে, সে যিনা করেছে, তাহলে তা দ্বারা যিনা প্রমাণিত হবে। তবে এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এগুলো হল-

ক. স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।

২. সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।

৩. বাকসম্পন্ন হতে হবে।

৪. পূর্ণ স্বাধীনতা ও এখতিয়ার থাকতে হবে।

খ. স্বীকারোক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. চার বার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের অভিমত। তাদের মতানুযায়ী চারবারের কম স্বীকারোক্তি করলে যিনার শাস্তি কার্যকর হবে না। মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, চার চারবার স্বীকার করার প্রয়োজন নেই; বরং একবার স্বীকার করাই শাস্তি কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট।

২. ভিন্ন ভিন্ন এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে। অধিকাংশ হানাফীগণের মতে, এই চারবার স্বীকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চারটি এজলাসে সম্পন্ন হতে হবে। তবে অন্যদের মতে, এক মজলিসে চারবার স্বীকৃতি দানও যথেষ্ট হবে।

৩. বিচারকের এজলাসে স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে।

৪. স্বীকারোক্তি সুস্পষ্ট ও বিশদ বর্ণনাসম্বলিত হতে হবে।

৫. স্বীকারোক্তির ওপর অটল থাকতে হবে।

৬. অপরাধ সংঘটিত করার দীর্ঘ দিন পর স্বীকারোক্তি দিলেও হদ্দ কার্যকর করা হবে।

৭. স্বীকারোক্তি দানকারীকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, যদি কেউ স্বেচ্ছায় বিচারকের কাছে গিয়ে যিনার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে বিচারক তাকে তার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য ফিরিয়ে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। শাফি'ঈগণের মতে, এটা জায়িয। আর হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, এটা বিচারকের জন্য মুস্তাহাব।

---

৭০৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.১২

৮. একজন যিনার স্বীকারোক্তি করলে এবং অপরজন অস্বীকার করলে স্বীকারোক্তিকারীর ওপর হদ্দ কার্যকর হবে এবং অস্বীকারকারী রেহাই পাবে।[৭০৯]

১. সাক্ষ্য-প্রমাণ

যিনা প্রমাণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল সাক্ষ্য-প্রমাণ। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যাবে। তবে এ জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন-

ক. সাক্ষীদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. সাক্ষীদেরকে মুসলিম হতে হবে।

২. সাক্ষীদেরকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে।

৩. সাক্ষীদেরকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

৪. সাক্ষীদেরকে পুরুষ হতে হবে।

৫. সাক্ষীদের সংখ্যা চার হতে হবে।

৫. সাক্ষীদেরকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে।

খ. সাক্ষ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য একই মজলিসে পেশ করতে হবে।

২. সাক্ষীদের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট ও বিশদ হতে হবে।

৩. সাক্ষ্য মৌলিক হতে হবে। অন্যের কাছ থেকে শুনে স্বাক্ষ্য দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. সাক্ষ্যের মধ্যে পূর্ণ মিল থাকতে হবে।

৫. সাক্ষ্য দানে বিলম্ব না করা।[৭১০]

গ. যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

যাদের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে এবং যিনার উপযোগী হতে হবে। অতএব যে মেয়ের সাথে যিনার সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে ছোট, সঙ্গমের উপযোগী নয়, তাহলে তার ওপর যিনার হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। মেয়েটি ছোট কি না- তা প্রমাণের জন্য হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। শাফি'ঈগণের মতে, এ জন্য চার জন মহিলা কিংবা দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলার সাক্ষ্যের প্রয়োজন।[৭১১]

ঘ. সাক্ষীদের জেরা করা

সাক্ষীরা যিনার সাক্ষ্য দেয়ার পর বিচারক তাদেরকে জেরা করবেন। তাদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, যিনা বলতে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে এবং কোন দিন, কোন সময়, কোন জায়গায় কারা যিনা করেছে। তাছাড়া যিনার অবস্থায় তারা কে কোন অবস্থায় ছিল তাও জানতে চাইবে। এ সব বিষয়ে যদি চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মধ্যে গরমিল দেখা দেয়, তাহলে হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে চারের অতিরিক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যে গরমিল হলে তা ধর্তব্য হবে না।[৭১২]

৩. লক্ষণ-প্রমাণ

ক. গর্ভধারণ

---

৭০৯. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৬

৭১০. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৭১১. যায়লঈ, *তাবয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯০-১; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২৪

৭১২. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.৬১-৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.২৮৪-২৮৬

কুমারী বা স্বামীহীনা মেয়ের গর্ভবর্তী হওয়া যিনা প্রমাণ করে। তবে মেয়ে যদি যিনার কথা অস্বীকার করে, তাহলে এমতাবস্থায় হদ্দ কার্যকর করা যাবে কিনা তা নিয়ে ইসলামি আইনবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে, হদ্দের উপযোগী শাস্তি প্রমাণের জন্য গর্ভধারণ যথেষ্ট নয়। হদ্দ কার্যকর করতে হলে তাকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে হবে কিংবা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যেতে হবে। কেননা এ অবস্থায় এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মহিলাটি ধর্ষণের সম্মুখীন হয়েছে কিংবা কোন সন্দেহে পতিত হয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে।[৭১৩]

তবে মালিকীগণের মতে, স্বামীহীনা মহিলা গর্ভবর্তী হলে যিনা প্রমাণিত হবে এবং এজন্য তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে। তবে মহিলা যদি দাবী করে যে, তাকে জবরদস্তি করা হয়েছে বা ছিনতাই করা হয়েছে অথবা সে অবিবাহিতা বাকিরা ছিল, যিনার কারণে তার রক্তপাত ঘটেছে, তাহলে তাকে তার কথার আলামতস্বরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে। যদি সে তার কথা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়, তবেই তাকে হদ্দ থেকে মুক্তি দেয়া হবে। অন্যথায় তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে।[৭১৪]

খ. লি'আন

মালিকী ও শাফি'ঈগণের মতে, লি'আনের দ্বারাও যিনা প্রমাণিত হবে এবং এ জন্য স্ত্রীর ওপর হদ্দ কার্যকর করা হবে, যদি স্বামী লি'আন করার পর স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকার করে। যদি স্ত্রী লি'আন করে, তাহলে তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। তবে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে, যদি স্ত্রী লি'আন করতে অস্বীকারও করে, তাহলেও তার ওপর হদ্দ কার্যকর করা যাবে না। কেননা হদ্দ কার্যকর করার জন্য যিনা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। আর লি'আনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর কেবল লি'আন করতে অস্বীকার করলেই যিনা প্রমাণিত হয় না। এ জন্য দরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি। তবে বিচারক স্ত্রীকে আটকে রাখবে, যতক্ষণ না সে লি'আন করে কিংবা স্বামীর কথা স্বীকার করে নেবে।[৭১৫]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
যিনার অপবাদের শাস্তি

কারো বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ তোলা একটি জঘন্য অপরাধ। মুসলিম সমাজে কোন চরিত্রবান পুরুষ বা নারীকে যিনার অপবাদ দেয়া মারাত্মক দুঃখজনক ব্যাপার। অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর এবং সাথে সাথে গোটা সমাজের ওপর এক প্রচণ্ড খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির লজ্জা ও লাঞ্ছনার কোন সীমা থাকে না। জনগণের আস্থা থেকে সে চিরদিনের তরে বঞ্চিত হয়ে যায়। এই অবস্থা আরো মর্মান্তিক হয়ে দেখা দেয়, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন মেয়ে হয়। এ কলঙ্ক শুধু তাকেই ক্ষত-বিক্ষত করে না, তার পিতৃপুরুষ ও তার গর্ভজাতদের মুখকেও কালিমা লেপন করে। আর অবিবাহিতা হলে তো তার পক্ষে বিবাহিতা হওয়ার আশা চিরতরে খতম হয়ে যায়। তদুপরি এ ধরনের অভিযোগের ফলে জনসমাজে জঘন্য ও কুৎসিত চরিত্রের কালো ছায়াপাত ঘটে। সন্দেহ-সংশয়, অবিশ্বাস-অনাস্থার মারাত্মক স্রোত গোটা সমাজমানসকে পঙ্কিল ও বিষাক্ত করে তোলে। স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং পিতা-মাতা ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মমতা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে ইসলাম এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তাকে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, যে তা করে, তার ওপর অভিশাপও বর্ষণ করা হয়েছে। তাকে চিরদিনের জন্য আস্থার-অযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিনতম শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৭১৩. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ.৪৭; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.৭২-৭৩

৭১৪. মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.৪৭২

৭১৫. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যে সব লোক সচ্চরিত্রা ও অসতর্ক মহিলাদের ওপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও পরকালে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি বড় আযাব।"[৭১৬]

'কায্ফ' (যিনার অপবাদ)-এর সংজ্ঞা

'কায্ফ'-এর আভিধানিক অর্থ হল নিক্ষেপ করা, সঞ্চার করা। কাউকে গালি দেয়া, দোষারোপ করার অর্থেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।[৭১৭]

শরী'আতের পরিভাষায় কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে স্পষ্টাকারে কিংবা ইঙ্গিতে যিনার অপবাদ আরোপ করাকে 'কায্ফ' বলা হয়।[৭১৮]

অনুরূপভাবে কোন পুরুষের বিরুদ্ধে সমকামিতা বা পশুর সাথে সঙ্গম কিংবা কোন মহিলার সাথে পায়ুপথে সঙ্গমক্রিয়ার অভিযোগ আরোপও 'কায্ফ'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।[৭১৯]

'কায্ফ'-এর শাস্তি

যে কোন ব্যক্তি অপর কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে যিনা বা সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে তা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করতে না পারলে উক্ত অভিযোগ 'কায্ফ' হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগকারীকে আশিটি বেত্রাঘাতের দণ্ড দেয়া হবে এবং চিরদিনের জন্য তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কোড়া মার। উপরন্তু, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।"[৭২০]

এ আয়াতে যদিও মহিলাদের প্রতি যিনার অভিযোগের কথা বলা হয়েছে; তথাপি পুরুষদের প্রতি অভিযোগের বেলায়ও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এ আয়াত থেকে দুনিয়াতে 'কায্ফ'-এর দু'প্রকারের শাস্তির কথা জানা যায়। একটি হল ৮০টি বেত্রাঘাত। অপর শাস্তি হল- সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান। চিরদিনের জন্য অপবাদদানকারীর কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

'কায্ফ'-এর শর্তাবলী

'কায্ফ'-এর কতিপয় শর্ত রয়েছে। হদ্দ কার্যকর করার জন্য এ সব শর্ত পাওয়া যেতে হবে। এ সব শর্তের কতিপয় অপবাদ আরোপকারীর মধ্যে, আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মধ্যে, আর কতিপয় অপবাদের ভাষার মধ্যে পাওয়া যেতে হবে।

---

৭১৬. আল-কুরআন, আন-নূর (২৪) : ২৩

৭১৭. ইবনু মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত,খ.৯, পৃ. ২৭৭

৭১৮. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ,৫, পৃ.৩২

৭১৯. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩; মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৪৮৬,৫০১

৭২০. আল-কুর'আন, সুরা নূর (২৪) : ৪-৫

১. অপবাদ আরোপকারী

ক. অপবাদ আরোপকারী প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর 'কায্ফ' এর শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। এ কাজের জন্যে তাকে সাধারণ শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

খ. অপবাদ আরোপকারী সুস্থ এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে, পাগল বা নেশাগ্রস্তের উপর এ শাস্তি কার্যকর হবে না।

গ. দোষারোপকারী এ কাজ স্বেচ্ছায় না করে কোনরূপ চাপে পড়ে করেছে বলে প্রমাণিত হলে 'কায্ফ' এর হদ্দ থেকে মুক্তি পাবে, এ কাজের জন্যে তার অন্য শাস্তি হবে।

ঘ. কেউ যদি নিজের বাপ বা দাদার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তবে তাকে 'কায্ফ' এর শাস্তি দেওয়া যাবে না।

উক্ত চারটি শর্ত ছাড়াও হানাফী ফিকহ মতে আর একটি পঞ্চম শর্ত হচ্ছে দোষারোপকারী বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। বোবার ঈঙ্গিত দ্বারা 'কায্ফ'-এর শাস্তি প্রয়োগ হবেনা।[৭২১]

২. অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি

ক. অপবাদ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির উপর হতে হবে। পাগলের প্রতি অপবাদ আরোপ করলে 'কায্ফ'-এর শাস্তি দেয়া যাবে না। ইমাম মালিক (র)-এর মতে পাগলের প্রতি অপবাদ দিলেও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

খ, অপবাদ বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর অপবাদের কারণে 'কায্ফ'-এর শাস্তি হবে না। ইমাম মালিক (র)-এর মতে পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত নয়, এমন মেয়ের উপর অপবাদ দিলেও 'কায্ফ'-এর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

গ. অপবাদ মুসলমান সম্পর্কে হতে হবে। অমুসলমান সম্পর্কে বা অমুসলমান থাকাকালে ব্যভিচার করেছে, এমন অভিযোগের কারণে 'কায্ফ'-এর শাস্তি হবে না। ।

ঘ. অভিযোগ স্বাধীন ব্যক্তি সম্পর্কে হতে হবে, গোলাম বা গোলাম থাকাকালে ব্যভিচার করেছে এমন অভিযোগের জন্য অভিযোগকারীকে 'কায্ফ' এর শাস্তি দেয়া যাবে না।

ঙ. পূর্বে যার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির প্রতি অপবাদ দিলে 'কায্ফ'-এর শাস্তি হবে না।

উল্লিখিত অবস্থায় 'কা্যফ'-এর শাস্তি না হলেও যে কারও প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ-দানকারীকে শাসনমূলক শাস্তি অবশ্যই দিতে হবে।[৭২২]

'কায্ফ'-এর বিভিন্ন ভাষা ও তার হুকুম

'কাযফ'-এর শাস্তিযোগ্য হওয়ার জন্য অপবাদের শব্দসমূহ সুস্পষ্ট হতে হবে। ইশারা-ঈঙ্গিতের দ্বারা 'কায্ফ' প্রমাণিত হবে না। যেমন কেউ কাউকে রাগ করে বা গালাগালির ছলে চরিত্রহীন, দূরাচারী, হারামী, হারামজাদী ইত্যাদি বলা দ্বারা 'কাযফ-এর অভিযোগ হবে না। তবে কাউকে সুস্পষ্টভাবে যিনার সন্তান বা 'তুমি তোমার পরিচয়দানকারী পিতার পুত্র নও' বললে 'কায্ফ'-এর আওতায় পড়বে।

---

৭২১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা*,প্রাগুক্ত,পৃ.২৮৫-২৮৬; আহমদ ইবন আল-কুরতবী, *বিদায়াতুল মুজতাহীদ*,(ইরান: মানসুরাতুর-রাযী, ১৯৬৬ খ্রি.), ২য় খণ্ড , পৃ. ৪৩৬; গাজী শামছুর রহমান, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*,(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩০

৭২২. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা*,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৮৬; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত,খ. ৫, পৃ. ৮৯

কেউ যদি অন্যকে লক্ষ করে বলে, "দেখ আমি তো আর যিনাকারী নই" অথবা ''আমার মা-তো আর যিনা করে আমাকে প্রসব করেনি।'' অর্থাৎ নিজকে পবিত্র ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে যিনাকারী ও জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করা। এতে 'কায্ফ' হবে কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক ইবন রাহওয়ায় বলেন, হাসি-তামাশার ছলে এরূপ বলা হলে কাযফ হবে না। ঝগড়া-বিবাদের সময় বলা হলে 'কায্ফ' হবে।[৭২৩]

'উমার (রা)-এর খিলাফতকালে একজন লোক ঝগড়ার সময় তার প্রতিপক্ষকে বলেছিল, "না আমার পিতা যিনাকারী ছিল, না আমার মা।" ব্যাপারটি 'উমার (রা)-এর দরবারে পেশ করা হল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, এর সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি? কিছু লোক বললেন, সে তো নিজের পিতা-মাতার প্রশংসা করেছে মাত্র। অবশিষ্ট লোক বললেন, তার মা বাবার প্রশংসা করার জন্য এ শব্দ বলার প্রয়োজন ছিল না; বরং সে একথা বলে প্রতিপক্ষের মা-বাবার প্রতি অপবাদ দিয়েছে। উমার (রা) দ্বিতীয় অভিমত প্রদানকারীদের সাথে একমত হলেন এবং লোকটিকে 'কায্ফ'-এর শাস্তি দিলেন।

ইমাম মালিক উক্ত অভিমত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য থাকে, ফলে এতে 'কায্ফ' হবে।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, সুফিয়ান সাওরী সহ একদল আলিমের মতে এ ধরনের কথায় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়, সন্দেহযুক্ত বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে শরী'আতের নির্দিষ্ট শাস্তি জারী হয় না।

'কায্ফ'-এর সাক্ষী

চারজন বালেগ, বুদ্ধিমান, বাকশক্তিসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষ যদি যুগপভাবে বাচনিক সাক্ষ্য দেয় যে, তারা একত্রে একই সময়ে একই স্থানে সচক্ষে অভিযুক্ত পুরুষকে এবং অভিযুক্তা নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখেছে। তবেই যিনা প্রমাণিত হবে এবং অভিযোগকারী 'কাযফ'-এর শাস্তি হতে মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"যারা সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই তো সত্যত্যাগী।[৭২৪]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

"তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতো সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী।"[৭২৫]

হিলাল ইবন উমাইয়্যা (রা) তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করলে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, إِيْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءِ وإِلَّا فَحَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ "চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে ৮০টি বেত্রাঘাত পড়বে।"[৭২৬]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চার সাক্ষী সমভাবে একই অবস্থায় ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিণীকে ব্যাভিচাররত অবস্থায় দেখতে হবে, তবেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। চারজনের একজনেরও কথার পার্থক্য হলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা, বরং সাক্ষ্যদাতাগণের উপরই শাস্তি আবর্তিত হবে। হানাফী

---

৭২৩. মুহাম্মদ আবদুল হক দেহ্লভী, *তাফসীরে হক্কানী*, (করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৩৭১

৭২৪. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৪

৭২৫. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ১৩

৭২৬. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৯০

মাযহাব মতে চারজন সাক্ষীকে আদালতে একই সময়ে উপস্থিত হয়ে একই সাথে সাক্ষী দিতে হবে। ইমাম শাফিঈ-এর মতে সাক্ষীরা একের পর এক এসে সাক্ষ্য দিলেই চলবে। এক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ-এর অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ইমাম আবু হানীফার মতে সাক্ষী 'আদেল বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া জরুরী নয়, যদি চারজন ফাসিক সাক্ষীও দোষাপরোকারীর পক্ষে যথাযথ সাক্ষ্য দেয়, এতে দোষারোপকারী 'কায্ফ'-এর শাস্তি হতে রেহাই পাবে। তবে সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ না হওয়ার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপরও ব্যভিচারের হদ্দ জারী করা যাবে না।[৭২৭]

এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর দলীলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী উল্লেখ করেন, অর্থাৎ খিয়ানতকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, খিয়ানতকারী আদেল নয়, ফলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবেনা। ইমাম আবু হানীফার যুক্তি হচ্ছে সকল ইমামের মতে ফাসিক ব্যক্তি হাকিম বা বিচারক হতে পারে। ফলে ফাসিক বিচারকের বিচার যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে ফাসিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হাদীসের উত্তরে তার যুক্তি হচ্ছে, ফাসিকের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, কিন্তু হাদিসের মর্মানুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ জারী হবেনা, কেননা ফাসিকের সাক্ষ্য সন্দেহমুক্ত নয়। আর সন্দেহ থাকলে হদ কায়েম হয়না। সাক্ষীর সংখ্যা ৪জন সম্পর্কে ইমামগণের দ্বিমত নেই।

সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম হলে

ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়নকারী যথাযথ সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম হলে আল-কুরআনে তার জন্য তিনটি হুকুম এসেছে । প্রথমত: ৮০টি বেত্রাঘাত, দ্বিতীয়ত: তার সাক্ষ্য কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, তৃতীয়ত: সে ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। এরপর আল-কুরআনে বলা হয়েছে।

إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তবে তারা নয় যারা এরপর তাওবা করেছে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং সীমাহীন দয়াবান।"[৭২৮]

তিনটি হুকুমের উল্লেখ করার পর এ আয়াতে যে ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। তা কোন্ হুকুমের সাথে সম্পর্কিত হবে? এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণ একমত যে, ক্ষমার বিষয়টি তৃতীয় হুকুমের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ 'কায্ফ'-এর ক্ষেত্রে তাওবা বা ক্ষমা চাওয়া দ্বারা অপবাদদানকারীর 'আশি বেত্রাঘাত' এবং 'সাক্ষ্য রহিত হওয়া মাওকুফ হবে না। তবে তাওবার কারণে আল্লাহ পাক তাকে ফাসিক হয়ে থাকা থেকে রেহাই দিবেন বলে আশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাওবার দ্বারা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়েছেন, এতে বান্দা কেন ক্ষমা করবে না?

তাওবা মূলতঃ অনুতাপ, অনুশোচনা, সংশোধন এবং ভালোর দিকে ফিরে আসার নাম, এর প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। এ কারণেই তাওবা করলে দুনিয়ার শাস্তি মাফ হয় না। দুনিয়ার শাস্তি মাফ হলে তো আর কারও জেল, জরিমানা, ফাঁসি হতনা। সকলেই তাওবা করে ক্ষমা চাইত। আল্লাহ তাআলাও বলেন নি যে, তাওবা করলে তাকে ছেড়ে দাও। বরং বলা হয়েছে। আল্লাহ তাওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। এতে বুঝা যায় যে, তাওবা করলে। আল্লাহ পাক তাকে ফাসিক বা গুনাহর আযাব থেকে পরকালে রেহাই দিবেন।

---

৭২৭. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা*,প্রাগুক্ত,পৃ. ২৯০; মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *আল-সহীহুল সহীহুল বুখারী*, (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুন ইমদাদিয়া, তা. বি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫

৭২৮. আল-কুরআন, সুরা নূর (২৪) : ৪

স্ত্রীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপের বিধান

কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তার কথার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপন করতে না পারে অথবা সে যদি স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করে, তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান ও বক্তব্যের পক্ষে বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে শপথ করতে হবে। শরী'আতের পরিভাষায় একে লি'আন বলা হয়।

লি'আনের নিয়ম

প্রথমে স্বামী এই বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চয়ই সত্যবাদী।" পঞ্চমবারে অভিযুক্তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলবে, "আমি এ নারীর বিরুদ্ধে যিনার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছি, সে ক্ষেত্রে আমি মিথ্যাবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।" অতঃপর স্ত্রী এ বলে চারবার শপথ করবে- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এ ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ব্যাপারে সে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।" পঞ্চমবারে বলবে, "এই ব্যক্তি আমার প্রতি যিনার যে অভিযোগ আরোপ করেছে সে ক্ষেত্রে সে সত্যবাদী হলে আমার ওপর আল্লাহর লা'নত পতিত হোক।" আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের ওপর আল্লাহ অভিশাপ পড়বে।"[৭২৯]

যদি স্বামী শপথ করতে অস্বীকার করে তাকে কারাগারে আটক রাখা হবে, যতক্ষণ না সে শপথ করে অথবা তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করে। অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে তার ওপর 'কায্ফে'র হদ্দ কার্যকর করা হবে। স্ত্রী শপথ করতে অস্বীকার করলে তাকেও কারাগারে আটক করে রাখা হবে, যে যাবত না সে শপথ করে অথবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করে। অভিযোগ সত্য বলে স্বীকার করলে তাকে যিনার শাস্তিস্বরূপ রজমের শাস্তি দেয়া হবে, যদি সে 'মুহ্ছান' হয়। আর 'মুহ্ছান' না হলে একশত বেত্রাঘাতের শাস্তি দেওয়া হবে। মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, লি'আন করতে অস্বীকার করলে অপরাধীকে বন্দী করার প্রয়োজন নেই। হদ্দ প্রয়োগের জন্য তাদের শপথ করতে অস্বীকার করাই যথেষ্ট।[৭৩০]

প্রত্যেকে লি'আন করার পর তাদের বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তারা আর কখনো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। তবে স্বামী তার অভিযোগ মিথ্যা বলে স্বীকার করলে শাস্তি ভোগের পর তারা

---

৭২৯. আল-কুর'আন, সুরা আন-নূর (২৪) : ৬-৯

৭৩০. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*,প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১২৫; আল-জাযীরী, *কিতাবুল ফিকহ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.১০৮

পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।[৭৩১] লি'আনের সন্তান মাতার সাথে যুক্ত হবে এবং মাতা ও সন্তান পরস্পরের ওয়ারিছ হবে।[৭৩২]

উল্লেখ্য যে, লি'আনকারী মহিলার প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করা এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলে অভিহিত করা জায়িয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, যে এরূপ করবে, তার ওপর 'কায্ফে'র হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।[৭৩৩] কেননা লি'আনের ফলে তার যিনা সাব্যস্ত হয়নি এবং তার পবিত্রতাও কোনরূপ কলঙ্কে লিপ্ত হয়নি। এ কারণেই তাকে যিনার দণ্ডের সম্মুখীনও হতে হয় নি। এ ধরনের মহিলা ও তার সন্তান প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

"তার ও তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না। যে ব্যক্তি তার প্রতি কিংবা তার সন্তানের প্রতি যিনার অভিযোগ তুলবে, তার ওপর হদ্দের শাস্তি বর্তাবে।"[৭৩৪] তবে হানাফীগণের মতে, লি'আনকারী মহিলার যদি পিতৃপরিচয়হীন সন্তান না থাকে, তবেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। পিতৃপরিচয়হীন সন্তান থাকলে এবং তা যিনার একটি প্রমাণ হবার কারণে অভিযোগ আরোপকারীর জন্য কাযাফের শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তবে তা'যীরের আওতায় সে শাস্তিযোগ্য হবে।[৭৩৫]

'কায্ফ'-এর শাস্তি রহিত হওয়ার অবস্থা

১. ক্ষমা

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগ উত্থাপনকারীকে -আদালতে মামলা দায়েরের আগে হোক কিংবা পরে- ক্ষমা করে দেয়, তাহলে 'কায্ফে'র শাস্তি রহিত হয়ে যাবে। কেননা 'কায্ফে'র শাস্তি বান্দার অধিকারের সাথে জড়িত, যা দাবী ছাড়া কার্যকর করা হয় না। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, বান্দার অধিকারের সাথে জড়িত শাস্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা দ্বারা রহিত হয়ে যায়। এটা শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের অভিমত। মালিকীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে হলে ক্ষমা করে দেয়া জায়িয; কিন্তু মামলা দায়েরের পরে ক্ষমা করা জায়িয নয়। হানাফীগণের মতে, আদালতে মামলা দায়েরের আগে কিংবা পরে- কোন অবস্থায় কাযাফের দণ্ড ক্ষমা করে দেয়া জায়িয নয়। তাদের বক্তব্য হল, 'কায্ফে'র শাস্তি নিরেট বান্দাহর অধিকারের সাথে জড়িত নয়; এতে আল্লাহর অধিকারও রয়েছে। আর যে সব শাস্তিতে বান্দার অধিকারের সাথে আল্লাহর অধিকার জড়িত রয়েছে, তাতে বান্দাহর ক্ষমা করে দেয়ার অধিকার নেই।[৭৩৬]

২. লি'আন

যদি অভিযোগকারী স্বামী হয় এবং তার এমন কোন সাক্ষী নেই, যারা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। এমতাবস্থায় সে লি'আন করলে 'কায্ফে'র হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

৩. সাক্ষ্য পেশ

যদি অভিযোগ উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

৪. 'মুহ্ছান'-এর চরিত্র হারিয়ে ফেলা

---

৭৩১. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ.২৮৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৫২-৫৩

৭৩২. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২৮৯-২৯০; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ৫৬

৭৩৩. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

৭৩৪. আবু দাউদ,*আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-২২৫৬

৭৩৫. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩৩৪-৫; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ.৪১-৪২

৭৩৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ.১০৯

হানাফী ও মালিকীগণের মতে, অভিযোগ ওঠার পর যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির 'মুহ্ছান' চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ অভিযোগ আরোপিত হবার পর কেউ যিনা করল, কিংবা ধর্মত্যাগ করল বা পাগল হয়ে গেল তাহলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ হদ্দ প্রমাণের জন্য যেমন অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহ্ছান হওয়া দরকার, তেমনি হদ্দ কার্যকর করার জন্য তার মুহ্ছান হিসেবে নিজেকে ধরে রাখাও প্রয়োজন।

শাফি'ঈগণের মতে, হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনায় লিপ্ত হলে অভিযোগকারী শাস্তি থেকে খালাস পেয়ে যাবে। তবে হাম্বলীদের মতে, অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির মুহ্ছান চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে গেলেও হদ্দ রহিত হবে না। যেমন হদ্দ কার্যকর করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন যিনায় লিপ্ত হলে কিংবা পাগল হয়ে গেলে অভিযোগকারী হদ্দ থেকে রেহাই পাবে না।[৭৩৭]

৫. সাক্ষ্য প্রত্যাহার

মিথ্যা অভিযোগ আরোপের বিষয়টি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবার পর যদি হদ্দ কার্যকর করার আগেই সাক্ষীরা সকলেই কিংবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে।

৬. অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি

যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগটিকে সত্য হিসেবে মেনে নিলেও অভিযোগ আরোপের শাস্তি রহিত হয়ে যাবে।

৭. অভিযুক্ত ব্যক্তির দাবী না থাকা

অধিকাংশ ইমামের মতে, যিনার অভিযোগ আরোপ যেহেতু বান্দাহর হকের সাথে জড়িত ব্যাপার, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়ম মাফিক বিচারের দাবী না করলে অভিযোগকারীর ওপর কাযাফের শাস্তি বর্তাবে। তবে হানাফীগণের মতে, এ ধরনের অভিযোগ আরোপে যেহেতু বান্দার হকের সাথে আল্লাহর হকও জড়িত রয়েছে, তাই অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিচারের দাবী না থাকলেও অভিযোগকারী কাযাফের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না; প্রশাসন রাষ্ট্রের জনস্বার্থে তাকে শাস্তি দেবে।[৭৩৮]

পুনঃ পুনঃ অপবাদ আরোপের শাস্তি

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেউ বার বার যিনার অভিযোগ তুললে তার ওপর 'কায্ফে'র একটি হদ্দই কার্যকর করা হবে। চাই সে প্রতি বারেই একটি যিনা সম্পর্কেই অভিযোগ আরোপ করুক কিংবা প্রতিবারে নতুন নতুন যিনার অভিযোগ আরোপ করুক। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এক জাতীয় দুটি হদ্দ কারো ওপর ওয়াজিব হলে, সে ক্ষেত্রে একটি হদ্দই কার্যকর করার বিধান রয়েছে। যেমন কেউ যিনা করল, অতঃপর এর শাস্তি ভোগ করার আগেই যদি আর একবার যিনা করে, তাহলে তার ওপর একটি মাত্র হদ্দ কার্যকর করা যাবে।[৭৩৯]

কেউ কারো প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করল এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হল, অতঃপর ফিরেও যদি সে উক্ত যিনার অভিযোগ তোলে, তাহলে হদ্দ পুনরাবৃত্তি করা যাবে না; তবে তা'যীরের আওতায় তাকে শাস্তি দিতে হবে। যদি অন্যরা দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে দেখতে হবে, সে যদি এ অভিযোগ প্রথম অভিযোগ আরোপের দীর্ঘ দিন পরেই উত্থাপন করে থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয় হদ্দ

---

৭৩৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ.৫৬; আল-খারাশী, *শারহু মুখতাছারি খলীল*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ.১২৮

৭৩৮. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩০৫; আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৮৩

৭৩৯. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭; ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ.৩১৪

প্রয়োগ করতে হবে। যদি প্রথম হদ্দ কার্যকর করার পরপরই দ্বিতীয় যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে তার শাস্তি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে দুটি মত দেখা যায়। একটি হল- দীর্ঘদিন পরে নতুন অভিযোগ তুললে যেমন অভিযোগকারীর ওপর দ্বিতীয় হদ্দ কার্যকর করা হয়, তেমনি প্রথম অভিযোগের শাস্তি ভোগের পর পর উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগের জন্যও দ্বিতীয়বার হদ্দ কার্যকর করা হবে। তদুপরি অন্যান্য হদ্দের অপরাধ যেমন- চুরি ও যিনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও একবার শাস্তি ভোগ করার পর দ্বিতীয়বার একই অপরাধে লিপ্ত হলে দ্বিতীয় অপরাধের জন্যও পুনরায় হদ্দ কার্যকর করা হবে।

অপর মতটি হল- তাকে যেহেতু সবে মাত্র একই ধরনের অপরাধের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই একই অপরাধের দ্বিতীয় বারের জন্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তা'যীরের আওতায় শাস্তি দেয়া যাবে।[৭৪০]

দলের প্রতি যিনার অপবাদ আরোপের শাস্তি

ব্যক্তি যদি একসাথে বহুলোকের উপর ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করে তবে ইমাম আবু হানীফার মতে তার উপর একবারই শাস্তি কার্যকর হবে। কারণ, আল-কুরআনে বলা হয়েছে। যারা চরিত্রবতী স্ত্রীলোকদের উপর যিনার অপবাদ দেয় এখানে স্ত্রীলোকদের বলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া একজন দ্বারা যিনা হয় না। কমপক্ষে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয়।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে যতলোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দিবে, প্রত্যেকের জন্য পৃথক শাস্তি দিতে হবে। কেননা যতলোকের প্রতি অপবাদ দেয়া হয়েছে, তারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক শাস্তি হতে হবে। হা! যিনা একক ব্যক্তি দ্বারা হয়না, ফলে পুরুষ এবং স্ত্রী দুজনকে মিলে একটি অভিযোগ বিবেচনা করা হবে। ইবন আবী লায়লা, ইমাম শা'বী ও আওযাঈ বলেছেন যে, বহুলোকের উপর একই শব্দে অপবাদ দিলে একবার শাস্তি হবে। পৃথক পৃথক শব্দদ্বারা অপবাদ দিলে পৃথক পৃথক শাস্তি হবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[৭৪১]

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান

ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যদি অপবাদদানকারী তাওবা না করে, তবে তার কোন সাক্ষ্যই কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে। যদি সে তাওবা করে, তাহলেও কি সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবেই পরিচিত থাকবে এবং তার কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না- এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে, যদি সে তাওবা করে, তাহলে তার থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে; তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৭৪২] তাঁদের বক্তব্য হলো- কুর'আনে أَبَدًا (চিরদিনের জন্য) শব্দের ব্যবহার দ্বারা জানা যায় যে, তাদের সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে তাওবাহ করে। আর إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا এ ব্যতিক্রমী বাক্যটি পূর্বের নিকটবর্তী বাক্য وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ এর সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলে ফাসিকীর কলঙ্ক মুছে যাবে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي قَذَفٍ.

"অপবাদের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া মুসলিমরা একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ।"[৭৪৩]

এ হাদিস থেকেও স্পষ্ট জানা যায় যে, অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

৭৪০. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

৭৪১. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *আখলাক ও নৈতিকতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

৭৪২. জাসসাস, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত,খ.৩, পৃ.৩৯৯-৪০১

৭৪৩. বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-১৬৯২৪

অন্যান্য ইমামগণের মতে, তাওবার পর ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবার সাথে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের দলীল হল, তাওবার কারণে যাবতীয় পাপ মুছে যায়।[৭৪৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"পাপকর্ম থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোন পাপ নেই।"[৭৪৫]

এ হাদীসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁরা বলেন, কুফরী অপবাদ থেকেও বড় অপরাধ। কাফির তাওবা করে মুসলিম হলে যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁদের মতে, **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** এ ব্যতিক্রমী বাক্যটি পূর্ববর্তী দুটি বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। এ থেকে জানা যায়, তাওবা করলে যেমন ফাসিকীর কলঙ্ক মুছে যাবে, তেমনি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণেও কোন আপত্তি থাকবে না।

কারো কারো মতে, স্বীকারোক্তি দ্বারা অপবাদের দোষ প্রমাণিত হলে এবং এরপর খালিস তাওবাহ করলে তবেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তাদের আচার-আচরণ দ্বারা তাদের তাওবার প্রমাণ মিলে। এটা ইমাম শা'বী ও দাহহাকের অভিমত।[৭৪৬]

এ প্রসঙ্গে হানাফীগণের মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা খালিস তাওবার ব্যাপারটি আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। যদি তারা খালিস তাওবাই করে থাকে তাহলে তারা পরকালে অবশ্যই নাজাত পাবে। তবে দুনিয়ার কাজে-কর্মে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এমতাবস্থায় কুর'আনে أَبَدًا (চিরদিনের জন্য) শব্দের অর্থও ঠিক থাকবে। তদুপরি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হবার ব্যাপারে যেখানে সরাসরি হাদীসের বক্তব্য রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কিয়াস করা সমীচীন নয়।[৭৪৭]

উপসংহার

বিশ্বে ইসলামই একমাত্র মহান ধর্ম, যার মর্মবাণী হল শান্তি, সাম্য ও বিশ্বমানবতা। ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। এটি কোনো কাল, অঞ্চল বা জাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম বলতে বুঝায় উচ্চতম আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ । কারণ এভাবেই শুধু শান্তি অর্জন করা যায়। তবে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অর্জন ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য নয়। নিজের শান্তি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের শান্তি প্রতিষ্ঠাও জীবনের অভিষ্ট লক্ষ্য।

ইসলামের আরেকটি উদ্দেশ্যে হল সর্বশক্তিমান পরমসত্তা আল্লাহর স্বীকৃতির মাধ্যমে তার সাথে শান্তি স্থাপন করা।

ইসলাম যেমন আল্লাহর সাথে শান্তির কথা বলে, তেমনি তা সমগ্র বিশ্বের শান্তি বজায় রাখতেও আগ্রহী। এর অর্থ মানুষ একজন অন্যজন হতে নিরাপদ থাকবে এবং কেউ কোন প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হবেনা।

যে সকল সমস্যার কারণে সমাজের অধিকাংশ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং মানুষের সামাজিক জীবন যাপন বিপর্যস্ত হয় ইসলামে সে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা মনে করা হয়। তবে প্রচলিত চিন্তাধারার সাথে

---

৭৪৪. ইবনুল আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.১৯২-৪

৭৪৫. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, হাদিস নং-৪২৫০; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা'*, প্রাগুক্ত,হা.নং: ২০৩৪৮, ২০৩৪৯১

৭৪৬. ইবনুল আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ.৩৪৫-৬; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ.১৯২-৪

৭৪৭. ড. আহমদ আলী,*ইসলামের শাস্তি আইন* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

ইসলামের নীতিগত দিক থেকে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ইসলামে কোনটি সামাজিক সমস্যা আর কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়, তা নির্ধারণের অধিকার মানুষের নয়। কেননা পৃথিবীর এমন একটি সমস্যাও নেই, যেটি পুরোপুরি সমস্যা এবং যার মাধ্যমে কোনো না কোনো মানুষ কিছু না কিছু উপকার লাভ না করেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি সমস্যার ব্যাপারটি নির্ধারণ করতে যায়, তা আপেক্ষিক বিষয় হয়ে পড়বে। তাই মহান আল্লাহই যে সমস্যাগুলোকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন এবং যে সকল সমস্যার সমাধান মহানবি (স.) সামাজিকভাবে সম্পন্ন করেছেন সেগুলোকে সমাজিক সমস্যা বলা যায়। অন্যদিকে তিনি যেগুলোকে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেননি, সেগুলো কখনোই কোন সমস্যাই নয়। এ প্রত্যয় ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া একজন মানুষ কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না।

সূরা নূর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ২৪তম সূরা। আল্লাহ তাআলা ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক সংশোধনমূলক এবং অপরাধ প্রতিরোধমূলক গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী এ সূরায় নাযিল করেন। এর দ্বারা সমাজকে সংশোধন ও বিনির্মাণ করা হয়। যেকোনো সমাজকে সমস্যামুক্ত করার সরকারি, বেসরকারি, জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা প্রচেষ্টা সবসময়ই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় সমস্যার জায়গাতেই। এর কারণ হলো, সমাজের মানুষের নিকট সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার যে অব্যর্থ ব্যবস্থা ও মাধ্যম রয়েছে কোনো পক্ষই সে মাধ্যমটি ব্যবহারে আগ্রহী নন। সেই ব্যবস্থাটির নাম ইসলাম। সামাজিক সমস্যার প্রতিটি সমস্যার সমাধানই ইসলাম দিয়েছে।

সুরা নূরের দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুরার বিষয়বস্তু এবং আমাদের সামাজিক সমস্যার এক চমৎকার মিল রয়েছে। আজকের এই সমাজের সমস্যাগুলো যদি এ সুরার আলোকে সমাধান করার চেষ্টা করি, তাহলেই সমস্যাবিহীন শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গঠন সম্ভব।
মহান আল্লাহ আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গঠন করে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

কুরআন/তাফসীর

১. কুরআনুল কারীম

২. আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাছীর, অনু. অধ্যাপক আখতার ফারূক, *তাফসীরে ইবনে কাছীর*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ,২০০২), খ. ৮

৩. সাইয়েদ কুতুব শহীদ,*তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, অনু. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ,(ঢাকা: আল কোরআন একাডেমী লন্ডন,৪র্থ সংস্করণ, ২০০৩)।

৪. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন*, অনু. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নবম সংস্করণ,২০১২),ষষ্ঠ খণ্ড, ।

৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তফসীর মা'আরেফুল কোরআন (সংক্ষিপ্ত)*, অনু. মুহিউদ্দীন খান,(খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প)।

৬. কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, (নারায়ণগঞ্জ: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া,তৃতীয় প্রকাশ,২০১২)।

৭. মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম,*তফসীরে নুরুল কোরআন*,(ঢাকা: আল-বালাগ পাবলিকেশন্স,তৃতীয় প্রকাশ,মার্চ ২০০৮)।

৮. আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী অনুদিত, তাফসীরে জিলানী, (ঢাকা: জিলানী কাফেলা, প্রথম প্রকাশ: ২০১৯)
৯. হাফেজ মুনীর উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ*,(ঢাকা:আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, জুলাই ২০১৪)।
১০. আব্দুস সালাম মিতুল, *কোরানের সূরাসমূহের নামকরণ ও নাজিলের পটভূমি*, (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ,প্রথম প্রকাশ,২০০১)।
১১. ইসলামিক স্টাডিজ, *উলূমুল কুরআন ও উলূমুল হাদিস*, (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা)।
১২. আল-জাসসাস, *আহকামুল কুরআন*,(বৈরূত: দারুল কিতাবুল 'আরাবী, ১৩৩৫হি.)।
১৩. মুহাম্মদ আবদুল হক দেহ্লভী, *তাফসীরে হক্কানী*, (করাচী: মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, তা.বি.)।
১৪. ইমাম আলাউদ্দীন খাযেন, *লুবাবুত তাবীল ফি মা'আলিমিত তাবীল*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫হি.)।
১৫. আবু মুহাম্মদ ইবন মাসউদ মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, (বৈরূত: দারুত তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭)।
১৬. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম উমর আল-খাযিন, *লুবাবত তা'বীল ফী মা'আনিয়াত তানযীল 'তাফসীর আল-খাযিন*,(বৈরুত: দারুল মারিফাহ, তা. বি.)।

হাদিস/আসার

১৭. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিছ, প্রথম সংস্করণ,১৯৯৫)।
১৮. ইমাম আবু বকর ইব্ন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯হি.)।
১৯. তিরমিযী, *আল-জামি'*, (বৈরূত: দারুল গারবিল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮)।
২০. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ)।
২১. ইমাম বুখারি, *আস-সহিহ*,(দারুতাওকিন্নাজাত, প্রথম সংস্করণ: ১৪২২)।
২২. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিছ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫)।
২৩. ইমাম মুসলিম, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.)।
২৪. ইমাম তিরমিযী, *আস সুনান*,(বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.)।
২৫. ইবন হিব্বান মুহাম্মদ আল-বুস্তী, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১৪১৪ হি.)।
২৬. ইমাম বুখারী, *আস-সহিহ*, (বৈরূত: দারু ইব্ন কাছীর, ১৪০৭হি.)।
২৭. ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (কাহিরা: দারুল হাদিছ, প্রথম সংস্করণ: ১৯৯৫)।
২৮. আবু নু'আইম ইসপাহানী, *হিলইয়াতুল আাওলিয়া*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী)।
২৯. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*,(বৈরূত: দারুল বাশায়িরিল ইসলামিয়া,তৃতীয় সংস্করণ,১৯৮৯)।
৩০. ইব্ন হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, (বৈরূত: দারুল মা'রিফাহ)।
৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর আর-রাযী, *মুখতারুস্-সিহাহ*, (বৈরূত: মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৯খৃ.)।
৩২. ইমাম তিরমিযি, *সুনানে তিরমিযি*, (মিশর: মুসত্বাফা আল-বাযী আল-হালাবী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.,১৯৭৫ খৃ.)।
৩৩. ইমাম বায়হাক্বী, *আস-সুনানুল কুবরা*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ,২০০৩)।
৩৪. ইমাম ইব্ন মাযাহ, *আস-সুনান*, (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ)।
৩৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, *সহিহুল বুখারী*, (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুন ইমদাদিয়া,তা.বি.)।

৩৬. আবু উসমান সাঈদ ইবনে মানসূর আল খোরাসানী, *সুনানে সাঈদ ইবনে মানসূর*, (ভারত: দারুস সালাফিয়্যা, প্রথম প্রকাশ ১৪০৩ হি./১৯৮২ খৃ.)।

৩৭. আবুল কাসেম আত-ত্বাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (কায়রো: মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ)।

৩৮. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুস সগীর*, (বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, প্রথম সংস্করণ: ১৯৮৫)।

৩৯. আবু হাতেম ইবনে হিব্বান আল বুসতি, *সহিহ ইবনে হিব্বান*, (বৈরূত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./ ১৯৯৩ খৃ.)।

৪০. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান আদ দারেমী, *সুনানুদ্ দারেমী*, (করাচী: কাদীমী কুতুবখানা), ১ম খণ্ড।

ফিকহ্ ও ফাতওয়া

৪১. ইব্ন 'আবেদীন আশ-শামী, *রদুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার*, (পাকিস্তান : এডুকেশন প্রেস, তা, বি.)।

৪২. ইবন রুশদ আল-কুরতুবী, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ফী নিহায়াতিল মুকতাসিদ*, (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮ খ্রি.)।

৪৪. ইবন হাযম, *আল-মুহাল্লা*, (মিশর: আল-জমহুরীয়া আরাবীয়াহ্, ১৯৭০ খৃ.)।

৪৫. আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়্যাহ আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব শারহ রাওযিত্-তালিব*, (মিসর: আল-মাতবা'আতুল মায়মানিয়্যাহ, ১৩১৩ হি.)।

৪৭. আহমাদ আদ্-দাদীর, *শারহুল আযহার*, (মিসর: 'ঈসা বাবী আল-হালাভী, তা, বি.)।

৪৮. সাইয়্যেদ সাবিক, *ফিকহুস-সুন্নাহ*, (বৈরূত: দারুল কিতাবিল 'আরবী)।

৫০. মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদী আল-বারকাতী, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, (প্রথম প্রকাশ ১৪০৭ হি., ১৯৮৬ খৃ.)।

৫১. ইমাম যহীরুদ্দীন আবদুর রশীদ আল-ওলওয়ালিজী, *আল-ফাতাওয়াল ওলওয়ালিজিয়্যাহ*',(দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপু, প্রথম সংস্করণ)।

৫২. ইবনু কুদামাহ্, *আল মুগনী*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি)।

৫৩. ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*,(ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৯)

৫৪. আবদুর রহমান আল-জাযাইরী, *কিতাবুল-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, তা.বি)।

৫৫. আবদুর রহমান আল-জাযাইরী, *কিতাবুল-ফিক্হ 'আলাল মাযাহিবিল 'আরবা'আহ*, (বৈরূত: দারুল-ফিক্র, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬)।

৫৬. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*,(বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ,১৯৯৩)

৫৭. আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*,(মিসর: মাকতাবাত সা'আদাহ্, ১৩২৪হি.)।

৫৮. আল-কাসানী, *বদা'ইয়ুস সনা'ই*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.)।

৫৮. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ*,(বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.)।

৫৯. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদদাকা'ইক*,(বৈরুত: দারুল কিতাবিল ইসলামি, তা.বি)।

৬০. ইবনু নজীম, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদদাকা'ইক*, (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ,২০০২)।
৬১. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.)।
৬২. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*,(বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ১৯৭৯)।
৬৩. ইমাম মালিক, *আল-মুদাওয়ানাহ*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.)।
৬৪. মুহাম্মদ আল-খারাশী, *শারহুল খারাশী 'আল-মুখতাছারি খলীল*,(বৈরূত: দারুল ফিকর, তা.বি.)।
৬৫. ইবনু তাইমিয়াহ, *আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা'*,(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,তা.বি.)।
৬৬. ফাতাওয়া ও মাসাইল, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯)।
৬৭. ইমাম শাফি'ঈ, *আল-উম্ম*, (বৈরূত: দারুল মা'আরিফাহ্, তা.বি.)।
৬৮. আল-মাওয়ারদী, *আল-আহকামুস-সুলতানিয়্যাহ*, (মিসর : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩১২ হি.)।
৬৯. ইবনে তাইমিয়া, *আল-ফাতাওয়ার কুবরা*,(বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭)।

অভিধান/ডিকশনারী

৭০. ইব্‌ন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুল তারীখিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খৃ.)।
৭১. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাকরী আল-ফুয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*,(বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমীয়্যাহ,১৯৯৪ খৃ.),খ. ১. পৃ.২৫৭।
৭২. আল-ফাইরুযাবাদী, *আল-কামূসুল মুহীত*, (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৯৯১ খৃ.)
৭৩. *আল-মু'জামুল অসীত*, (দেওবন্দ: যাকারিয়া বুক ডিপো,প্রথম প্রকাশ,২০০১খৃ.)।
৭৪. *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*,(ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪ খৃ.)।
৭৫. ড. এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী [সম্পাদিত], *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২ খৃ.)।
৭৬. আব্দুল হাফিজ বালয়াভী, *মিসবাহুল লুগাত*,(ঢাকা: খানভী লাইব্রেরী ২০০৩)।
৭৭. আবু তাহের মেসবাহ, *আল-মানার* [বাংলা-আরবী অভিধান],(ঢাকা : মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯৮)।
৭৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,*আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* [আল-মু'জামুল ওয়াফী],(ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ,২০০৯)।

বিবিধ

৭৯. আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্‌বারা, অনু. মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ২০১৩ খৃ.)।
৮০. মাওলানা যুলফিকার আলী নক্‌শবন্দী (দা.), অনুবাদ : মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, আদব : *সৌভাগ্যের সোপান*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আখতার, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৬ খৃ.)।
৮১. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,২০০৪ খৃ.)।
৮২. *ইসলামি আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*, (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং)।

৮৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৫ খৃ.)।
৮৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সামাজিক সমস্যা ও সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: নভেম্বর, ২০০৩ খৃ.)।
৮৫. আবু ইব্রাহিম মহাঃ নূরুল হুদা, *সামাজিক সমস্যা*, (ঢাকা: বিএসএস পাবলিকেশন্স, সংশোধিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৬ খৃ.)।
৮৬. মোঃ শহীদুল্লাহ, *সামাজিক সমস্যা ও বিশ্লেষণ কৌশল*, (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, পুনর্মুদ্রণ,জানুয়ারি ২০১৪)।
৮৭. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০ খৃ.)।
৮৮. আব্দুল খালেক, *নারী*, (ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খৃ.)।
৮৯. কবিতা সুলতানা, *ধন্য আমি নারী*, (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খৃ.)।
৯০. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী, অনু. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, *আল-কুরআনের শাশ্বত শিক্ষা*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ,জুন ২০০৩)।
৯১. সাইয়েদা পারভীন রেজভী,*পর্দা কি প্রগতির অন্তরায়*,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৩শ প্রকাশ, ২০০৫), পৃ.
৯২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর,*খুতবাতুল ইসলাম*, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স,ডিসেম্বর ২০০৮)।
৯৩. মোঃ মুখলেসুর রহমান, *সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও মহানুভবতার ধর্ম ইসলাম*,(ঢাকা: এনআরবি গ্রুপ,মার্চ ২০১১)।
৯৪. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*,(ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯)।
৯৫. অধ্যাপক কে,আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*,(ঢাকা: আলী পাবলিকেসন্স ১৯৭৯)।
৯৬. হুমায়ূন আহমেদ, *হোটেল গ্রেভার ইন ও মে ফ্লাওয়ার*, (ঢাকা: কাকলি প্রকাশনা, ২০০৬ খৃ.)।
৯৭. সৈয়দা ফিরোজা বেগম ও অন্যান্য, *সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও বিশ্লেষণ*,(ঢাকা: প্রফেসর'স প্রকাশন, ১৯৯৯)।
৯৮. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*,(ঢাকা: শাহানা পাবলিশার্স,১৯৯৭)।
৯৯. এ.এফ.এম. আলী ইমাম, *সমাজতত্ত্ব*,(ঢাকা: সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯২)।
১০০. হুমায়ূন আহমেদ, *আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই*, (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, জনু ২০০৬)।
১০১. এ.বি.এম. আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা*,(ঢাকা: হাসান বুক হাউস, জুন ২০১৯)।
১০২. সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ ২০০৮)।
১০৩. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, (ঢাকা: আশরাফিয়া বইঘর, ১৯৯৫)।
১০৪. আল মুসতাশার হাসান হাফনাভী, *মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম*, (আল কাহেরা: দারুল বাশীর)।
১০৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)।
১০৬. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *মহানবী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা*, (ঢাকা: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫)।

১০৭. ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, *আল মারআতু বাইনাশ শারীয়াতি ওয়াল কানূন*, অনু.আকরাম ফারুক, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০২)।

১০৮. আল্লামা আবদুল কাইউম নদভী, *ইসলাম আওর আওরাত*, (লাহোর: ইদারায়ে ইসলামিয়া)।

১০৯. মাওলানা ইসহাক ওবায়দী, *যুগে যুগে নারী*, (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৬)।

১১০. গাজী শামছুর রহমান, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.)।

১১১. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, অনু. মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *ইসলামি সমাজে নারী*,(ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৮খৃ.)।

১১২. ড. ওকাজ ফাকরী আহমাদ, *ফালসাফাতুল উকূবাতু ফীশ শারীআতিল ইসলামিয়া ওয়াল ক্বানূন*,(রিয়াদ: মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ তা.বি.বি.)।

১১৩. আল মুসতাশার হাসান হাফনাভী, *মাকানাতুল মারআতি ফিল ইসলাম*, (আল কাহেরা: দারুল বাশীর)।

১১৪. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, নারী, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০)।

১১৫. বাসুদেব গাঙ্গুলী, *দণ্ডবিধি*, (ঢাকা: আলীগড় লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪)।

১১৬. সাইয়েদ কুতুব, *আল-ইসলাম ওয়া-সালামুল আলাম*, (বৈরুত: দারুস সালাম, ১৯৯৩)।

১১৭. মোহাম্মদ শাব্বির হোসাইন, ইভটিজিং কারণ ও প্রতিকার,(ঢাকা: শব্দশিল্প, ফেব্রুয়ারি ২০১২)।

১১৮. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,*আখলাক ও নৈতিকতা : ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১৮)।

১১৯. গাজী শামছুর রহমান, *বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন*,(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.)।

১২০. শাইখ ড. মুহাম্মদ ইসমাইল ও আব্দুল হামীদ আল বেলালী, অনু.এ.এস.এম.এ. হাকিম, *প্রিয় বোন! পর্দা কি, কেন পর্দা কর না?*, (ঢাকা: খন্দকার প্রকাশনী,প্রথম প্রকাশ,আগস্ট ১৯৯৭ খৃ.)।

১২১. মো. আব্দুর রহিম মিয়া, ইভটিজিং, বাংলাদেশী আইন ও বাস্তবতা: একটি পর্যালোচনা, (রাজশাহী: রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস এন্ড ল,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,৩৮ বর্ষ, মার্চ ২০১৩)।

১২২. শাহেদ ফেরদৌস মুন্নী,"*রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত ও হয়রানী করার বিরুদ্ধে চাই সামাজিক প্রতিরোধ*,(উন্নয়ন পদক্ষেপ, সপ্তম সংখ্যা,সেপ্টেম্বর ২০০৭)।

১২৩. বাংলাদেশ কোড, বাংলাদেশ কপিরাইট আইন-২০০০

১২৪. আবু হামেদ আল-গাযালী, *ইহয়িয়াউ 'উলূমিদ্দীন*,(বৈরূত: দারুল মা'রিফা,তাবি.)।

ইংরেজী গ্রন্থ

১২৫. Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the modern world*, (New Delhi: Taj Printers, 1986).

১২৬. *Oxford Dictionary of contemporary English*,(Dhaka: Networks Printers, New Edition,2006).

১২৭. *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*

১২৮. Ashu Tosh Dev, *Students Favourite Directionary*, Bangla to English,(Calcutta: Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 1986).

১২৯. Prof. Syedur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, (Dacca: 1963).

১৩০. rThe Free Merriam-*Webster Dictionary,* (Merriam-Webster. Retrieved 19 September 2013).
১৩১. lkkaracan, Pinar, *Deconstructing sexuality in the Middle East: challenges and discourses,* (Ashgate Publishing Ltd.).
১৩২. Ruth Mazo Karras, *Handbook of Medieval Sexuality, (*New York: Garland Publishing, Inc. 1996).
১৩৩. Mooney, A. Linda, *David Knox, & Caroline Schacht, Understanding Social Problems*, (Thomson Wadsworth, fifth edition, 2007)
১৩৪. Arnold Rose, in. Dr. Rajendra K. Sharma, *Social Problems and Welfare,* (New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1998)
১৩৫. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Woman in Islam,* (Lahore: Islamic Publication Ltd., Oct. 1979).
১৩৬. U. May OUNG : Buddhist Law, Part 1.
১৩৭. Samuel Koenig, Sociology: A*n Introduction to the science of Society,* (New York: Barmes & Noble Inc. 1968).
১৩৮. Robert L. Barker (editor), *The Social Work Dictionary*, (Washington, D.C.: NASW Press, 1995).
১৩৯. Eurl Rubington and Martin S. Weinberge, *The Study of Social Problems Fine Perfectives*, (New York: Oxford University Press, Second Edition, 1977).
১৪০. Sennett, Richard, and Jonathan Cobb, *The Hidden Injuries of Class*,(New York: Vintage Books, 1972).
১৪১. Paul B. Horton and Gerald R. Leslie, *The Sociology of Social Problems,* (New York: Free Press, 4" Edition,1970).
১৪২. Abul Hashim, *The Creed of Islam or the revolutionary Character of Kalima*,(Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1985).
১৪৩. Harold A. Phelps, *Contemporary Social Problems,* (New York: Prentice Hall, Inc., 1947).
১৪৪. Ogburn and Nimcoff, *A Handbook of Sociology*, (London: Routhedge and Kegan Paul Ltd. 1960).
১৪৫. Gillin, etal, *Social Problems*, (Bombay: The Times of India Press,1969).
১৪৬. *Collins English Dictionary*(0nline), (Penguin Random House LLC and Harper Collins Publishers Ltd. 2019).
১৪৭. Md. Kamruzzaman Khan, O*xford Advanced Learner's Dictionary* [Bangli to English],(Dhaka: Oxford press & Publication, 2009).
১৪৮. Donald W. Shaner, *A Christian View of Divorce*,(Leiden, 1969).
১৪৯. Report of the Commission, Marriage, *Divorce and the Church,* (London, 1971).

১৫০. *The Jewish Encyclopedia*, Vol. XII.
১৫১. *Klansner, Joseph*: From Jesus to Paul, (London, 1964).
১৫২. Cleugh, James, *Love locked out*, (London 1963).
১৫৩. Nazhat Afza and Khurshid Ahmaed, *The Position of Women in Islam*, (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982).
১৫৪. Fida Hussain Malik, *Wives of the Prophet*, (Lahore: Ashraf Publications, 4th Edition,!983).
১৫৫. Nazirah Zein Ed-Din, Edited by Aziah Al-Hibri: *Women and Islam*, (Oxford, England: Pergamon press).
১৫৬. Ashu Tosh Dev, *Students favorite Dictionary*, (English to Bengali and English) (edition June 1990).
১৫৭. *Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Edited by Zillur Rahman Siddiqi,(Dhaka: Bangla Academy, June 2015).

আরবী গ্রন্থ

1. القرآن الكريم
2. أبو محمد بن مسعود محي السنة البغوي، *معالم التنزيل*، (بيروت: دار الطيب، الطبعة الرابعة، 1417هـ 1990م).
3. عبد الله بن أحمد، *تنوير المكياس من تفسير بن عباس*، (كراتشى: قديمى كتب خانه)، ج 1،.
4. أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم عمر الخازن، لباب التنزيل في معاني التنزيل، تفسير الخازن، (بيروت : دار المعرفة).
5. ابن جرير الطبري، *جامع البيان في تاويل القرآن*
6. كمال الدين ابن الهمام، *فتح القدير*،(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1993م، 1413هـ).
7. أحمد بن محمد المقري الفيومي، *المصباح المنير*، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ1994م).
8. الفيروزبادي، *القاموس المحيط*، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1413هـ1991م).
9. محمد بن أحمد القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، بيروت: دار الفكر، 1415هـ1995م
10. ابن رشد الحفيد، *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*، (بيروت، دار المعرفة، 1978م).
11. ابن حزم الظاهري، *المحلى*، (مصر: الجمهورية العربية، 1970م، 1387هـ).
12. الإمام مسلم، الصحيح، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، عدد الأجزاء: 5
13. الإمام أحمد بن حنبل، *المسند*،(بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421هـ – 2001م)
14. الإمام الطبراني، *المعجم الكبير*، (القاهرة، مكتبة ابن تيمية)، عدد الأجزاء، 25
15. الإمام البخاري، *الصحيح*،(دمشق: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ)
16. الإمام أبو داؤود، *السنن*، (بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، عدد الأجزاء: 4)

Dhaka University Institutional Repository

17. ابن منظور، *لسان العرب*،(بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414ھ)،عدد الأجزاء 15.

18. ابن جرير الطبري، *جامع البيان في تاويل القرآن*،(دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع)، عدد الأجزاء 26.

19. الحاكم، *المستدرك على الصحيحين*، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1990م)،عدد الأجزاء 4.

20. المفتى حفظ الرحمان الكملائي، *زاد المحتاج إلى المصطلحات الفقهية*،(دكا: مكتبة شيخ الإسلام، الطبعة الأولى)، عدد الأجزاء 4.

21. الطيالسي، *مسند أبي داوود الطيالسي*،(مصر، دار هجر، الطبعة الأولى، 1419ھ)، عدد الأجزاء: 4.

22. العلامة الشيخ نظام، *الفتاوى الهندية*،(ديوبند: مكتبة الاتحاد)، عدد الأجزاء 6.

23. أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، *المسند*،(المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى،بدأت 1988م، وانتهت 2009م)، عدد الأجزاء، 18.

24. السرخسي، *المبسوط*، (بلوجستان، مكتبه رشيديه).

25. *الموسوعة الفقهية الكويتية*،(الكويت: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،الطبعة الثانية 1410ھ _ 1990م).

26. العلامة برهان الدين المرغيناني، *الهداية*،(بيروت، دار إحياء التراث العربي)، عدد الأجزاء: 4.

27. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، *الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير*،(بيروت: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1404ھ)،عدد الأجزاء، 1.

28. العلامة برهان الدين ابن مازه، *المحيط البرهاني في الفقه النعماني*،(بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2004م).

29. الشيخ الإمام فريد الدين الدهلوي الهندي، *الفتاوى التاتارخانية*، (ديوبند: زكريا بكدبو، الطبعة الأولى، 2010م)، عدد الأجزاء 20.

30. العلامة ابن عابدين الشامي، *حاشية ابن عابدين*، (ديوبند: زكريا بكدبو، الطبعة المصححة، 1435ھ)، عدد الأجزاء 11.

31. شيخي زاده الحنفي، *مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر*، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية الجديدة، 2016م)،عدد الأجزاء 5

32. الإمام فخر الدين عثمان بن على الزيلعي، *تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق*،(ديوبند: زكريا بكدبو)، عدد الأجزاء. 7

33. الإمام علاء الدين الكاساني، *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*،(القاهرة: دار الحديث، سنة الطبع، 2005م)، عدد المجلدات 10.

34. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، *البحر الرائق شرح كنز الدقائق*، (دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية بدون تاريخ)، عدد الأجزاء 8.

35. الإمام سراج الدين عمر بن ابراهيم ابن نجيم الحنفي، *النهر الفائق*، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2002م) عدد الأجزاء 3.

36. بدر الدين العيني، *البناية شرح الهداية*، *بيروت*، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1420ھ 2000م عدد الأجزاء: 13.

Dhaka University Institutional Repository

37. الإمام الفقيه أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد الولوالجي، *الفتاوى الولوالجية*، ديوبند، زكريا بكدبو، المحقق والمعلق: الشيخ مقداد بن موسى، عدد المجلدات: 5.

38. طاهر بن عبد الرشيد البخاري، *خلاصة الفتاوى*، كوئته، مكتبه رشيديه، عدد الأجزاء: 4.

39. كمال الدين ابن الهمام، *فتح القدير شرح الهداية*، دار الفكر، بدون الطبعة وبدون التاريخ. عدد الأجزاء: 10.

40. عبد الرحمان بن محمد الجزيري، *الفقه على المذاهب الأربعة*، بيروت، دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية، 2003م عدد الأجزاء: 5

41. محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: *تاج العروس من جواهر القاموس*، الناشر: دار الهداية:

42. مجد الدين أبو طاهر الفيروزابادي، *القاموس المحيط*، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الرابة: 2005م عدد الأجزاء: 1

43. مجمع اللغة العربية: *المعجم الوسيط*، القاهرة، دار الدعوة،

44. أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري: *معجم الفروق اللغوية*، موسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بـ "قم"

45. سعيد بن ابراهيم التستري البغدادي، المذكر والمؤنث،

46. محمد بن القاسم بن محمد، *الزاهر في معاني كلمات الناس*، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1992م عدد الأجزاء: 2

47. محمد بن جرير الطبري: *تفسير الطبري*، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة الأولى: 1422هـ عدد الأجزاء: 26.

47. أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (المتوفى: 150هـ)، *تفسير مقاتل بن سليمان*، دار إحياء التراث – بيروت، الطبعة: الأولى – 1423 هـ

50. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، مفاتيح الغيب = *التفسير الكبير*، بيروت، دار إحياء التراث العربي الطبعة: الثالثة – 1420 هـ

51. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، *المصنف*، الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة: الأولى، 1409، عدد الأجزاء: 7

52. أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي،: *السنن*، بيروت، دار البشائر، الطبعة: الأولى، 1434هـ – 2013م، عدد الأجزاء: 1

53. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ)، *الموطأ*، أبو ظبي – الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، الطبعة: الأولى، 1425 هـ – 2004 م، عدد الأجزاء: 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3 للفهارس).

54. أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ)، *الهند*، الدار السلفية، الطبعة: الأولى، 1403هـ –1982م، عدد الأجزاء: 2*1

55. ابن ماجة – وماجة اسم أبيه يزيد – أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، *السنن*، دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ – 2009 م، عدد الأجزاء: 5

Dhaka University Institutional Repository

56. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، *حلية الأولياء وطبقات الأصفياء*، بيروت، دار الكتاب العربي، عدد الأجزاء: 10

56. أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)، *شرح مشكل الآثار*، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى – 1415 هـ، 1994 م، عدد الأجزاء: 16 (15 وجزء للفهارس)

57. أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي المكي (المتوفى: 219هـ)، *مسند الحميدي*، دمشق، دار السقا، الطبعة: الأولى، 1996 م، عدد الأجزاء: 2،

58. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، *فتح الباري شرح صحيح البخاري*، بيروت، دار المعرفة، عدد الأجزاء: 13

59. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)، *الفتاوى الكبرى لابن تيمية*، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1408هـ – 1987م، عدد الأجزاء: 6

60. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)، *المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج*، دار إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الثانية، 1392، عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات)

61. كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)، *فتح القدير*، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 10

62. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، *الطرق الحكمية*، مكتبة دار البيان، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 1

63. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)، *المحلى بالآثار*، بيروت، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 12

64. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، *الأدب المفرد*، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الثالثة، 1409 – 1989، عدد الأجزاء: 1

65. أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بـ ابن راهويه (المتوفى: 238هـ)، *مسند إسحاق بن راهويه*، المدينة المنورة، مكتبة الإيمان، الطبعة: الأولى، 1412 – 1991، عدد الأجزاء: 5